আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য এম. এ. বি. টি.

অধ্যক্ষ—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ)

প্রাক্তন অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ)

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা-১২

পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক

ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি.—

এডুকেশন (লণ্ডন), ডি. লিট (প্যারিস), মহোদয়ের করকমলে

নিবেদন

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সব চেয়ে বেশী করে আমাকে মুগ্ধ করেছে, সে হল শিক্ষার আনন্দমধুর সর্বজনীন রূপ। প্রত্যেকটি মানবশিশু যতটুকু সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছেন আজকের পৃথিবী। যার যেটুকু দেবার আছে, তার শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিষ্কাশিত করে নিতে হবে, নইলে বঞ্চিত হবে পৃথিবী, বঞ্চিত হবে মানব-সভ্যতা।…এরই জন্য কী নিরলস সাধনা চলেছে পাশ্চাত্ত্য জগতে, কত তত্ত্ব, কত তথ্য, কত পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে যে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শিক্ষার এই পৃথিবী-জোড়া আনন্দ-যজ্ঞে ভারতবর্ষেরও আজ নিমন্ত্রণ। তাই এতদিন ধরে পরাধীন ভারত শিক্ষার নামে যে ভাবে 'তোতা কাহিনী'র পুনরাবৃত্তি করে চলেছিল আজ তার আশু পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা ত বলাই বাহুল্য!

আমাদের দেশের শিক্ষা-তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্ররা তাই শিক্ষার এই আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবার জন্য উৎসাহী হয়েছেন, বিশ্ব-জোড়া শিক্ষাসত্রের দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

তাঁদের সেই গুরুদায়িত্ব পালনে আংশিক ভাবে সাহায্য করবার মানসেই এই গ্রন্থখানার অবতারণা। ইংরেজী ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ, অসংখ্য। শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নেই ওদের দেশে। বাংলা ভাষায় এর সূচনা মাত্র শুরু হয়েছে বলা যায়। তাই গ্রন্থ রচনায় স্বদেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পথিকৃত সাধকবৃন্দের সাহায্য অকুণ্ঠভাবেই গ্রহণ করেছি, একথা সকৃতজ্ঞে স্বীকার করি।

গ্রন্থখানি মূলতঃ শিক্ষণ-শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রবর্গের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত হলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বা শিক্ষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকদেরও হয়ত কিছু কিছু কাজে লাগতে পারে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থখানি লেখা হয়েছে তার কথঞ্চিৎ সফলতা ঘটলেও পরিশ্রম সার্থক হবে।

২৬ জুন, ১৯৬০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য

নবম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

নতুন নবম সংস্করণ বেরুল। এই সংস্করণে কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হল। আশা করি পূর্বের মতই এই সংস্করণটি সমাদৃত হবে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

শিক্ষা

—যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

—রবীন্দ্রনাথ

—পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

—Education is the natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of the human being.

—Pestalozzi

—Education is not so much the survival of the fittest, but the fitting of the greatest possible number to survive.

—T. H. Huxley

—A complete and generous education is that which fits a man to perform justly, skilfully, and magnanimously, all the offices, both public and private, of peace and war.

—Milton

—Mere knowledge is not Education.

—Edward Thring

শিক্ষার স্বরূপ

(Concept of Education)

শিক্ষা কেন ?

কত বিচিত্র জীব এই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করছে তারপর তাদের সহজাত সংস্কার বশে বিচিত্র জীবলীলা অনুবর্তন করতে করতে মৃত্যুর পথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জীবন-পথ পরিক্রমায় তাদের একমাত্র সম্বল হল অল্প কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)! মানুষও একদিন অন্যান্য জীবকুলের মতোই এই সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), ভাব (Feeling), প্রেরণা (Impulse), স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system), বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) প্রভৃতি কয়েকটি বংশানুক্রমিক সহজাত সম্পদ সম্বল করে জীবনের পথে চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু মানুষের পথ জটিল। বিধি-নির্দিষ্ট গতানুগতিকতার বাঁধা পথ ছেড়ে মানুষ চলতে চেয়েছে অজানা বন্ধুর নূতন পথে। নানা উত্থানপতনের ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে সেই পথ চলে এসেছে আজকের এই বিদ্যুতালোকিত সভ্যতার স্বর্ণদ্বারে। মানুষের এই জয়যাত্রার পাথেয় কেবলমাত্র তার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে মেলে নি—মিলেছে অতীত অভিজ্ঞতার সার্থক সঞ্চয়নে, অনুশীলনে ও রূপায়ণে। সংক্ষেপে একেই আমরা বলে থাকি 'শিক্ষা'।

শিক্ষার স্বরূপ—পরিবর্তনশীলতা

ইতর প্রাণীর কাজের মধ্যেও হয়ত দেখা যাবে সূক্ষ্মতার অভাব নেই, শিল্পবোধের অভাব নেই, কিন্তু সেগুলি বুদ্ধি-নির্ভর নয়, যান্ত্রিক প্রবৃত্তি-নির্ভর, তাই তার কোন পরিবর্তন নেই। হাজার হাজার বছর ধরে মৌমাছি একই ধরনের ছ' কোণা ঘর তৈরী করে চলেছে, বাবুই বাসা বুনেছে, উই তৈরী করেছে মাটির বল্মীক ঢিবি।—কোন পরিবর্তন নেই, বৈচিত্র্য নেই। থাকলেও তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে সমস্ত জীবলীলার ছকটা একেবারে যেন একটা অপরিবর্তনীয় ছন্দে বাঁধা বলে ধরে নিতে পারা যায়—অথচ মানুষের বেলায় তার ব্যবহার, রীতি-নীতির পরিবর্তন চলেছে অহরহ। অতীত দিনের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের কত পরিবর্তন, আবার আগামী দিনের সঙ্গেও যে

পরিবর্তন আসছে সেটাও কম নয়! মানুষের এই নিরন্তর পরিবর্তনশীলতাই তাকে অন্যান্য জীবলোক থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। সুতরাং এই পরিবর্তন-শীলতাই হচ্ছে শিক্ষার মূলকথা (Education is change)। কারণ শিক্ষার গুণে মানুষ ইতর প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে। মনুষ্যেতর জীবমাত্রই তাদেব পিতৃপিতামহের চলার পথ নিখুঁতভাবে অনুবর্তন করে চলে —অথচ মানুষের পথ সদা-পরিবর্তনশীল।

একক মানুষ চলার পথে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে গড়েছে সমাজ। আবার সমাজের অভিজ্ঞতায় মানুষ পায় নূতন পথেব দিশা......এমনি করে হয় সভ্যতার অগ্রগতি, পরিবর্তন ঘটে রাষ্ট্রিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে। পুরাতন জীবনের পলির উপব গড়ে ওঠে নূতন জীবন। সুতরাং এই দিক দিযে বিবেচনা করলে মানব জীবনের এই সদাপরিবর্তিত রূপই হল শিক্ষার স্বরূপ।

মানব সভ্যতার রূপায়ণে এই যে নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় তাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন এবং মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন। কখনও মানুষ প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নিতে চেষ্টা করেছে, কখনও বা নিজেকেই প্রকৃতির অনুকূলে অভিযোজিত করে নিয়েছে। এইভাবে যুগপৎ সংগ্রাম ও আপসের মধ্য দিয়ে মানুষ বহির্লোক ও অন্তর্লোকের পরিবর্তন ঘটাতে ঘটাতে এগিয়ে চলেছে। এই হল সভ্যতার মূলকথা এবং এইখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য।

পরিবর্তনশীলতার প্রেরণা—অভাববোধ

—কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেরণা কোথায় পায় মানুষ? উত্তরে বলা যায়—মানুষের অভাববোধ; মানুষ কখনই কোন অবস্থাতেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তৃপ্ত থাকে নি। সব সময়েই তার মন বলেছে "হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে।" আরো চাই আরো চাই, জানতে চাই, করতে চাই, পেতে চাই—এই হলো মানুষ-জীবের চির কামনা। এই চির অভাববোধ থেকেই পরিবর্তিত পরিপার্শ্বের সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্তিত পরিপার্শ্ব থেকেই আবার জাগ্রত হয় নূতন নূতন অভাববোধ। সুতরাং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির মূল কথাটা হল অভাববোধ। তাই কারো কারো মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত—তার সর্ববিধ অভাবপূরণের প্রচেষ্টা।

(The ultimate aim of education is to achieve the fullest satisfaction of the wants of the mankind—Thorndike and Gates.)

কিন্তু কেবলমাত্র অভাববোধজনিত পরিবর্তনশীলতাই শিক্ষার মূল স্বরূপ, বললে বোধহয় সবখানি বলা হল না।

পরিবর্তন অর্থে এক থেকে অন্য আর একটি হওয়া। কিন্তু সেইখানেই ত শিক্ষার শেষ কথা নয়। শিক্ষায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; জৈব জীবনের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং শিক্ষা শুধু গতিমূলক নয়, অগ্রগতিমূলক। তাই কেবলমাত্র পরিবর্তন বললে সবখানি বলা হল না। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষা যে পরিবর্তন আনবে তা অর্থহীন নয়, তা বিকাশমূলক, বৃদ্ধিমূলক।

শিক্ষার স্বরূপ—ক্রমবর্ধমানতা

বীজ পরিবর্তিত হয় অঙ্কুরে, অঙ্কুর চারাগাছে, চারাগাছ, মহীরুহে⋯এমনি করে বীজের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা অর্থহীন পরিবর্তন মাত্র নয়, তা অগ্রগতিমূলক সার্থক পরিবর্তন। মাটির রস, আকাশের তেজ, বাতাসের স্পর্শ—এই সব পরিপার্শ্ব থেকে বিচিত্র প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে তবেই বীজ মহীরুহে পরিণত হয়। মানবশিশুও তার পরিপার্শ্বের বিচিত্র প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে বড় হতে থাকে। মানবশিশু আদিম মানুষের মতই সংস্কারবর্জিত নিঃসহায় একক⋯⋯ক্রমশ সে তার পরিজনের, গোষ্ঠীর, সমাজের, রাষ্ট্রের প্রভাব গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সামাজিক মানুষ আবার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রয়োজনানুরূপ সমাজ গড়ে নেয়। এমনি করেই মানুষ এবং তার সমাজ এগিয়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে।

(Education is growth. The young of to-day will be the society of tomorrow. As it fashions the young to-day, so the society is fashioning itself tomorrow. Society fashions the young by determining, directing their activities. This is their growth and this is their education. Growth, then, is cumulative movement of directed activities towards a later result.—Horne.)

সুতরাং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এগিয়ে চলা অর্থাৎ বৃদ্ধিই হল শিক্ষার স্বরূপ। (Education is growth.)

ক্রমবর্ধমানতার প্রেরণা—অপূর্ণতা

—কিন্তু কোথায় এই বৃদ্ধির প্রেরণা?

অপূর্ণতা থেকেই ত' বৃদ্ধির প্রেরণা আসে। তত্ত্ব হিসাবে মানবেতিহাসের এই নিরন্তর বিবর্ধন-প্রবণতা স্বীকার করতে গেলে মানব-সভ্যতার অপূর্ণতা মেনে নিতে হয়। অঙ্কুর যেমন ক্রমশঃ বৃক্ষের দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে, মানব-সভ্যতাও তেমনি নিরন্তর এগিয়ে চলেছে কোনও একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে। পরিণতি হল সমাপ্তি। যতদিন সে অপূর্ণ ততদিনই তার পূর্ণতার দিকে অগ্রগতি। জানি না, কোন অনির্দেশ্য ভাবী পূর্ণতার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে মানব সভ্যতার বিরামহীন যাত্রা চলেছে। যে দিন সে পৌঁছুবে তার লক্ষ্যে, সেইদিনই তার গতি হবে স্তব্ধ। অনন্ত সমুদ্রের বুকে নদী হবে আত্মহারা। দ্বৈততত্ত্বের লীলাবিলাস অদ্বৈততত্ত্বে বিলীন হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—"জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব-সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট ....।"

এই অপূর্ণতা নেতিবাচক বা অভাবাত্মক নয়। অপূর্ণতার মধ্যে দিয়েই আমরা পূর্ণতার আনন্দলোকের সন্ধান পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ।...সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে ...।"

—সুতরাং বিবর্ধনপ্রবণতাই (growth) হল শিক্ষার স্বরূপ।

কিন্তু এই সংজ্ঞাটিকেও পুরাপুরি শিক্ষার স্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা আছে।

বৃদ্ধি যে সবসময়ে কল্যাণের পথে, উন্নতির পথে চলবে, এমন কি কথা আছে? অসৎপথে অসামাজিক প্রবৃত্তিরও বৃদ্ধি ঘটে—সুতরাং বৃদ্ধিমাত্রকেই (growth) শিক্ষার স্বরূপ বলে স্বীকার করে নিতে পারি কি? যে শিক্ষার প্রভাবে মানুষ একদিন গুহাবাসী অরণ্যবাসী অবস্থা থেকে বর্তমানে সুসভ্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই শিক্ষা সব সময়েই কোন একটা আদর্শ সম্মুখে রেখে চলবার চেষ্টা করেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুতরাং সুপরিকল্পিত পরিণতিপ্রত্যাশী আদর্শাভিমুখী বৃদ্ধিকেই শিক্ষার স্বরূপ বললে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়।

("It is not enough to say 'Education is growth'. We must add, education is growth in the right way. And criteria of right growth must be set up."—Horne)

শিক্ষার স্বরূপ—উন্নয়ন

এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকে আমরা বলতে পারি উন্নয়ন (development)।

বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন শব্দদুটি অনেকটা একার্থবাচক হলেও এদের মধ্যে যে ভাবগত পার্থক্য আছে সেটি নগণ্য নয়। বৃদ্ধির কাজটা দৃষ্টিগোচর হয় বাহির থেকে, কিন্তু উন্নয়ন ঘটে ভিতরের দিক থেকে। চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হয় বৃদ্ধির ফলে, বাইরের আলোবাতাস, মাটি, জল তার এই বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু অঙ্কুরের যে উদ্ভব ঘটে, সেটি তার আভ্যন্তরীণ পরিণতি।

ছোট শিশু মানুষে পরিণত হয় বৃদ্ধিতে, কিন্তু অমার্জিত অসামাজিক মানুষ মার্জিত ও সামাজিক হয়ে ওঠে উন্নয়নের ফলে।

("A very significant point is this, that growth is less dependent on internal factors than is development. By and large, growth is from without, development is from within, growth is dependent on external stimulation, development upon internal changes···Thus development is rather a matter of nature and growth, a matter of nurture."—Horne)

অতএব দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধিতে বহিরঙ্গ শক্তির লীলা আর উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ শক্তির।

শিক্ষার স্বরূপ—আত্মবিকাশ

এই দিক দিয়ে বিচার করে প্রাচীনকালের অনেক মনীষী শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে বৃদ্ধির পরিবর্তে উন্নয়নকেই স্বীকার করেছেন। এই উন্নয়নকে আরো সঙ্কীর্ণ করে বলা যায় আত্মবিকাশ (unfoldment)। কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে মানুষের সমগ্র আভ্যন্তরীণ সুপ্তশক্তিকে বিকশিত করে তোলাই হল আত্মবিকাশ। (Unfolding of the latent powers of the individual towards a definite goal.)

শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণে এতক্ষণ যে সংজ্ঞাগুলির উল্লেখ করা গেল তার মধ্যে এই শেষোক্ত আত্মবিকাশতত্ত্বই (unfoldment) বহুকাল ধরে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁদের মতে, শিক্ষা কোন বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস নয়, শিক্ষার্থীর অন্তরের সম্যক বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা।

ইংরাজী এডুকেশন (education) শব্দটি বিশ্লেষণ করেও তাঁরা এই তত্ত্বে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন।

এডুকেশন (education) শব্দটি ল্যাটিন "educere" শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই শব্দটির অর্থ হল আকর্ষণ করা, প্রকাশ করা। সুতরাং এডুকেশন শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে এই নূতন সংজ্ঞার ইঙ্গিত।

সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতেও শিক্ষা আন্তরিক সম্পদের উদ্ঘাটন। সক্রেটিস ত শিক্ষককে মনের প্রসবকারী ধাত্রী (man-midwife of the mind) বলেই অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষক কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর মনের গুপ্ত সম্পদগুলি বাইরে প্রকাশ করে আনতে সাহায্য করেন। শিক্ষকের কাজ তার চেয়ে বেশী নয়।

প্লেটো বলেছেন, শিক্ষা কোন নূতন তথ্য শিক্ষার্থীর মনে ঢুকিয়ে দিতে পারে না—পূর্ব থেকেই যা আছে তাই বাইরে প্রকাশ করতে পারে মাত্র। (Education does not generate or infuse a new principle, it only guides and directs a principle already in existence." —Plato)

আমাদের দেশেরও অনেক অধ্যাত্মবাদী মনীষী, যথা—স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষায় আত্মবিকাশমূলক অভিব্যক্তিবাদই স্বীকার করেছেন।

[Education is the manifestation of the perfection already in man. Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside, it is all inside. —Swami Vivekananda

The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task master, he is a helper and guide. —Sree Aurobinda

By education I mean all-round drawing out of the best

in child and man—body, mind and soul. Real education consists in drawing the best out of yourself.—Mahatma Gandhi]

এঁদের মতে কাউকে নূতন কিছু শেখান যায় না। সবই রয়েছে মানুষের মনে, তবে সেগুলি কারো বা অবিন্যস্ত। শিক্ষকের কাজ হল সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলা, সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করা।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদেব মধ্যে ফ্রয়েবল আত্মার সর্বজ্ঞতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে অনন্ত শক্তিব বিকাশ। প্রত্যেকটি মানুষ সেই অনন্ত শক্তির অংশ। আত্মবিকাশের দ্বাবা মানুষ ক্রমশ এগিয়ে চলবে সেই আদর্শের দিকে, চরম পরিণতিব দিকে। শিক্ষকের কাজ হল মানুষেব এই স্বাভাবিক বিকাশের পথের অন্তরায়গুলিকে অপসারণ করা। এই দিক দিয়ে রুশোর প্রকৃতিবাদের (Naturalism) সঙ্গে অনেকটা মিল দেখতে পাওয়া যাবে।

শিক্ষার স্বরূপ—প্রয়োগবাদ

কিন্তু অধ্যাত্মবাদীদের এই সংজ্ঞাগুলি বিচাব করলেই বোঝা যাবে মূলত এগুলি হল জড়ধর্মী (Static)। কোন গতি নেই, চাঞ্চল্য নেই, পরিবর্তন নেই। তা ছাড়া এ হল একান্তই বাস্তব-বর্জিত তত্ত্বমাত্র। সুতরাং এরই প্রতিক্রিয়ায় নূতন যে দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠল তাকে বলা যায় প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই এই মতের উদ্ভাবক ও প্রচারক।—এঁদের মতে, জগতে সব কিছুই গতিশীল, পরিবর্তনশীল, প্রতিনিয়ত এখানে পরিবর্তন চলেছে বস্তুজগতে ও ভাবজগতে। সুতরাং শিক্ষাব স্বরূপ নির্ণয়ে গতিশীলতার কথাই মুখ্য।

শিক্ষা বলতে মনের মধ্যে কোন একটা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানোদ্ঘাটন, কিংবা নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ অথবা ভবিষ্যতের কোন স্থিব লক্ষ্যে পৌঁছুবার প্রস্তুতিকরণ—এর কোনটাই সত্য হতে পাবে না। চলিষ্ণু জগতে শিক্ষাব স্বরূপ চলিষ্ণু হতে হবে, নইলে তা হবে বাস্তববিরোধী। সুতরাং শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা জীবনের প্রস্তুতিকরণ নয়, জীবনযাপন। (Education is not a preparation for life, rather it is living. J. Dewey.)

জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিশু ক্রমশ এগিয়ে চলে পরিণত মানুষের দিকে। নিরন্তর সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে—এই হল তার শিক্ষা।

ভবিষ্যতে ভালভাবে বাঁচবার সুবিধার জন্য আজকের শিশুর মনে যদি কোন আপাত অপ্রয়োজনীয় শুষ্ক জ্ঞান ভর্তি করে রাখবার চেষ্টা করি, সেটাকে আর যাই বলি, শিক্ষা বলা চলবে না। শিশু যেমন ক্রমশ বড় হতে হতে চলেছে—তার শিক্ষার ধারাও তেমনি তাৎকালিক প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে চলেছে সমান্তরাল ভাবেই।

ডিউই সাহেবের এই প্রয়োগবাদ তত্ত্বের উপর জোর দিয়ে শিক্ষাবিদ রেমণ্ট উন্নয়নবাদের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া যাঁর ফলে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ তার কায়িক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করে চলতে পারে। [Education means that process of development in which consists the passage of a human being from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment —Raymont]

উন্নয়নের কথা স্বীকার করলেই প্রশ্ন হয়—কিসের উন্নয়ন? শূন্যের ত উন্নয়ন হয় না। বীজ থেকে বৃক্ষের উন্নয়ন ভ্রূণ থেকে শাবকের উন্নয়ন—তেমনি ব্যক্তিমানসের উন্নয়ন স্বীকার করতে হলে মানুষের মনের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব মানতে হয়। শিক্ষকের কাজ হল, শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তিগুলিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সুমার্জিত ও সুসামাজিক করে ফুটিতে তোলা।

কিন্তু এই দুরূহ কার্যটি কিভাবে করা যায়? জীবনের উপরে জীবনেরই প্রভাব পড়ে, পুঁথির প্রভাব পড়ে না।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে, আবার শিক্ষার্থীর প্রভাবেও শিক্ষকের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষার স্বরূপ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া

শিক্ষাবিদ অ্যাডাম শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process) বলেছেন। (Education is a bipolar process in which one presonality acts upon another in order to modify the development of the other. Sir John Adam)

জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার শিশু মনে সুপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র সেই সুপ্ত জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলা—এই পুরাতন মতবাদ অ্যাডাম-সাহেব স্বীকার করেন না। শিক্ষকেরও কিছু বলবার আছে, শেখাবার আছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মিলনে তবেই শিক্ষার উদ্ভব। এডুকেশন শব্দটির ল্যাটিন মূল বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, শব্দটির উৎপত্তি educere থেকে না ধরে educare থেকেও ধরা যায়, যার অর্থ হচ্ছে শিক্ষিত করা (to educate), পালন করা (to rear), বর্ধিত করা (to raise)। সুতরাং শিক্ষার স্বরূপ কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ নয়, শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

ফ্রয়েবল্ শিক্ষার স্বরূপ বলতে গিয়ে চারাগাছ ও মালীর উপমা দিয়েছেন। মালীর মতই যত্ন নিয়ে আগ্রহ নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক মানব-সমাজের ছোট ছোট চারাগুলিকে সুন্দর সুপুষ্ট করে তুলবেন। প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে; শিক্ষক সস্নেহে তাদের সেই সব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবেন। প্রত্যেকটি ছেলেকে গড়েপিটে গোপাল করে তুলবার চেষ্টা করবেন না—রাখাল এবং গোপাল উভয়কে সুসম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করবেন।

(But while each plant must develop according to the law of its own nature, while it is impossible for example, for a cabbage to develop into a rose there is yet room for a gardener. The good gardener by his act sees to it that both his cabbages and his roses achieve the finest form possible......Froeble,)

শিক্ষার সংজ্ঞা

(What is Education)

শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ

পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষার যে ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করা হল প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অবশ্য শিক্ষাকে সেভাবে দেখি না। ছেলেরা স্কুলে যায়, বিভিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করেঃ পরীক্ষা দেয় ; তারপর একদিন স্কুল বা কলেজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিক্ষার পালা সাঙ্গ করে। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে গ্রন্থনিবদ্ধ যে জ্ঞানের অনুশীলন করে ছেলেরা তাকেই আমরা মোটামুটিভাবে শিক্ষা বলে মনে করি। বলাই বাহুল্য এটি শিক্ষার একান্তই সঙ্কীর্ণ অর্থ।

জ্ঞান ত আমরা প্রতিনিয়তই অর্জন করে চলেছি জীবনযাত্রার পথে। সব সময়েই আমরা নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি এবং সেই সব অভিজ্ঞতা আমাদের অন্তরের জ্ঞানভাণ্ডারকে অজ্ঞাতসারে পরিপূর্ণ করে তুলছে। অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞানও পঠনপাঠনের মধ্যে দিয়ে আমরা আহরণ করছি। কিন্তু শিক্ষার কথা আমরা যখন বলি তখন সাধারণত সেই পুঁথিগত জ্ঞানের পরিমাপ করেই বলে থাকি। জীবন থেকে বিচ্যুত গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞানকে সত্যসত্যই কি শিক্ষা নামে অভিহিত করা যায় ? যে জ্ঞান পুঁথি থেকে সোজাসুজি মগজে ঢোকে, আবার মগজ থেকে সোজাসুজি পরীক্ষার খাতায় এসে ফুরিয়ে যায়, জীবনের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না সেই জ্ঞানের সার্থকতাই বা কি, সেই শিক্ষার মূল্যই বা কি ?

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের কত তফাৎ—চিন্তায় ভাবনায় আচরণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে কত এগিয়ে এসেছি এবং একেই আমরা নাম দিয়েছি সভ্যতার অগ্রগতি। কিন্তু কি করে এই অগ্রগতি সম্ভব হল ? উত্তরে আমরা বলব, একপুরুষের অভিজ্ঞতা পরবর্তী পুরুষকে সাহায্য করেছে এগিয়ে যেতে। অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের ধারা চলেছে অব্যাহতভাবে, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন ঘটলে তবেই অগ্রগতি সম্ভব হয়। আচরণের পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে সেই অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই নেই।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি সেই জ্ঞান যদি আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত না করতে পারে তবে সে জ্ঞান ব্যর্থ। মোটকথা **শিক্ষার লক্ষ্যটি হচ্ছে আচরণের পরিবর্তন, জ্ঞানার্জন সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়মাত্র।** জ্ঞানার্জন হল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং সেই সঞ্চয়ের ফলে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় কল্পনায় ব্যবহারে পরিবর্তন আসবে—এই আশা করেই আমরা জ্ঞানার্জন করতে উৎসাহিত হই, বিদ্যালয় খুলে জ্ঞানবিতরণের ব্যবস্থা করি এবং বিবিধ মানের পাঠক্রম নির্ণয় করি। কিন্তু লক্ষ্যটি হারিয়ে ফেলে কেবলমাত্র অন্ধভাবে পথের অনুবর্তন করে চললে যেমন কিছু লাভ হয় না তেমনি কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনেও কোন লাভ নেই, যদি না সে আমাদের আচরণে কোন রকম পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

এইদিক দিয়ে বিচার করে আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই (John Dewey) জ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (১) **নিষ্ক্রিয় জ্ঞান** ও (২) **সক্রিয় জ্ঞান**।

যে জ্ঞান মনের মধ্যে কেবলমাত্র শুষ্ক বোঝা হয়ে সঞ্চিত হতে থাকে অথচ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আমাদের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না সে-জ্ঞান নিরর্থক, সে জ্ঞান নিষ্ক্রিয়। ইস্কুলের পরীক্ষায় সে জ্ঞান হয়ত কাজে লাগতে পারে কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় তা কোন কাজেই আসবে না।

জ্ঞাতব্য বিষয়ের যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণ ঘটে তখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা আমাদের প্রয়োজনে লাগে এবং আমাদের আচরণে ও ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটায়। এই জাতীয় জ্ঞানকেই তিনি বলেছেন সক্রিয় জ্ঞান।

সুতরাং শিক্ষার জন্য আমরা যে জ্ঞান অর্জন করব সেই জ্ঞানটি যেন সক্রিয় জ্ঞান হয়—সেইদিকে বিশেষভাবেই লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা, গ্রন্থপণ্ডিত তৈরী করা নয়।

শিক্ষালয়ের মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন কিছু জ্ঞান (Knowledge) অর্জন করি অপরদিকে কিছু কৌশলও (Skill) আয়ত্ত করতে শিখি। এই কৌশল আয়ত্ত করাকেই কি শিক্ষা বলব? বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা সাধারণ কথায় বলি লেখাপড়া করা। লিখতে শেখা আর পড়তে শেখা এই দুটো কাজই হল কৌশল আয়ত্ত করা। কতকগুলি বর্ণ অক্ষরের লিপিচিহ্ন দিয়ে মনের ভাবকে চিহ্নিত করে রাখবার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে।

সেই কৌশলটি শিশু প্রথমে অনেক পরিশ্রম করে আয়ত্ত করে। তার ফলে যে কোন লেখা সে সহজে পড়তে পারে এবং লিখতে পারে। কিন্তু লিখনের ও পঠনের কৌশলটি মাত্র আয়ত্ত করাটাই তার শেষ কথা নয়, জীবনের নূতন ক্ষেত্রে সেই কৌশল সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে তবেই তার সার্থকতা।

এই হিসাবে কৌশল আয়ত্ত করাও নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মানুষ যখন কোন নিষ্ক্রিয় কৌশল আয়ত্ত করে তখন জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ থাকে না, একান্ত যান্ত্রিকভাবেই সে তার ব্যবহার করে থাকে অথচ সক্রিয় কৌশল মানুষ তার প্রয়োজনমত যথাস্থানে যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি **জ্ঞানার্জন, কি কৌশল-আয়ত্তীকরণ উভয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরণের পরিবর্তনসাধন এবং আচরণের পরিবর্তনই হল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।** এইবার বিবেচ্য এই আচরণের পরিবর্তন কিভাবে ঘটান যায়। আগেই বলেছি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানুষের মনে অভিজ্ঞতাব সঞ্চয় ঘটতে থাকে এবং তার ফলে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটে। এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যে সব সময়ে জ্ঞাতসারেই ঘটছে, এমন নয়, অজ্ঞাতসারেও আমাদের মনে অভিজ্ঞতাব ছাপ পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আচরণ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এইভাবে জীবনের পথে চলতে চলতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কত রকম অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি এবং তার ফলে আমাদের আচরণেও পরিবর্তন ঘটছে। বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধভাবে এব জন্য কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না তাই একে আমরা **অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা** (Informal Education) বলতে পাবি।

কিন্তু এইভাবে জীবনযাত্রার পথ থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা সব সময়ে যে আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে এমন কথা নয়। মানুষের সমাজ যুগযুগ ধরে যে সব মূল্যবান জ্ঞান সঞ্চয় করে চলেছে সেই সবগুলি ত আকস্মিক-ভাবে পাওয়া যাবে না। তার জন্য বিধিবদ্ধভাবে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে জ্ঞানের সঞ্চয়ে অনেক ফাঁক থেকে যাবে। তাছাড়া অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ফলে যে আচরণের পরিবর্তন ঘটবে তা সব সময়েই যে সমাজানুমোদিত বাঞ্ছিত পথে হবে এমন কথা নেই। অসামাজিক অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাও অনেক এসে জুটবে অপ্রত্যক্ষ শিক্ষায়। তাই বাঞ্ছিত আচরণের

অনুশীলনের জন্য আজও সমাজের মূল্যবান অভিজ্ঞতাসমূহ মানবশিশুকে প্রদান করতেই হবে। এই জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। শিক্ষার্থী যাতে সমাজ-নির্দিষ্ট পথে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হয় থাকে। এর জন্য মানব সমাজের সংগৃহীত অভিজ্ঞতা-গুলিকে বিভিন্ন পাঠ্যের মাধ্যমে বিতরণ করবার জন্য শ্রেণীকরণ করা হয়। একে আমরা **প্রত্যক্ষ শিক্ষা** (Formal Education) বলতে পারি।

সুতরাং শিশুর শিক্ষা যে কেবলমাত্র বিদ্যালয়েব মাধ্যমেই হয়ে থাকে এমন নয়। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে এবং তার ফলে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একেই বলব শিক্ষা।

এই দিক দিয়ে শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা হিসাবে বলতে পারি **জীবনের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে সমাজানুমোদিত বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করবার সাধনাই হল শিক্ষা।**

অর্থাৎ শিক্ষার মূল কথা হল অভিজ্ঞতা দ্বাবা আচরণের পরিবর্তন ঘটানো এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলি যেন সামাজিক ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হয়ে শিক্ষার্থীকে সমাজে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে এবং সার্থক জীবনযাপনে সাহায্য করে। শিক্ষাব এই সংজ্ঞা মেনে নিলে বিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই ব্যর্থ বলে মনে হবে।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করে শিক্ষকের বাচন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চরণের চেষ্টা হয়। শুধু দৃষ্টি ও শ্রবণ-পথে শিশুমনের সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ। কিন্তু শুধু চক্ষুকর্ণের মধ্যে দিয়ে কোন কিছু মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই কি তার মর্মগ্রহণ সম্ভব হয়? আর মর্মগ্রহণ হলেই কি সব সময়ে আচরণের পরিবর্তন ঘটে?

দেখা যায়, অপরের পরিবেশিত হাতফেরতা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ সহজেই শিক্ষালাভ করে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমে নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে তাতেই তার আচরণের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং শিক্ষণীয় বিষয়-

গুলি যতদূর সম্ভব ছাত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রূপে তার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই আজকাল নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। এইসব পদ্ধতিতে শিশুকে যথাসম্ভব পরিপার্শ্বিকের সম্মুখে উপস্থাপিত করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করা হয়।

শিক্ষার প্রণালী

(The Process of Education)

জীবসৃষ্টির অন্ধকারময় আদিযুগ থেকে বর্তমানের এই সভ্যতালোকিত যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ক্রমোন্নতির ধারা যেমন চমকপ্রদ তেমনি জটিল। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে করতে এগিয়ে চলেছে জীব। আগেই বলেছি এই অভিযোজনকার্যটির নামই হল শিক্ষা। কিন্তু এই অভিযোজনের কৌশলটি বড় অদ্ভুত। অভিযোজন অর্থে জীবনের পথে এগিয়ে চলার শিক্ষা। এগিয়ে চলবার অর্থই হল পুরাতনের বনিয়াদের উপর নূতনের সৌধ নির্মাণ।

জীবনপ্রয়াসের আদিম প্রেরণায় জীবমাত্রেই ছুটে চলেছে নিজ নিজ পথে, বিচিত্র অভিজ্ঞতাব নুড়ি কুড়াতে কুডাতে।

এদের মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা জীবনপ্রয়াসের অনুকূল, যেগুলি অভিযোজন প্রচেষ্টায় সার্থক, অথবা তার জীবনধারা অব্যাহত রাখার সহায়ক, সেইগুলিই সে দিয়ে যায় পরবর্তী বংশধরের হাতে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) হিসাবে, সেগুলি জীবের মধ্যে জেগে থাকে। জীবমাত্রই ত নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, এদের মধ্যে যেগুলি তার জীবনপ্রয়াসেব অনুকূল সেই-গুলিই মাত্র সে সঞ্চয় করে চলে মনের গহনে, এ কথা ত আগেই বলেছি। একদিকে সে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে, অপর দিকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কিছু কিছু রেখে যাচ্ছে উত্তর-পুরুষের জন্যে। —এইভাবে যুগপৎ চলেছে উপার্জন ও সঞ্চয়।

শুধু বস্তুজগতে নয়, ভাবজগতে ও চিন্তাজগতেও এই লীলা সমানে চলেছে —উপার্জন আর সঞ্চয়। সমস্ত জীবজগতের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের কথা আলোচনা করতে গেলে সেখানেও এই দুটি বিপরীত শক্তির যুগপৎ লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

মানুষের সমগ্র কাজকর্ম চিন্তাভাবনা সবই মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায় (ক) সৃষ্টিমূলক ও (খ) সঞ্চয়মূলক। প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এই দুটি ভাগ। সব রকম কাজ যে সবসময় করে যাচ্ছে সেই মনকে বিশ্লেষণ করলে দেখব, তার মধ্যে এই দুই বৃত্তিই কাজ করছে। একটা

দিয়ে সে একদিকে যেমন তার যাবতীয় *পুরাতন অভিজ্ঞতা* **আঁকড়ে রাখছে,** পুরাতন পথেরই পুনরাবৃত্তি করছে, তেমনি আর একটা বৃত্তি দিয়ে নূতন অভিজ্ঞতাকে সে অনবরত সঞ্চয় করে যাচ্ছে। যুগপৎ চলছে মনের ভাণ্ডারের এই উপার্জন ও সঞ্চয়ের লীলা। বিপরীতধর্মী মনের প্রকাশ তার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে, প্রত্যেকটি চিন্তার মধ্যে। আমরা বড় হচ্ছি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারছি, সেগুলো সঞ্চয় করছি এবং সে সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করেই আবার নূতন ভাব অর্জন করছি, রচনা করছি নূতনের সৌধ।

[Every act of self assertion is both hormic and mnemic, hormic in so for as it in an instance of the conservative or creative activity which is the essence of life, mnemic in so far as its form is at least partly shaped by the organism's individual or racial history—P. Nunn]

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত আমোদের মনের মধ্যে ঘা দিচ্ছে। অভিজ্ঞতার ছাপ সঞ্চিত থাকছে মনের গহনে, পুরাতনের ছাপ অনবরত জড়িয়ে যাচ্ছে নূতনের সঙ্গে ; তৈরী হচ্ছে বিচিত্র ছাপজট (apperceptive mass)। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট তাঁর শিক্ষাদর্শনে ছাপজটের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। শিশু নূতন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার সময় পুরাতন অভিজ্ঞতার পটভূমিকাতেই তা গ্রহণ করে থাকে, জানা থেকে অজানায় যেতে চায়। পুরাতন অভিজ্ঞতার ছাপজটের উপর ভিত্তি করেই নূতন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় শিশু-মনে। পার্শি নান্‌সাহেব মনের এই দুইটি বৃত্তির নাম দিয়েছেন হোর্মি (Horme) অর্থাৎ উপার্জনীবৃত্তি ও নিমি (Mneme) অর্থাৎ সঞ্চয়ীবৃত্তি। বলাই বাহুল্য, এ দুটি কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়, মানবিক কর্মপদ্ধতির দুটি দিক মাত্র ; বিপরীত কর্ম নয়, পরস্পরের পরিপূরক। আমরা যাকে স্মৃতি বলি সে হচ্ছে মনের এই সঞ্চয়ীবৃত্তির (Mneme) সজ্ঞান স্তর। তাছাড়া নির্জ্ঞান স্তরেও এই সঞ্চয়ীবৃত্তির কাজ চলেছে অব্যাহত ধারায়। মনের গহনে কত কি যে জমা হয়ে চলেছে তার সব খবর আমাদের জানাও নেই। আমাদের জ্ঞানরাজ্যে স্মৃতিরূপে যেটুকু ফুটে আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ডুবে আছে নির্জ্ঞান মনের গভীরতায়।

শুধু মানুষের বেলায় নয়, সমগ্র জীবজগতেই এই ব্যাপারটা ঘটে থাকে। মানুষের বেলায় তার স্মৃতিকে সচেতন মনের ক্রিয়া হিসাবে দেখা যায় কিন্তু

ইতরপ্রাণীর মধ্যে স্মৃতির খেলা দেখা যায় সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) রূপে। কোন কোন পাখি ডিম পাড়বার সময় হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সমুদ্র-পর্বত পার হয়ে চলে যায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে, একটুও পথ ভুল হয় না। তাছাড়া নানাজাতীয় কীট-পতঙ্গ পাখি চিরকাল ধরে একই বিশিষ্ট ধরনের বাসা তৈরী করে যায়, একটুও তার পরিবর্তন নেই। এতে বেশ বোঝা যায় ইতর প্রাণীর মধ্যে স্মৃতি-সংরক্ষণী বৃত্তিটি সমভাবে কার্যকরী।

যাই হোক এই স্মৃতি-সংরক্ষণী বৃত্তির কার্যটি মানুষের বেলায় কিভাবে প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধেও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

কোন কিছু যখন আমরা ভাল করে পড়ি, তখন বেশ মনে থাকে, অথচ কিছুদিন বাদেই তা ভুলে যাই। কিন্তু আবার যদি পড়তে বসি তাহলে দেখা যাবে অনেক সহজেই তা মনে থাকে। কেন এমন হয়? উত্তরে আমরা বলতে পারি না কি—প্রথমবারের পডাটা মনের সজ্ঞান স্তরে অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে সব সময়ে না থাকলেও মনের গহনে থেকে গিয়েছে। দ্বিতীয়বারেব চর্চায় তা ভেসে উঠল মনের উপর তলায়।

অনেক প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কিছু মুখস্থ করতে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই তার ফলটি পুরোপুরি পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্যালার্ড পবীক্ষা করে দেখেছেন একটানা দীর্ঘ কাল ধরে মুখস্থের চেষ্টা না করে মধ্যে কিছু কাল অবসর দিয়ে আবার পডলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। তার কারণ হিসাবে বলা যায়, মনের সজ্ঞান স্তরের কাজটা অবসর কালে মনের নির্জ্ঞান স্তরে সমভাবেই চলতে থাকে। নির্জ্ঞান মনের এই সংযোজন (consolidation) ক্রিয়াটি যে মানসিক সংবক্ষণী বৃত্তির (Mneme) কাজ একথা ত বলাই বাহুল্য।

প্রায়ই দেখা যাবে কাজের ফলটা কাজের অব্যবহিত পরেই দেখা না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে তা দেখা দেয়। এই সময়টা নির্জ্ঞান মনের সংযোজন ক্রিয়া চলতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা কথা কিছুতেই মনে আসছে না। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করেও তার হদিস মিলছে না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বিষয়ান্তরে মন দিলে, কখনও একটা ঘুমের পরে আপনা থেকেই তা মনে পড়ে যায়। বলাই বাহুল্য এটাও হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের সংযোজন ক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম জোন্স রহস্য করে বলেছেন, "আমরা শীতকালে শিখি সাঁতার আর গ্রীষ্মকালে স্কেটিং (We learn to swim in winter and to skate in summer)"—একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে আমরা সাধারণতঃ শীতেই স্কেটিং খেলি এবং গ্রীষ্মে খেলি সাঁতার। তারপর আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুশীলন ছেড়ে দেই। কিন্তু শিক্ষার কাজটা অবসর সময়েও চলতে থাকে মনের নির্জ্ঞান স্তরে। তার ফলে যেটা শীতকালে শুরু করে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার ফলটা পেলাম গ্রীষ্মকালে অথবা গ্রীষ্মকালীন শিক্ষার ফলটা শীতকালে।

সুতরাং পাকাপাকি রকমে কিছু শিখতে হলে নির্জ্ঞান মনের সংযোজনের জন্যে কিছু সময় ছেড়ে দেওয়া দরকার।

শিক্ষা-গ্রহণের এই প্রণালীটি বড়ই অদ্ভুত। মনের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তর জুড়ে এর ক্রিয়া, অল্প অংশই ঘটে আমাদের জ্ঞাতসারে আর অধিকাংশ অজ্ঞাতসারে।

থর্নডাইক একটি ক্ষুধিত বিড়ালকে খাঁচায় পুরে শিক্ষার ক্ষেত্রে চেষ্টা ভ্রান্তির (Trial and Error) যে তত্ত্বটি পরীক্ষা করেছিলেন তাতেও মনের ওই সংরক্ষণী বৃত্তি ও সঞ্চয়ী বৃত্তির খেলা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

বদ্ধ খাঁচা থেকে বেরোবার জন্য বিড়ালটি যতগুলি প্রচেষ্টা করেছিল তার মধ্যে কতকগুলি ব্যর্থ, কতকগুলি সার্থক। এই ব্যর্থতার ও সার্থকতার সম্বন্ধে তার স্মৃতির মধ্যে একটি ছাপ পড়ে মনের সংরক্ষণী বৃত্তির দ্বারা এবং তারই দ্বারা পরিচালিত হয়ে সার্থক প্রচেষ্টার অনুশীলন করে উপার্জনী বৃত্তির দ্বারা। বিড়ালের এইসব দৈহিক ক্রিয়ার পিছনে যে মানসিক ক্রিয়া চলেছে সেটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মনের সংযোজনী বৃত্তির দ্বারা। এইভাবে আমাদের শিক্ষার কাজ চলেছে মনের অর্জন ও সংরক্ষণ বৃত্তিব যুগপৎ প্রচেষ্টায়।

নূতন সৃষ্টি সম্ভবই হয় না পুরাতনের সঞ্চয় না পেলে। সুতরাং সৃষ্টি ও সঞ্চয় কেউ স্বতন্ত্র নয়—পরস্পর নির্ভরশীল। সৃষ্টির সাহায্যেই সঞ্চয়ের সম্পদ বাড়ে আর সঞ্চয়ের সম্পদ জাগায় নূতন সৃষ্টির প্রেরণা।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

শিশুকালে আমরা ভাষাশিক্ষা করেছিলাম, কত কষ্টে কতদিন ধরে একটি একটি শব্দ আর তার অর্থ আয়ত্ত করতে হয়েছে—আজ কথা বলার সময়ে এই জাতীয়-মানসিক প্রচেষ্টা আর করতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই আমরা

কথা বলে যাই। কথা বলার কৌশল ও শব্দার্থ মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে সংরক্ষণী (Mneme) বৃত্তি রূপে। সেই শক্তিটুকুর উপর নির্ভর করে আমরা প্রতিনিয়ত কত নূতন কথা বলে যাচ্ছি, কত নূতন ছন্দে নূতন শব্দে কাব্য রচনা করেছি, বক্তৃতা দিতে গিয়ে কত নূতন শব্দ যোজনা করে চলেছি। এমনিভাবে সঞ্চিত সম্পদকে সম্প্রসারিত করে .চলেছি মনের উপার্জনী (Horme) বৃত্তির সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সঞ্চয় ছাড়া নূতনের উপার্জন হয় না। অতীতের অভিজ্ঞতাই আমাদের নূতনের পথনির্দেশ করে—নূতন পথে পরিচালিত করে।

[This mnemic mass is the matrix in which horme stirs and out of which it emerges, taking definite shape and content as it proceeds. —P. Nunn.]

শিক্ষার লক্ষ্য

(Aims of Education)

শিক্ষার সংজ্ঞা

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে হলে পূর্ব হতেই তার একটা লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয়। বাস্তুকার যখন গৃহনির্মাণ শুরু করে, কুম্ভকার যখন ঘট কলসাদি তৈরী করে, কিংবা স্বর্ণকার যখন কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কার গঠন করতে বসে তখন তারা নির্ণীয়মান বস্তুর একটা বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে নেয়। মানুষের সমাজও যখন মানুষকে তার সুযোগ্য সামাজিক সদস্য হিসাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায় সে তখন শিক্ষার একটা স্থিরলক্ষ্য ধরেই অগ্রসর হয়।—কী সেই লক্ষ্য ?

শিক্ষার লক্ষ্য কি ?

বলাই বাহুল্য এই লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিক বিভিন্ন দিক থেকে এই লক্ষ্যটি স্থির করবার চেষ্টা করেছেন।

আপাত লক্ষ্য ও চরম লক্ষ্য

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—শিক্ষার লক্ষ্য যে একটাই হবে তারই বা ঠিক কি ? মালী যখন একটা আমগাছ যত্ন করে ঘিরে সার-জল দিয়ে সযত্নে প্রতিপালন করে তখন তার আপাত লক্ষ্য হচ্ছে গাছটি বাঁচিয়ে রেখে বড় করে তোলা, যদিও তার মুল লক্ষ্য গাছ থেকে ফল প্রাপ্তি। শিক্ষার লক্ষ্যকেও তেমনি মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—**আপাত লক্ষ্য** (Proximate aim) **চরম লক্ষ্য** (Ultimate aim)। চরম লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে মতভেদ হয়েছে বিস্তর, কিন্তু শিক্ষার আপাত লক্ষ্য যে কিছু অর্থ অর্জন করা, চিন্তায় ও কর্মে কিছু নৈপুণ্য অর্জন করা, নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস-অনুশীলন করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির চর্চা করা, নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করা, এককথায় সমাজের একটি প্রয়োজনীয় সদস্য হিসাবে নিজেকে সর্বরকমে প্রস্তুত করে তোলা, এ বিষয়ে কারো মতভেদ সম্ভবত নেই। শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমরা ত কেবল আক্ষরিক-জ্ঞানসম্পন্ন বা বিচিত্র

তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তি মাত্র বুঝি না, সংস্কৃতিবান ও রুচিপরায়ণ ব্যক্তিও বুঝি। এবং এই বোধটির মধ্যেই পাওয়া যাবে শিক্ষার আপাত লক্ষ্যের পরিচয়।

শিক্ষার আপাত লক্ষ্যেব মধ্যে যেটা সবচেয়ে আজ বড় হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে অর্থোপার্জন বা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বর্তমান শিক্ষাবিদেরা একে ভাত-কাপড়ের লক্ষ্য (Bread and Butter aim) বলে শ্লেষাত্মক নামকবণ কবেছেন। কিন্তু জৈব সংগ্রামে জয়ী হবাব উপযুক্ত আয়ুধ-সংগ্রহ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটা লক্ষ্য হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এইটাই ত শিক্ষার একমাত্র চরম লক্ষ্য হতে পারে না। দৈহিক ক্ষুন্নিবৃত্তিটা অপবিহার্য কাম্য বটে, তবে একমাত্র কাম্য নয়। মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তিবও প্রয়োজন আছে। সভ্যতার পথে মানুষ যতই এগিয়ে চলেছে ততই তার মনের পরিধি দেহকে ছাড়িয়ে চলেছে—(Man cannot live by bread alone); সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে যদি ক্রমবর্ধমান মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তিব ব্যবস্থাপনা না থাকে তবে তা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

সুতবাং সমস্যা হয়েছে চরম লক্ষ্য নিয়ে, যাব ফলে মানুষের মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে।

কিন্তু বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন বিভিন্ন প্রকারের। সামাজিক ক্ষুধাও বিচিত্র ধরনের, তাই তাব ক্ষুন্নিবৃত্তিব ব্যবস্থাও যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকাবের।—সুতবাং শিক্ষার চবম লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শিক্ষার এই চরম লক্ষ্য এবং তার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ শিক্ষার তত্ত্বটিকে যে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন তাকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখতে পারি।

বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে যতরকম মতভেদই থাক, একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জীবনের লক্ষ্যকেই অনুসরণ করে চলে শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন স্থায়ী সংজ্ঞা রচনা করা ত সম্ভব নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন পরিবেশে তা অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন দার্শনিকেরা, এবং সেই সম্বন্ধটিরই ব্যাপক রূপায়ণ ঘটে শিক্ষার মধ্যে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য আলোচনার প্রাক্কালে জগতের স্থূল কয়েকটি দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

এই দার্শনিক চিন্তাধারা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—**অধ্যাত্মবাদী** ও **জড়বাদী**।

অধ্যাত্মবাদী দর্শন

অধ্যাত্মবাদীরা জগৎ ও জীবনের ইহলৌকিক সম্বন্ধটির চরম সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁরা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী আত্মার সত্তায় বিশ্বাসী। জগতের অধিকাংশ ধর্মই এই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।—বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় যাবতীয় দর্শনের এই হল মূল কথা। স্থূল জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন বলে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধিকে একান্তই সাময়িক বলে উপেক্ষা করেছেন। তাই ভারতীয় শিক্ষার চরম লক্ষ্য ইহজীবনের নশ্বর সুখ-বিধানের দিকে নয়, পারলৌকিক অবিনশ্বর সুখবিধানের দিকে। **যে বিদ্যায় মানুষ এই জরামরণ-জর্জরিত প্রপঞ্চময় জগতের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে অবিনশ্বর অধ্যাত্মজীবনে মুক্তিলাভ করতে পারে, নির্বাণলাভ করতে পারে, সেই হল প্রকৃতবিদ্যা**।

প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তায় ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ উভয়েরই স্থান ছিল, কিন্তু কোন দর্শনেই (সম্ভবতঃ চার্বাক দর্শন ব্যতীত) ইহজগতকে চরম বলে গ্রহণ করে নি। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহজীবনকে পরবর্তী অধ্যাত্ম-জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। তাই মুক্তিপ্রদানকারী বিদ্যার অনুশীলন করতে গিয়ে ভারতবর্ষ মানবগোষ্ঠীকে চতুরাশ্রম প্রণালীর মাধ্যমে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিল। বৌদ্ধধর্মও সংঘজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনায় নির্বাণলাভের পথ সুগম করতে চেয়েছিল।

জড়বাদী দর্শন

পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রগুলি আবিষ্কার করে বিশ্বপ্রকৃতির উপরে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে শুরু করল তখন থেকেই তার দৃষ্টি ক্রমশ জড়জগতের সত্যতার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল।

সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ভগবানের অনির্বচনীয় অমোঘ শক্তির উপর মানুষের আস্থা ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। শুরু হল জড়বাদী দর্শনের জয়যাত্রা। যা কিছু দেখা যায়, বোঝা যায়, মাপা যায় তাই নিয়েই শুরু হল নূতন দর্শনের কারবার। এমন কি মানুষের মন চৈতন্য আত্মা সব কিছুরই একটা জড়বাদী দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা শুরু হল। ইহজগতের সুখদুঃখকে এঁরা মিথ্যা নশ্বর বলে অস্বীকার করতে পারলেন না, অস্বীকার করলেন পারলৌকিক জীবনের কাল্পনিক অস্তিত্ব। সুতরাং **শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণের সময়ে তাঁরা ইহলৌকিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছেন।**

অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূল কথাই হল জগৎ সত্য। সুতরাং সত্য জগতের সভ্যতা উপলব্ধির প্রচেষ্টাই জড়বাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য।

ভাববাদী দর্শন

অধ্যাত্মবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে অন্য আর একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক জড়-বাদের প্রচলন আছে—ভাববাদ (Idealism)। ভাববাদ ইহজগতকে বাতিল করে একমাত্র অধ্যাত্মজগৎকেই সত্য বলে স্বীকার করে না। জড়জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করলেও প্রকৃতিবাদের (Naturalism) যান্ত্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় এঁরা বিশ্বাসী নন। বিশ্বজগতের সুশৃঙ্খল কার্যকারণ-সূত্রের অতিরিক্ত এক অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলে এঁরা **জীবন-দর্শনে সত্যশিব সুন্দরের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে চান।**

প্রকৃতিবাদী দর্শন

আবার জড়বাদী দর্শনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে **প্রকৃতিবাদী দর্শন** (Naturalistic Philosophy) এবং **প্রয়োগবাদী দর্শনের** (Pragmatic Philosophy) উদ্ভব।

জড়প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মাবলীর আমোঘত্বে অতিমাত্রায় আস্থাশীল হল প্রকৃতিবাদী দর্শন। তাঁদের মতে জাগতিক সমস্ত বিষয়, এমনকি, মানুষের চৈতন্যসত্তা পর্যন্ত প্রাকৃতিক যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদে শিক্ষা চলবে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে।

প্রকৃতিকে দুদিকে থেকে দেখা যেতে পারে। এক, বহিঃস্থপ্রকৃতি এবং অপর, অন্তঃস্থপ্রকৃতি। প্রথমত, বহিঃস্থপ্রকৃতির নির্দেশ-অনুসারে শিক্ষার গতি

নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ মানুষের তৈরী সামাজিক আচার-নিয়ম-শৃঙ্খলার কৃত্রিমতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রেখে শিক্ষাকে আমোঘ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর আন্তরপ্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য অনুসারে, তার অন্তরের স্বাভাবিক চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এককথায়, **শিক্ষার্থীর আন্তরপ্রকৃতি অনুসারে বহিঃপ্রকৃতির পরিবেশে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হবে শিক্ষার ধারা, তাতে থাকবে না কোন কৃত্রিমতা কলুষতা যান্ত্রিকতা**। এই জাতীয় প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রকৃতিবাদীরা এমন একটা আদর্শ স্তরে গিয়ে উপনীত হন যে প্রকৃতিবাদীরা প্রায়ই ভাববাদীরা সঙ্গে মিশে যান। তাই প্রকৃতিবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক রুশো অনেকের মতে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী মাত্র।

প্রয়োগবাদী দর্শন

প্রয়োগবাদ আধুনিক জগতের সর্বশেষ অবদান। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই অভিনব মতটিকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছেন। এই মতে কোনো কিছুরই স্থায়ী মূল্য নেই। চলিষ্ণু জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। তাই সবকিছুই এখানে আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)।

বিজ্ঞানের আপেক্ষিক মতবাদের দ্বারা এই মত যে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত তা বলাই বাহুল্য। যে তত্ত্ব জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যাবে না এঁদের মতে তার কোন দার্শনিক মূল্যই নেই।

প্রত্যেকটি তত্ত্ব বা তথ্য দার্শনিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্ব এঁরা যাচাই করে নিতে চান তার সার্থকতা কি, মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতা কি? এই মতে গতি আছে কিন্তু বিরতি নেই, কোন স্থির লক্ষ্য থাকতে পারে না এই মতে, কোন স্থায়ী আদর্শের স্বীকৃতি নেই, আছে জীবনের বিচিত্র কর্মে প্রয়োগসার্থক গতি, আছে এগিয়ে চলার বাণী—চরৈবেতি, চরৈবেতি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগবাদীরা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শিক্ষার শেষকথা আরো শিক্ষা, তারপরে আরো শিক্ষা…এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এককথায় **শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল পথগামী**। নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে

জীবন, সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত হয় অভিজ্ঞতা, এগিয়ে চলে শিক্ষা। সুতরাং জীবন ও শিক্ষা সমার্থবাচক।

মোটামুটিভাবে এই কয়টি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে যুগে যুগে দেশে দেশে কি ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত হয়েছে সংক্ষেপে এইবার তার আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার লক্ষ্য—বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে

(১) সুপ্রাচীনকালে **ভারতবর্ষে** অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্ভব ঘটেছিল ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেছি। বিদ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করে দেখা হত—**পরাবিদ্যা** এবং **অপরাবিদ্যা**।

শিক্ষার লক্ষ্য—প্রাচীন ভারতে

মুক্তিজ্ঞান-প্রদায়িনী আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বলা হত পরাজ্ঞান, কিন্তু সকল মানুষই যে আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী হতে পারে না—এই সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাই জড়জগতের ব্যবহারিক বিদ্যাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন নি—তার নাম দিয়েছিলেন অপরাবিদ্যা। অবশ্য অপরাবিদ্যা থেকে যে পরাবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হত তা বলাই বাহুল্য। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্রদের শেখান হত অপরাবিদ্যা। শিক্ষার প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্যভাবে তা শেখান হত না।

শিক্ষার লক্ষ্য—প্রাচীন গ্রীসে

(২) প্রাচীনত্ব হিসাবে ভারতের পরেই **প্রাচীন গ্রীসের** কথা উল্লেখ করতে হয়। গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্র ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির উপর এককালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উপর যে ইয়োরোপীয় প্রভাব ভুরিপরিমাণ, সে কথা না বললেও চলে।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যাবে স্পার্টা ও এথেন্সের দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী। শিক্ষা পদ্ধতির বেলাতেও তার অন্যথা হয় নি। **স্পার্টার** জীবনদর্শনে স্টেটের সর্বময়তা প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেকটি স্পার্টান জন্মগ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে স্টেটের জন্য। স্টেটের সে একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাছাড়া তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—দুর্বলের স্থান নেই পৃথিবীতে—এই হল স্পার্টানদের স্থির বিশ্বাস। প্রত্যেকটি স্পার্টানকে তাই বাধ্যতামূলক-

ভাবে সৈনিক হতে হবে। যারা দুর্বল বা বিকৃতাঙ্গ হয়ে জন্মাত তাদের রাষ্ট্রের বোঝাস্বরূপ মনে করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হত। শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বরূপের কোন মূল্যই ছিল না, একমাত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই তাদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। তাই স্পার্টার শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল **সবল দেহ** ও **শক্ত মন** (Hardy mind in a hardy body)।

বিপরীতক্রমে **এথেন্সের** শান্তিময় জীবন-পরিবেশে গড়ে উঠেছিল সত্যশিবসুন্দরের আদর্শবাদ। সক্রেটিস প্লেটো এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের প্রভাবে এথেন্সবাসীর জীবনদর্শনে আনন্দ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না, নাগরিকেরা নিজ নিজ রুচি-অনুসারে দর্শন সাহিত্য ললিতকলার চর্চা করতে পারত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তিগত রুচি শক্তি সামর্থ্যের সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব হয়েছিল। তবে ব্যক্তিসত্তাব উপর বেশী জোর দেওয়ায় সমাজ-সংহতি তেমন জোরাল হতে পারে নি। এথেন্সীয় শিক্ষার মূল কথা ছিল **সুন্দর দেহে সুন্দর মন** (Beautiful mind in a beautiful body)।

সোফিস্ট

এথেন্সীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ আরো চরমে উঠেছিল **সোফিস্ট** নামে একদল গ্রীক শিক্ষকদের হাতে। এঁরা সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করে ব্যক্তি-সত্তাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং শিক্ষার সার্বজনীনরূপ তাঁরা স্বীকার করতে পারেন নি। তাঁদের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত **ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশ**—এছাড়া আর কিছুই নয়।

মধ্যযুগে ইয়োরোপে

মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এথেন্সীয় আদর্শবাদের কিছু প্রভাব পড়েছিল বটে কিন্তু তাদের জীবনদর্শন ছিল পৃথক। খ্রীষ্টীয় শাসিত নীতি-বোধ মানুষকে মূলতঃ পাপাশ্রয়ী বলে ধরে নিয়েছিল। অনুতাপ, আত্মশাসন পাপস্বীকার প্রভৃতি ধর্মানুশাসনসম্মত আচার ব্যবহার অনুসরণ করে চলাই ছিল মধ্যযুগের আদর্শপন্থা। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল তখন **ধার্মিক মানুষ তৈরী করা।**

রেনেসাঁস—মানসিক বৃত্তির অনুশীলন

মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগোদয় (Renaissance) ঘটল

ইয়োরোপে। এবং এই নবযুগের অরুণালোকে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রতিটি বিভাগ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে গেল। চার্চশাসিত ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ-জীবনে ধ্বনিত হল মানুষের জয়গান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির চাহিদার উপর জোর দেওয়া হল। এথেন্সীয় শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত অতীন্দ্রিয় জীবনকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও তা প্রাপ্তির পথ হিসাবে তাঁরা **মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনকেই** শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিলেন। বুদ্ধি স্মৃতি কল্পনা যুক্তিস্থাপনা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের জন্য তাঁরা বিচিত্র পাঠক্রম নির্দেশ করেছিলেন।

রুশোর প্রকৃতিবাদ

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় রুশোর 'শিক্ষায় **প্রকৃতিবাদ**' (Naturalism in Education)। মানবসমাজের সর্বনাশা কৃত্রিম পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশে স্থাপনপূর্বক তার অন্তর্নিহিত ভাবগুলির বিকাশ সাধনই তাঁর মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মানসপুত্র এমিলের শিক্ষাধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এই প্রকৃতি-নির্ভর কৃত্রিমতাহীন শিক্ষার কথা প্রচার করেছেন।

তাঁর মতে প্রকৃতির কোলে একান্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর যে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটবে সেই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

(Education comes to us from nature, men and things ; and since the co-operation of the three educationists is necessary for their perfection, it is to the one over which we have no control (i.e. nature) that we must direct the other two—Rousseau)

রুশো তাঁর সময়ে ফরাসী ধনী-সমাজের অন্তঃসারহীন আড়ম্বরপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্লেদক্লান্ত নৈতিক জীবনের ভয়াবহ বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করে সমগ্র মানবসমাজ ও সভ্যতার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে শিশুকে মানুষের গড়া সমাজের এই পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে দূরে অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর এমিল্ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মানবসমাজের প্রতি তীব্র বিষোদগার। সূচনাতেই তিনি আরম্ভ করেছেন "God makes all

things good, man meddles with them and they become evil." কিন্তু এটা যে সত্যদৃষ্টি নয় পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কাছে তা ধরা পড়তে দেরী হয় নি।

প্রকৃতি যে সব সময়েই কল্যাণকর আর মানুষের সমাজ যে সব সময়েই কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে—একথাও সব সময়ে সত্য নয়। বরং এর উল্টো কথাও বলেছেন অনেক দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি।

ফরাসী দেশেরই একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক মোপাসাঁ গল্পপ্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন—

Nature is our enemy···we must always fight against Nature, for She is continually bringing us back to an animal state."

যাইহোক শিক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে রুশোর দান 'শিশুকেন্দ্রিকতা'র মূল্য সর্বজনগ্রাহ্য হলেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে প্রকৃতিবাদ-নির্ভর মত ত্রুটিশূন্য নয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার—সুসম্পূর্ণ জীবনযাপন

পরবর্তীকালে মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন **সুসম্পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতকরণ** (Preparation for complete living)। এই প্রস্তুতির প্রথম সোপান হল জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী অটুট স্বাস্থ্যলাভ। জীবনধারণ, জীবিকা-অর্জন, সন্তানপালন এবং সর্ববিধ নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন, এমনকি সুষ্ঠুভাবে অবসর-বিনোদনের জন্যও চাই অটুট স্বাস্থ্য। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার শিশুশিক্ষায় শারীরিক শক্তি-অর্জনের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন অথচ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের দিকের কথা আদৌ বিবেচনা করেন নি।

ভাবীজীবনের প্রস্তুতি

কোন কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার লক্ষ্যকে আরো ব্যাপক আরো স্থিতিস্থাপক করবার জন্য বলেন **ভাবীজীবনের জন্য প্রস্তুতিই হল শিক্ষার মূলকথা** (Preparation for future living)। কথাটা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট। ভাবীজীবন বলতে কি বুঝি, ভাবীজীবনের কি লক্ষ্য—এই সব প্রশ্নের মীমাংসা পূর্বাহ্নেই করে নেবার দরকার। জীবনের লক্ষ্য স্থির হলে তবেই ত তার প্রস্তুতির লক্ষ্য স্থির হবে। যাই হোক, এই মতবাদীদের কাছে অর্থাৎ যারা শিক্ষাকে প্রস্তুতিকরণের কৌশল হিসাবে দেখেছেন তাঁরা ছাত্রের বর্তমান জীবনের কোন আত্যন্তিক মূল্য স্বীকার করেন নি। কাদার তালকে

টিপেটুপে যেমন ধীরে ধীরে পুতুল গড়া হয়, তেমনি মানবশিশুকেও শিক্ষার টিপুনি দিয়ে ভবিষ্যতের জ্ঞানী মানুষ গড়বার চেষ্টা।

চরিত্র গঠন

আধুনিক কালের বহু শিক্ষাবিদের মতে **চরিত্র গঠন** (Character building) হল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাবিদ রেমণ্ট বলেছেন—শিক্ষকের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্মল চরিত্র গঠন—শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য মাংসপেশী গঠনও নয়, মানসিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য জ্ঞানার্জন বা অনুভূতির উৎকর্ষসাধনও নয়।

[The teacher's ultimate concern is to cultivate nor wealth of muscles, nor fullness of knowledge nor refinement of feelings, but strength and purity of character—Raymont.]

অবশ্য চরিত্র বলতে এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে কতকগুলি নিষেধাত্মক নৈতিক অনুশাসন মেনে চলা মাত্র বুঝায় না—জীবনের সর্বাঙ্গীন আচার-ব্যবহার রীতি নীতিব সুষম বিকাশই বুঝায়—(Character is sum total of conduct.)

মুদালিয়র কমিশনও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে এই প্রকার চরিত্র গঠনের কথাই বলেছেন—যে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে ভবিষ্যৎ সমাজের পরিপূর্ণ মঙ্গলবিধান করিতে সমর্থ হয় সেই চরিত্র-গঠনই হল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। [···The supreme end of the educative process should be the training of the character and personality of students in such a way that they will be able to realize their full potentialities and contribute to the well-being of the community—Mudaliar Commission's Report.]

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশেব শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। দেশ কাল ভেদে এদেব মধ্যে কোনও একটি অগ্রাধিকার পেয়েছে, কখনও বা সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে এদের কিছু ইতরবিশেষ করে নূতন লক্ষ্য নির্ণয় করবার চেষ্টাও হয়েছে।

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ আলোচনা করবার পূর্বে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে যখন দলবদ্ধ হতে শিখল তখন থেকেই উদ্ভব হল দলপতির, রাজার অর্থাৎ একনায়কত্বের। দলের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছিল দলপতির, তেমনি আবার দলপতির প্রয়োজনে নিযুক্ত হতে লাগল দল, ব্যষ্টির স্বার্থে সমষ্টি। এমনি করে কাটল সুদীর্ঘকাল এবং এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বেদনাময়। বেদনার মাত্রা যখন কোথাও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে তখনই সেখানে অকস্মাৎ শুরু হয়েছে জনগণের অগ্নিগর্ভ হিমশীতল আগ্নেয়-গিরির প্রচণ্ড লাভা উদ্গীরণ। সেই লাভাপ্রবাহে সমাধিস্থ হয়েছে কত রাজবংশ কত রাজসিংহাসন। বড় ভয়াবহ সে ইতিহাস। রক্তের অক্ষরে সে ইতিহাস লেখা হয়েছে যুগে যুগে—ক্রমে মানুষ তার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝতে পেরেছে একনায়কত্বের সর্বনাশা পরিণতি।—অর্জন করেছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, বুঝতে পেরেছে ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টির শাসনের প্রয়োজনীয়তা—সে শাসন হয়ত কখন কুশাসন হতে পারে কিন্তু দুঃশাসন হবে না, কারণ তার অপসারণের চাবিকাঠিটা রয়েছে সমষ্টির হাতেই। তাই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষের শাসনের পরিবর্তে জনগণের শাসনকে অভ্যর্থনা জানান হচ্ছে।

এই জাতীয় শাসনের বল্গা যাদের হাতে থাকবে, তারা কোন বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে জন্মাবে না। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তাকে মেনে নেবে নায়ক হিসাবে সাময়িকভাবে। এই মেনে নেওয়ার উপরেই তার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার। এই হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবার গুরু-দায়িত্বটা পরোক্ষভাবে এখন পড়েছে প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপরে। কারণ গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের সিংহাসন জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধি বিবেচনার উপরে স্থাপিত।

সুতরাং আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দৃঢ়মূল করতে হলে জন-গণের শিক্ষাদীক্ষাও যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে চালাতে হবে। এর অন্যথা হলে ভেঙে পড়বে গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো, গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে—ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা আবার উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে।

এককথায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল উপাদানই হল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক। প্রত্যেকটি নাগরিকের শিক্ষার উপরই নির্ভর করছে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যত উচ্চ আদর্শই আমরা প্রচার করি না কেন বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের দিনে শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শের স্থান বোধ হয় সর্বাগ্রে। কারণ নাগরিকতা শিক্ষাব সাফল্যের উপরই রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করবে। প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তাধারা আজ তার ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনহিতকর আদর্শ ব্যাহত হতে বাধ্য। এই গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাগরিকতার শিক্ষার দায় ও দায়িত্বের কথা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন জন ডিউই। [Education has a responsibility for training individuals to share in this social control instead of merely equipping them with ability to make their private way in isolation and competition.]

স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে তাদের সকল শিক্ষার মূল কথাই হবে সুনাগরিকতা শিক্ষা—একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ভাবতবর্ষ সুদীর্ঘ কাল ধরে এক সাম্রাজ্যবাদী জাতির অধীনে থাকার ফলে রাজ্য পরিচালনার কোন দায়িত্বই তাদের কোনদিন নিতে হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর—প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে এবং এই দায়িত্ব বহনের মত ক্ষমতা তারা যেন লাভ করতে পারে সেইভাবে তাদেব গড়ে তুলতে হবে। এই কথা মুদলিয়র কমিশনও বার বার উল্লেখ করেছেন—[Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsiblity for which every citizen has to be carefully trained.]

দ্বিতীয়ত, বহুকাল পর-শাসনের আওতায় থাকার ফলে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে, ভারতীয় জীবনধারণের মান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় একেবারে নীচের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই, অভাব নেই অমিত সম্পদের সম্ভাবনার। আজ ভারতবাসীকে মানুষের মত বাঁচতে হলে প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ হতে হবে সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে বুদ্ধির দ্বারা, শ্রমের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা।

তৃতীয়ত, ভারতের বুকে আজ অজ্ঞানতার, অশিক্ষার বিরাট পাষাণভার। সেই পাষাণভার অপসারিত করে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে আজ শিক্ষায় সাংস্কৃতিতে নবজীবন দান করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের এই দায় ও দায়িত্বের কথা সব সময়ে স্মরণ রেখেই আজ তার শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করার দরকার।

গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকটি নরনারীকে আজ যে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হচ্ছে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত অবহিত নন। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যের সমস্ত কিছু পরিচালনার ভার কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শে সমস্ত কিছু পরিচালনার ভার জনগণের হাতে। তাই জনগণকে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রবার্ট লো একদিন ঘোষণা করেছিলেন—"আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে সর্বাগ্রে।" [We must educate our masters.]

গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য

সুতরাং এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে **গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষার লক্ষ্য** হওয়া উচিত—

প্রথমত, নিরঙ্কুশ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা এবং নূতন ভাবধারা গ্রহণের উপযোগী **মনের সাবলীলতা** (the capacity for clear thinking and a receptivity to new ideas) যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা।

মনের এই সচ্ছলতা সাবলীলতা না থাকলে চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়, উপরন্তু বিভিন্ন সাময়িক হুজুগে প্রভাবিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকবে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, সব কিছুই **সংস্কারহীন খোলা মন** নিয়ে বিচার করার ক্ষমতা থাকা উচিত। [open mind receptive to new ideas] অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতি মোহ মানুষের দৃষ্টিতে যখন নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনা করে দেখবার ক্ষমতা সংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখে তখন কখনই সত্যদর্শন ঘটে না। মত্ত মনের প্রসারতা থাকে না সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীর মনে আগে থেকে যেন কোন সংস্কারের ঠুলি পরিয়ে দেওয়া না হয়।

তৃতীয়ত, **লিখন ও বাচনের স্পষ্টতা** (clearness in speech and in

writing) চিন্তার স্বচ্ছতা না থাকলে লিখন ও বাচনের মধ্যে অস্পষ্টতা এসে যায়। নিজের মত নিজের ইচ্ছা নিজের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে জানান যায় না। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

চতুর্থত, **পরার্থপরতা**। গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হল "সকলের তরে আমরা সকলে, প্রত্যেকে আমরা পরের পরে"—এইভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া। সকলে সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ সহকারে বসবাস করা, প্রত্যেকের সুখ-দুঃখে সংবেদনশীল হওয়া, প্রত্যেকের জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে যথাসাধ্য সাহায্য করা। এর জন্য চাই **নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, সামাজিক সংবেদনশীলতা** ও **সহনশীলতা** গুণের বিকাশ সাধন। এইগুলি প্রত্যেকটি সামাজিকতা-বোধের ভিত্তিভূমি এবং তার উপর দাঁড়িয়ে আছে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ। সামাজিকতা-বোধের গোড়ার কথাই হল 'সবে মিলে করি কাজ' এবং সবে মিলে কাজ করবার মূলকথা হল নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা।

শিশুকাল থেকেই এই গণতান্ত্রিক গুণগুলির অনুশীলন আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ই তার প্রকৃষ্টতম স্থান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্ব প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, পঠনপদ্ধতি এবং বিদ্যালয়-পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে এগুলি গেঁথে দিতে হয়, এইটেই হল আধুনিক যুগের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। মোটকথা, বিদ্যালয়ের সমাজজীবনে যদি ছাত্রেরা সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দময় পরিবেশ শান্তিপূর্ণভাবে চলতে শেখে তবেই পরবর্তী নাগরিক জীবনও তারা গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবে।

এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত শিশুমনে গণতান্ত্রিক গুণের বিকাশসাধন। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্য দিয়েই হোক বা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে দিয়েই হোক এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলবে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ।

বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ (International understanding)

শিক্ষার এই সব গণতান্ত্রিক গুণাবলীর চর্চা করার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র সুনাগরিক তৈয়ী করাই নয়, বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ (International understanding) বা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি জাগ্রত করা। কথাটা স্পষ্ট করে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে

দেশকালের বাধা ক্রমশই ঘুচে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি ঘটছে মুহূর্ত মধ্যে তা আমাদের গোচরীভূত হয়ে পড়ছে, দুস্তর সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত পার হয়ে মুহূর্ত মধ্যে মানুষ আজ দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে চলেছে। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে আজ মানুষের গতি অবাধ। একদিন ছিল 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ'; আর আজ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এতটুকু ছোট হয়ে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। রেডিও টেলিভিসন মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকজনদের মধ্যে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিশ্বময় আজ মানুষের বন্ধু, মানুষের আত্মীয় ছড়িয়ে আছে। এর ফলে মানুষে মানুষে হৃদ্যতা বাড়ছে, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে। একদেশে খাদ্যাভাব ঘটলে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী উদ্বৃত্ত ফসলের দেশ থেকে খাদ্য চলে আসছে। কোথাও কোন্ নৈসর্গিক বিপদপাত ঘটলে সারা বিশ্বের দরদী মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেবার হস্ত প্রসারিত করে দিচ্ছে।

এককথায় বলতে গেলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দেশকালের বাধা দূর হয়ে গিয়ে সমস্ত বিশ্ব যেন একটি ছোট মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

মানুষে মানুষে এই ঘনিষ্ঠতা এক দিক দিয়ে যেমন কল্যাণকর হয়েছে অন্যদিক দিয়ে তেমনি জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-হিংসা-লোভ মিলনের পথকে নিঠুর করে তুলছে। কবির ভাষায় বলতে পারি—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'।

এই হিংসা-দ্বন্দ্ব-কলহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে উঠতে সময় সময় এমন মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হয় যে মানব-সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা ঘটে। ক্ষমতার দম্ভ এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আজ সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আশঙ্কায় কম্পিত। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দু-দুটো মহাসমর পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে চলে গেল, মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে গেল কতশত বৎসরের সভ্যতার উপাদান, পুড়ে গেল কোটি কোটি মানুষের সুখের নীড়।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষত ভাল করে না শুকোতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের করাল দংষ্ট্রার আভাস দেখা যাচ্ছে। মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় সমগ্র বিশ্ব যেন মেতে উঠেছে। বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে নিত্যনূতন মারণাস্ত্র

জন্মলাভ করছে—এ্যাটোম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। ভয়ার্ত পৃথিবী আজ সর্বনাশা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

যুদ্ধের এই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীগণ বার বার চেষ্টা করেছেন পৃথিবী থেকে চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে—কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গড়ে উঠেছিল "জাতিসঙ্ঘ" বা "লীগ অব নেশনস্" (League of Nations)। আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল এ সংঘ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কোন জাতিই জাতিসঙ্ঘের নির্দেশ মেনে চলছে না—কারণ কোন জাতির মন থেকেই তখনও যুদ্ধের লালসা তিরোহিত হয় নি। উপরে উপরে যুদ্ধ বিরতির ভান করে তলায় তলায় চলেছে যুদ্ধেব প্রস্তুতি।—এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—আরো ভয়াবহ, আরো সর্বনাশা। তারপর যুদ্ধক্লান্ত দেশের মনে আবার জাগল শ্মশান বৈরাগ্য। গড়ে উঠল 'সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ' (United Nations Organisation)। কিন্তু তারো ভাগ্য প্রায় 'লিগ অব নেশনস'-এর মতই দেখা যাচ্ছে। বার বার যুদ্ধ-নিবৃত্তির সঙ্ঘ গড়ে, প্রচার-পরিকল্পনা চলে, কিন্তু যুদ্ধের নিবৃত্তি আর ঘটে না।

কেন এমন হয়? পৃথিবীর স্থিরবুদ্ধি মানবপ্রেমিক মনীষীবৃন্দ ভেবে দেখলেন বিষবৃক্ষের মুলোচ্ছেদ না করে শুধু বর্ধিত বৃক্ষের শাখা-পল্লব ছেদন করে তার বিষক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। মানুষেব মনের মধ্যে থেকে যুদ্ধের ইচ্ছাকেই দূরে করতে হবে সর্বাগ্রে। তা যদি পারা যায় তবেই পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারবে, নচেৎ নয়। হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে ভালবাসা প্রীতি সহনশীলতা প্রভৃতি গুণের অনুশীলন শিশুকাল থেকেই করা যায় তবেই যদি কোনদিন পৃথিবী থেকে যুদ্ধভীতি দূর হয়। মানুষেব মনের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি আছে তাকে শৃঙ্খলিত নির্যাতিত করে তাব পরিবর্তে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এই কার্যটি একমাত্র শিক্ষাব 'মাধ্যমেই করা সম্ভব, এবং বিদ্যালয় থেকেই এর সূচনা হবে। সুতরাং বর্তমান যুগেব এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে **সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভাব অনুশীলন করা।**

এই লক্ষ্যে উপনীত হতে প্রথমেই শিক্ষার্থীর জীবন-দর্শন ত্যাগের

আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের দেশ কোন দিনই পার্থিব ভোগসুখকে বড় করে দেখেনি, ত্যাগের মধ্যে ভোগের আনন্দ অনুভব করে বলছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জিথ"। ভারতের সেই সনাতন বাণীর সার্থক অনুশীলনের মধ্যেই আজ জগতের মুক্তি।

দ্বিতীয়ত, পরমত-সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। সমাজের মধ্যে চলতে গেলেই অনেক সময় মতান্তর ও মনান্তর ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ধীর-ভাবে সহ্য করে গেলে বা শান্তভাবে যুক্তি-পরিচালিত হয়ে চললে হয়ত সহজেই সংঘর্ষ এড়ানো যায়। এর জন্য চাই স্বার্থশূন্য স্বচ্ছ সহানুভূতিশীল দৃষ্টি।

বিদ্যালয়ের কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি ভালভাবে চালানো যায় তাহলে শিক্ষার্থীর মনে এই সব সামাজিক বৃত্তিগুলি সহজেই বিকাশ লাভ করতে পারে।

তাছাড়া শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে হলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করে চলা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-বোধ জাগ্রত করবার উপায়

প্রথম, অন্যদেশ রাষ্ট্র ধর্ম বা অধিবাসী সম্বন্ধে কোন প্রকার তুচ্ছতার ভাব যেন মনে না আসে, এবং এই সম্বন্ধে নিন্দাসূচক বা গ্লানিকর কোন কিছু রচনা যেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে না থাকে। প্রত্যেকটি দেশের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে ছেলেদের মনে। এমন কি, কোন ঐতিহাসিক সত্যও যদি এই সম্প্রীতি রক্ষার পরিপন্থী হয় তবে তাও আলোচনা করা চলবে না। UNESCO-র তত্ত্বাবধানে তাই এই জাতীয় অনেক বই আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে। তার ফলে আমাদের শিশুর বিভিন্ন দেশের সম্প্রীতিমূলক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় থাকা দরকার। কারণ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেশে দেশে মানুষ যেমন বিদ্বেষের ক্ষুদ্রতায় বিচ্ছিন্ন, জ্ঞানের ও সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে তেমনি তারা মনুষ্যত্বের আত্মীয়তার আবদ্ধ। তাই বিভিন্ন দেশের শিল্প ও ললিতকলার প্রদর্শনী ঘন ঘন হওয়া দরকার। এবং সেই সব প্রদর্শনীতে ছাত্রেরা যাতে যেতে পারে, দেখতে পারে, শিখতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

তৃতীয়ত, সংবাদপত্রগুলিতে জাতি-বিদ্বেষের হলাহল ছড়ানোর পরিবর্তে যেন সম্প্রীতির অমিয় বাণী প্রচার করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ছাত্রদের এই জাতীয় সংবাদপত্র পাঠে উৎসাহিত করতে হবে।

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি মিশন, সাংস্কৃতিক মিশন বিনিময় করা ভাল। তার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

পঞ্চমত, বিভিন্ন দেশের শান্তিপ্রিয় সাধাবণ মানুষের সুখদুঃখময় জীবন-কাহিনীর নাট্যরূপ ও চলচ্চিত্র দেখান ভাল। পৃথিবীর সকল মেহনতী মানুষই যে একই দুঃখ-বেদনাময় স্তরে আছে সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মানুষ যেন অবহিত থাকে।

ষষ্ঠত, জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ, পৃথিবীর কোন কোন উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় তারিখ অথবা UNESCO কর্তৃক নির্দিষ্ট মিলন প্রচেষ্টাসূচক কোন কোন উৎসবের তারিখ বিদ্যালয়ে ভালভাবে উদ্‌যাপিত হলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ভাবটা অনেকখানি দূর হয়ে যাবে।

সপ্তমত, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথাসাধ্য অন্যান্য দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পঠন-পাঠন ও আলোচনা করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে প্রত্যেকটি দেশে পারস্পারিক ভাব বিনিময় হতে পারে।

অষ্টমত, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিনিময় করলে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বন্ধন নিবিড় হয়।

মোটকথা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত বেশী ভাবের আদান-প্রদান ঘটবে, সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ ঘটবে ততই। আমরা অনুভব করব বিরোধের মধ্যে মিলনের মাহাত্ম্য, শত্রুতার মধ্যে বন্ধুত্বের প্রীতি। শিশুকাল থেকে শিক্ষার মাধ্যমে এই গুণাবলীর অনুশীলন ভালভাবে করতে পারলে তবেই ভাবী নাগরিকবৃন্দের মন থেকে উৎপাটিত হবে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ। উদ্ভূত হবে আন্তর্জাতিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাদ

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে যত প্রকার মতের উদ্ভব ঘটেছে সংক্ষেপে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হল। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে কিন্তু দেখা যাবে শিক্ষাকে মোটামুটিভাবে দুটো বিপরীত দিক থেকে দেখা হয়েছে।

এক, **শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে** এবং অপর, **সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে—**

এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে আছে দুই বিপরীতমুখী দর্শনের দ্বন্দ্ব—মানুষের জন্য সমাজ, না সমাজের জন্য মানুষ। এবং এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি হল শিক্ষাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে হবে, না সমাজতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে—এই জাতীয় বিপরীতধর্মী মতের দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বটি পরে ভালভাবে আলোচনা করে দেখা যাবে। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত প্রাচীনতম। সমাজবোধ জাগ্রত হবার আগে থেকেই ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়েছে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী অগ্রগণ্য। **ভারতবর্ষে** আশ্রমিক-শিক্ষা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রচিত।

শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথা হল, জাতিগত হিসাবে মানুষে মানুষে যত মিলই থাক ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষ অনন্যসাধারণ। প্রত্যেকেরই রুচি-রীতি বুদ্ধি সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাবিদেরা এর নাম দিয়েছেন সুষমবিকাশ (Harmonious development)। রাষ্ট্রের বা সমাজের কাজ হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করে তোলা। এঁদের মতে রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রধান কর্তব্য। একান্ত বহিরঙ্গ দিকটাতেই মাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, তা নইলে প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, এবং জনারণ্যে সে একক। কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে প্রত্যেকটি মানুষ। সেই গুণগুলিকে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of individual potentialities.)

তাছাড়া শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শবাদী জীবনদর্শন থেকে উদ্ভুত মনে করা যেতে পারে। এই দর্শনে মনে করা হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষ একটি আদর্শ নিয়ে, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই আদর্শকে লাভ করা

এবং উদ্দেশ্যকে সফল করাই হল সেই জীবনের চরম সার্থকতা। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই মানুষের সেই নির্ধারিত জীবনপথ থেকে সরিয়ে এনে অন্যপথে পরিচালিত করার। কারণ তাঁদের মতে শিক্ষা হচ্ছে আত্মোপলব্ধিরই (Self-realisation) নামান্তব।

আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ জন লক্ বা রুশো উভয়েই বলেছেন মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র গঠন করেছে নিজের সুবিধার জন্য, আত্মবিকাশের সুযোগ লাভের জন্য। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের চাহিদা মিটানোর জন্যই সব সময়ে প্রস্তুত থাকবে, সমাজের চাহিদার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব যেন কখনই সঙ্কুচিত না হয়ে পড়ে।

শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদ

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন এর বিপরীত কথা। তাঁদের মতে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ফল হল সমাজ। একক অসহায় মানুষ যখন শিখল দল গড়তে, সমাজ গড়তে, তখন থেকেই হল সভ্যতার অগ্রগতি—সুতরাং সমাজের দাবী হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির দাবী। সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক মানুষ বহুদিন. পূর্বেই সমাজের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সমাজের মধ্যেই মানুষকে আজ বেঁচে থাকতে হবে। তাই সমাজের দাবী হল মানুষের বাঁচার দাবী—একে অস্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই আজ অস্বীকার করতে হয়।

সুতবাং আজকের সামাজিক মানুষের শিক্ষা আজ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ বাঁচে, সমাজের চাহিদা পূরণ হয়। আমরা আমাদের অনেকখানি চিন্তার কর্মের এবং আচার-আচরণের স্বাধীনতা খর্ব করে তবেই সমাজ গড়তে পেরেছি। প্রত্যেকেই যদি যথেচ্ছ আচার-ব্যবহার করে চলেন তাহলে সমাজ-বন্ধন টেকে না, সভ্যতার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষকে ফিরে যেতে হয় আবার সেই একক বন্য অবস্থায়। সুতরাং শিক্ষা-প্রণালী যদি সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচি ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় তাহলে হবে মানব-সভ্যতার ঘোরতর দুর্দিন। তাছাড়া ব্যষ্টিকে নিয়েই ত সমষ্টি, মানুষকে নিয়েই ত সমাজ। সমাজের কল্যাণ হলেই অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ হবে। দুই একজনের যদি ক্ষতি হয় বৃহত্তর মানবের কল্যাণের জন্য তা স্বীকার করে নিতেই হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—সমাজের. রাষ্ট্রের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্যই নেই।

কোন কোন দার্শনিক আবার আরো এগিয়ে বলেন সমাজ শুধু ব্যষ্টির সমষ্টিই নয়, তার স্বতন্ত্র প্রাণ আছে, অস্তিত্ব. আছে, চাহিদা আছে। বিশাল সমাজদেহে প্রত্যেকটি মানুষ তার এক-একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র, তার বেশী নয়। দেহেব উপকার হলে দেহাংশগুলিরও যে উপকার হবে তা বলাই বাহুল্য।

কেউ কেউ বলেন যে পরিবেশে অর্থাৎ যে-সমাজে যে রাষ্ট্রে সে আবির্ভূত হয়েছে সেই বিশাল সমাজ-সৌধ বা রাষ্ট্র-সৌধ গঠনে সে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক মাত্র। মিস্ত্রীরা যেমন বাড়ী গড়তে গিয়ে বাড়ীর পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন ইঁটকে বিভিন্নভাবে ভেঙ্গেচুরে বসায় তেমনি রাষ্ট্র বা সমাজের স্বার্থেব খাতিরে স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলীন করে দিতে হবে।

এই মত বড় কম প্রাচীন নয়। স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ যেদিন থেকে নিজের স্বার্থে একত্রিত হতে শিখেছে সেই দিন থেকেই সে এই একত্রীভূত সংস্থার মাহাত্ম্য অনুভব করতে শিখেছে, ব্যষ্টির স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থে উৎসর্গ করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছি পুবাতন স্পার্টানদের। দুর্বল শিশুব সেখানে বাঁচবারই অধিকার ছিল না, কারণ কৌম সংঘর্ষের দিনে সে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারত না। তাই সেদিনকার স্পার্টান শিক্ষার লক্ষ্য ছিল কঠিন দেহে কঠিন মন গড়ে তোলা (Hardy mind in hardy body)। এথেন্সবাদীদের মধ্যে কৌম সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকায় তারা বলতে পেরেছিল সুন্দর দেহে সুন্দর মন—(Beautiful mind in a beautiful body) এবং বিপরীতক্রমে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত।

সুতরাং এখন সমস্যা দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাচনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সমাজকর্তৃত্ব ; এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় ? কিন্তু সত্যই মানুষ কি তার গঠিত সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় ? মানুষ কি কখনও নিজেকে ভাবতে পারে আর সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ? পার্সি নান সাহেবের ভাষায় বলা যেতে পারে মানব শিশু যখন পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করে তখন সমাজ যেমন তার দেহে বস্ত্র পরিয়ে দেয় তেমনি অন্তরও ভরে দেয় ভাবসম্পদে। কিন্তু পৃথিবীতে এসেই পৃথিবীকে যেভাবে পায় সে ত তার একক পৃথিবী নয়। সমগ্র মানবসমাজ যেন কত যুগ ধরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে তার

জন্যে শত সহস্র সভ্যতার উপকরণ সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। সুতরাং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে ত ভাবাই যায় না।

—তাহলে এখন প্রশ্ন, মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে? সমাজের দাবী এবং সমাজের প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত পথ অনুবর্তন করে সে সমাজের ঋণ শোধ করবে, না—নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিশিষ্ট পথটাই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য?

এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক নান্ সাহেব ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখিয়েছেন, যুগে যুগে এর উত্তর মিলেছে কত বিচিত্র ধরনে। হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রের জয়গান যেমন, সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে তেমন আর কারো নয়। রাষ্ট্র সেখানে একটা জনসংঘ মাত্র নয়, তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তারি স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যষ্টির জীবন (Every man exists for the State)। এই ধরনের স্টেটের জয়গান স্বৈরাশাসিত রাষ্ট্রে আমরা আজও শুনতে পাই। নাৎসী জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে গড়ে উঠেছে স্টেটের সর্বময়তা। প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তা সেখানে একমুখী করে তোলা হয়েছে—My Country, right or wrong, 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—এই উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র মদিরা পরিবেশন করেছে সেখানকার শিক্ষাকেন্দ্রগুলি।

এই বিপরীত মতের প্রতিধ্বনি মিলবে কাণ্টের দর্শনে, এবং রুশোর চিন্তায়। ব্যক্তিকল্যাণে রুশো তীব্র ভাষায় সমাজকে বর্জন করবার নির্দেশ দিয়েছেন—[Whatever comes from the hand of the author of Nature is good, and everything gets defiled in contact with man.]

এই জাতীয় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐতিহাসিক কারণও আবিষ্কার করেছেন নান্ সাহেব। ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, ব্যক্তিত্বের চাপে যখনই সমষ্টির জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে তখনই রাষ্ট্রের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব ইয়োরোপে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হল হেগেলীয় দর্শনের সমষ্টির জয়গান। আবার সমষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতা যখন ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখনই কাণ্টের superman বা অতিমানবের আবাহনসঙ্গীত শোনা গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে মানুষ তার আত্মবিকাশের সঞ্জীবন মন্ত্র অনুসন্ধান করেছে কখন ব্যষ্টির মধ্যে, কখন সমষ্টির মধ্যে। পার্সি

নান্ সাহেব দুটি দিকই ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মত দুটি আদৌ বিপরীতধর্মী নয়, বরং একটা অপরের পরিপূরক বলে ধরা যেতে পারে।

উভয় মতের সমন্বয়

সমাজের প্রভাব যেমন মানুষের উপর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, আবার মানুষের দ্বারাও ত সমাজ প্রভাবান্বিত, সমাজ আছে বলেই ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য—[Man is never individual when alone—Chesterton] এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর করে বলেছেন—

"একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক ; কেননা একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে, সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি—"অর্থাৎ বহুমানবের অসংখ্য রেখার স্পর্শে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের ছবিখানি ফুটে ওঠে সমাজের পটভূমির উপরে। সহজ করে বলতে পারা যায়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করে তোলার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা করে দেয় সমাজ তার নিজেরই কল্যাণে এবং সমাজের সমগ্র সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে বড় হয়ে উঠবে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মহত্ত্বের মধ্যে দিয়েই সমাজ হবে মহত্তর। যে সমাজে মহীয়ান মানুষের সংখ্যা অধিক, যে সমাজের মানুষ তার নিজস্ব মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিচ্ছে, তার গরিমা কি সে সমাজ পাবে না? সে সমাজ কি সভ্যতার পথে আরো এগিয়ে গেল না? পৃথিবীর যাঁরা নমস্য—সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রদীপগুলির তেল সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছেন এবং তার পরিবর্তে বহুগুণিত করে তাঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন সে ঋণ, তার দীপ্তি দিয়ে ঔজ্জ্বল্য দিয়ে।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষার লক্ষ্য কোন একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিহিত নেই। ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দিয়ে সমাজের দাবী পূরণই শিক্ষার লক্ষ্য নয়, আবার সমাজকে অস্বীকার করে পলায়নী মনোবৃত্তির সাধনাও শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে সমাজের এবং সমাজের কল্যাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ যাতে সুন্দরভাবে হয়, সার্থকভাবে হয়, তাই হল বর্তমান যুগের শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার লক্ষ্য—পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন

বর্তমান শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আরো একটা নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছেন—সে হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন। (Adjustment to the environment)।

জীবন মানেই হল পরিপার্শ্বের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন। একদিকে জীবনীশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের প্রচেষ্টা, অপর দিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির অন্ধ-লীলাবৈচিত্র্য, এই দ্বন্দ্ব চলেছে সৃষ্টির আদি যুগ থেকে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত বিশালকায় জীবের কঙ্কাল দিয়ে লেখা রয়েছে এই দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর কাহিনী। প্রকৃতির সঙ্গে যারা নিজেদের অভিযোজন করে নিতে পারে নি প্রকৃতি তাদের ক্ষমা করে নি, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে। যারা পেরেছে তারাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ টিকে আছে।—শুধু টিকে আছে তাই নয় সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে প্রকৃতির ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে।

সুতরাং জীবনের মূলধর্মই হল স্থিতিস্থাপকতা এবং বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে মিলিয়ে নেবার, অর্থাৎ অভিযোজন করবার ক্ষমতা। নানা বিরুদ্ধ-শক্তির মধ্য দিয়ে কঠিন জড়প্রকৃতির পাষাণ ভেদ করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে জীবলীলা। এবং এই জীবলীলা তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে নিরন্তর অভিযোজন করে চলেছে তার সর্ববিধ পরিপার্শ্বের সঙ্গে।

মানুষকে কেন্দ্র করে যে পরিপার্শ্ব গড়ে ওঠে তাকে আমরা মোটামুটি তিনটে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি—

প্রথম, নৈসর্গিক পরিবেশ ; দ্বিতীয়, সামাজিক পরিবেশ এবং তৃতীয়, অন্তর পরিবেশ।

নৈসর্গিক পরিবেশ

নৈসর্গিক পরিবেশ তার জড় প্রকৃতি নিয়ে চিরচঞ্চল প্রাণশক্তিকে আবৃত করে রেখেছে। প্রাণশক্তিও প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর নিজেকে অভিযোজিত করে চলেছে—শুধু অভিযোজিত করেই সে সন্তুষ্ট হতে পারে নি, অন্ধ প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টাও করেছে। এই উদ্ঘাটনের কাজে যেটুকু সে সফল হয়েছে সেইখানেই সে প্রকৃতির শক্তিকে সঙ্কুচিত করে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এইখানেই মানুষের সঙ্গে অপর প্রাণীর পার্থক্য। মানুষ ও প্রকৃতির এই শক্তির দ্বন্দ্বে মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রকৃতির নিষেধ অমান্য করে, প্রকৃতিকে জয় করে।

সামাজিক পরিবেশ

এমনিভাবে অভিযোজন চলেছে সামাজিক ক্ষেত্রেও। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের প্রভাব তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সঙ্কুচিত করে দিতে চায়, আর মানুষ তার প্রভাব দিয়ে সমাজশক্তিকে নিজের মত করে ভেঙ্গে গড়ে নিতে চায় —সকলেই পারে না, যারা পারে তারা অপরের জন্য পথ তৈরী করে দিয়ে যায়। আজকের দিনের সমাজ-ব্যবস্থা জটিল—রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক অর্থনৈতিক নানা সমস্যা আজ মানুষকে টানছে বিভিন্ন দিকে। স্বার্থের সংঘাত আদর্শের সংঘাত আজ মানুষের অগ্রগতির পথকে পদে পদে ব্যাহত করছে। ভাবজগতেও বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, মানুষকে করে দিচ্ছে দিশাহারা। গতানুগতিকতার বাঁধা পথে চলতে গেলে আজকের দিনের সামাজিক পরিবেশের সার্থকভাবে অভিযোজন করা সম্ভব হবে না। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সঙ্কুচিত করে মানুষের অধিকার যেমন বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে মানুষের কর্মক্ষেত্র, মানুষের চিন্তাক্ষেত্র।

প্রাকৃতিক জগৎ ছোট হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভাবজগৎ আজ বৃহত্তর হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করে চলেছে। এই বৃহত্তর ভাবজগতের সাথেও আজ আমাদের মিলিয়ে নেবার সাধনা। আজকের দিনের শিক্ষার আদর্শে যদি এই বহুবিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ইঙ্গিত না থাকে তবে তা কোন কাজেই আসবে না মানুষের। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাহাত্ম্যে দেশ ও কালের গণ্ডী পড়ছে ভেঙে। নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবী আজ যে দাবী নিয়ে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে উপনীত, তার উত্তর চাই আজকের দিনের শিক্ষার মধ্যে।

শিশু বড় হয়, নানা ভাব-সংঘাত, নানা জীবনাদর্শের সংঘাত তাকে বিচলিত করে দেয়। আজকের দিনের শিক্ষায় যদি তার এই দৈনন্দিন দ্বন্দ্বের কোন সমাধান না থাকে তবে সে শিক্ষা হবে তার কাছে অর্থহীন এবং জীবন থেকে বিচ্যুত।

আন্তর পরিবেশ

আর একদিকের অভিযোজন আন্তরজগতে অর্থাৎ মানুষের নিজের মনের সকল বিরোধের সার্থক সমন্বয়। কথাটা শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু সকল অভিযোজনের বড় কথাই হল নিজের অন্তরের মধ্যে ভাবজগতের অভিযোজন এবং এই হল সকল শিক্ষার গোড়ার কথা।

প্রত্যেকের মনে রয়েছে কত বিরোধ, কত বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত। এই বিরোধ মানুষের প্রচেষ্টাকে একমুখী হতে দেয় না। দ্বিধা সংকোচের ভাব তাকে কোন কিছুই ভাল করে গ্রহণ করতে দেয় না। যুগসঞ্চিত সংস্কারের শৃঙ্খল পায়ে বেঁধে মানুষ যখন সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চায় তখন দোটানায় পড়ে গতানুগতিকতার বৃত্তপথ অনুবর্তন করেই তাকে ঘুরতে বাধ্য হতে হয়।

এই দুর্ঘটনা থেকে তাকে বাঁচতে হলে তার আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া শিক্ষার আর কোন আদর্শই তাকে আত্মবিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

এমনিভাবে জড় ও প্রকৃতির সাথে, সমাজ-চেতনার এবং সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্বের সাথে সার্থকভাবে অভিযোজন করে চলতে চলতে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সভ্যতার জটিল পথ অনুসরণ করে। এই অভিযোজনের কাজ দ্বিমুখী। একদিকে পরিপার্শ্ব অনুযায়ী মানুষ তার ব্যবহারকে, চিন্তাকে এবং ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আবার অন্যদিকে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী পরিপার্শ্বকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলচে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সংস্কৃতি। শিক্ষার এই অভিযোজনমূলক লক্ষ্যই দেবে এই ভাবে এগিয়ে যাবার শক্তি।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে এতক্ষণ যে সব আলোচনা করা হল সেগুলি যে পরিমাণে তত্ত্বনিষ্ঠ সে পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ নয়, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ তত্ত্ব হিসাবেই তাদের যৌক্তিকতা বিচার করা হয়েছে, দৈনন্দিন বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগসিদ্ধির কথা চিন্তা করা হয় নি।

আগেই বলেছি শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জাতির জীবন-দর্শনের উপরে এবং জীবনদর্শনও আবার সামাজিক অর্থনীতির উপরে প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। এককথায় মানুষের সামাজিক অর্থনীতির প্রভাব পড়ে তার জীবনদর্শনের উপর এবং সেই জীবনদর্শন অনুযায়ী নির্ধারিত হয় তার শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

বর্তমান যুগে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি তাকে অস্বীকার করে কোনও এক কাল্পনিক 'সব পেয়েছির দেশের' জীবনদর্শন

নিশ্চয়ই অবাস্তব। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য আলোচনায় ব্যাপক দৃষ্টিতে যা দেখা হয়েছে, তত্ত্ব হিসাবে তা সত্য হলেও বাস্তবজীবনের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে তাকে আরো সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রেখে দেখতে হবে।

শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া মনে করলেও বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মাধ্যমে যে জ্ঞানার্জন ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হয় সংকীর্ণ অর্থে তাকেই আমরা শিক্ষা বলে থাকি।

এই শিক্ষারও একটি বিশেষ লক্ষ্য মনের মধ্যে পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিতে হয়, না হলে কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যসূচী (curriculum) নির্মাণ করা হবে তাও এই লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে। লক্ষ্যের সঙ্গে পাঠ্যসূচীর যোগাযোগটি যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই তা বিভ্রান্তিকর হয়। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজেও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করবার সময়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

প্রথমত. শিক্ষার লক্ষ্যটি হবে পরিবর্তনসাপেক্ষ। মানুষের সমাজ ত গতিহীন স্থাণু নয়, নানা পাবিপার্শ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে অভিযোজন করতে করতে এগিয়ে চলেছে মানুষ। পরিবর্তিত হয়ে চলেছে তার সামাজিক বিধিব্যবস্থা। সুতরাং সেই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ছন্দ রেখেই শিক্ষার লক্ষ্যও পবিবর্তিত হয়ে চলবে।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে কখনো বলা হয়েছে চরিত্র-গঠন, কখনো সর্বাঙ্গীন বিকাশ, কখনো বা আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি ইত্যাদি—কিন্তু এই লক্ষ্যগুলি বিচার করলেই দেখা যাবে এগুলির সংজ্ঞা বদলেছে যুগে যুগে। একযুগের প্রশংসিত আদর্শ আর এক যুগে ধিক্কৃত হয়েছে। সুতরাং কাল-পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যেরও পরিবর্তন অনিবার্য।

বিদ্যালয় ত সমাজেরই সৃষ্টি, সমাজেব স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। তাই স্বার্থবোধ বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাছে সমাজের দাবীও হবে ভিন্নতর। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে লক্ষ্যে উপনীত হবার পথটিও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকা চাই। বিদ্যালয়ে গৃহীত পাঠ্য যদি লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ বলে মনে করা যায়, তাহলে পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যের দিকে কতটুকু অগ্রসর

হওয়া গেল তাও বিচার করে দেখতে হবে। অর্থাৎ পাঠ্যসূচীকে যেন নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপলক্ষ হিসাবে দেখা হয়। পাঠ্যসূচীভুক্ত বিষয়বস্তুর পাণ্ডিত্যই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে না ওঠে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার লক্ষ্য যেন কখনও শিক্ষার্থীর আয়ত্তের বাইরে না যায়। সাধারণতঃ লক্ষ্য বলতে এমন একটি দুরধিগম্য আদর্শ আমরা কল্পনা করে নি যা শুধু কল্পনাতেই থাকে, বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই জাতীয় দুর্লভ লক্ষ্য কখন কাউকে অগ্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সেইজন্য শিক্ষার লক্ষ্য বলতে আমরা যা সব বলি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁথিগত বস্তু হয়েই থাকে, কখনই অনুশীলন-যোগ্য হয় না।

চতুর্থতঃ, লক্ষ্যটি যেন সব সময়েই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধরনের সংজ্ঞা নির্দেশ করলে তা থেকে সুসম্বদ্ধ পাঠক্রম প্রস্তুত করা যায় না। অথচ লক্ষ্যে উপনীত হবার পাঠক্রম নিধারণ না করতে পারলে লক্ষ্য কখনও আয়ত্তের মধ্যে আসে না।

পঞ্চমতঃ, লক্ষ্যের সংকীর্ণ অর্থে, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনায় যে লক্ষ্যের কথা বলা হল তার মধ্যে একটা যুক্তির পারম্পর্য থাকা চাই। বিদ্যালয়ের পঠনব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—নিম্নতর, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। এই তিন ধারার লক্ষ্যের মধ্যে নিশ্চয়ই ইতরবিশেষ থাকবে—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিনের মধ্যে যেন একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকে, পারম্পর্য থাকে, তবেই এই তিনে মিলে এক মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Education Association) গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার যে লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন তাকে নিম্নলিখিত চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে:

(১) আত্মবিচার—

শিক্ষা যে গ্রহণ করবে প্রথমতঃ তাকেই বিশ্লেষণ করতে হয়। শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? মনে যার উৎসাহ, বাচনভঙ্গী যার সুস্পষ্ট, লিখনভঙ্গী প্রাঞ্জল, চিন্তাধারা সংস্কার মুক্ত, জীবনের সর্ববিধ সমস্যা সমাধানে যে সক্ষম, শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে এমনি একটা ছবি ফুটে ওঠে আমাদের মনে। তাছাড়া দেহে ও মনে প্রচুর স্বাস্থ্য, খেলাধুলায় আমোদ-উৎসবে সভাসমিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম, অবসর বিনোদনের সুষ্ঠু কৌশল আয়ত্তাধীন, সঙ্গীত চিত্রাদি ললিতকলার দিকে আগ্রহশীল—এই গুণগুলিও

আমরা শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই আশা করব। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে আত্মবিকাশের এই বিষয়গুলি যেন যথোচিত চর্চা করবার সুযোগ থাকে এবং সেই অনুসারে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যেন আত্মবিচার করতে পারে।

(২) মানবতাবোধ—

শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য নির্ণীত হবে শিক্ষার্থীর মনে মানবতাবোধ জাগ্রত করে দেবার চেষ্টায়। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হবেন। বন্ধুবান্ধব স্বজন-পরিজন পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পদে-বিপদে মিলে-মিশে সহযোগিতামূলকভাবে বসবাস করতে পারা একটা মস্ত গুণ। পরার্থপরতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও পরোপকারিতা গুণগুলির যাতে বিকাশ ঘটে তারও ব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাব্যবস্থায়।

(৩) অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা—

অর্থনৈতিক দিক থেকেও প্রত্যেকটি মানুষ যেন আত্মনির্ভর হতে পারে তার ব্যবস্থাও শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে অবশ্যই থাকবে। তাই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচনের উপদেশ-নির্দেশ দেবার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তি যেন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কিছু উৎপাদনক্ষম হয় এবং অন্যের উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করতে পারার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য অর্জন করে।

(৪) সামাজিকতা—

সমাজে বসবাস করবার শিক্ষাও আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা চাই। মনের এইসামাজিক বৃত্তিই ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তায় পর্যবসিত হবে।

শিক্ষার যে চারটি মৌলিক দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হল, এইটেই যে শেষ কথা এমন নয়। এছাড়াও অবশ্য আরো বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার উপযোগিতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারা

(Modern Trends in Education)

শিক্ষার প্রাচীন ভাবধারা

আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—

"···ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।—"

—এটা শুধু আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির কথাই নয়। পৃথিবীর সব দেশেই এককালে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা হত। শিক্ষা দেওয়া মানেই হল, শিশুর মনে কতকগুলো জ্ঞানের কথা পুরে দেওয়া। সুতরাং শিক্ষার কাজে একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হল শিক্ষকের পাণ্ডিত্য। শিক্ষক যতবেশী পাণ্ডিত্যের আধার হবেন, ততই তিনি যোগ্য শিক্ষক বলে পরিগণিত হবেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যার সাগর শিক্ষক বিদ্যা বিতরণ করে চলবেন আর অসহায় ছোট শিশুরা তাদের সাধ্যমত সেই সাগর থেকে এক-আধ গণ্ডুষ বিদ্যা অঞ্জলি পুরে ঘরে নিয়ে যাবে।

শিক্ষাবিতরণের এই পদ্ধতিটিকে কোন কোন শিক্ষাবিদ সমালোচক 'ছোট-পাত্র-বড়পাত্র তত্ত্ব' (Jug-mug theory) বলে রহস্য করেছেন। শিক্ষা দেওয়া মানে হল, পূর্ণ বড়পাত্র থেকে যেন শূন্যগর্ভ ছোট ছোট পাত্রে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া। পাত্র যদি কারো ছিদ্রযুক্ত হয় বা নিতান্ত ছোট হয় তাহলে ত তার ভাগে এক ফোঁটা জলও ধরবে না। তা না ধরুক, বিদ্যা কি সকলের হয়? কেউ বা একে বলেন, 'পাইপ-লাইন তত্ত্ব' (Pipe-line theory)। বড় জলাধার থেকে নল লাগিয়ে যেমন ছোট পাত্রে জল ঢেলে দেওয়া, তেমনি শিক্ষকের পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ছেলেদের শূন্য মনে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া। কেউ বলেন—

'কুম্ভকার-মৃত্তিকা তত্ত্ব' (Clay-potter theory)। কুম্ভকার যেমন নরম কাদার তাল টিপেটুপে ইচ্ছামত নানারকম পুতুল তৈরী ক'রে, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ইচ্ছামত ও ক্ষমতামত শিক্ষার টিপুনি দিয়ে মানুষ তৈরী করেন। এতে নির্জীব কাদার তালের কিই বা বলবার আছে ?

শিক্ষায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

কিন্তু শিক্ষা মানে ত কতকগুলি জ্ঞানের কথা মুখস্থ করে রাখা নয়—শিক্ষার অর্থ আরো ব্যাপক, আরো গভীর। শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীন বিকাশ হিসাবে দেখলে কেবল মাত্র পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের ব্যর্থতা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বস্তু—শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থী অচ্ছেদ্য-ভাবেই সংযুক্ত।

এই তিনটির মধ্যে শিক্ষক আর শিক্ষণীয় বিষয় এই দুইটিই এককালে ছিল প্রধান লক্ষণীয়, শিক্ষার্থীর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল না। সে ছিল একেবারে—'সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে'—অবহেলিত উপেক্ষিত। কে শেখাবেন এবং কী শেখাবেন—এই হল বড় কথা; কে শিখবে সে কথা ত বাহুল্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশুর কোন স্বাধীন সত্তাই কারো চোখে পড়েনি। তাই তাদের শিক্ষার পদ্ধতিটাও ছিল একেবারে বয়স্কদের শিক্ষারই অনুরূপ। ছোটদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবেচনা ছিল না, তাদের দেখা হত বড়দেরি ছোট সংস্করণ হিসাবে। তাই মন্‌রো বলেছেন, "টেলিস্কোপের উল্টো দিক দিয়ে দেখলে বড়দের যেমন দেখায় সেকালে আমরা তেমন দৃষ্টি দিয়েই দেখতাম শিশুদের।"

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদান

এই গতানুগতিক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল আঠারো শতকের বিখ্যাত চিন্তানায়ক জঁাক জ্যা রুশোব কণ্ঠে।

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্য যে রুশোই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তা নয়। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো থেকে শুরু করে কমেনিয়াস, লক প্রমুখ শিক্ষাবিদেরাও নিজ নিজ দার্শনিক মতামত অনুযায়ী শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু রুশোই প্রথমে সার্থকভাবে শিক্ষার

ক্ষেত্রে শিশুর প্রাধান্য ঘোষণা করলেন। তাঁর বিখ্যাত 'এমিল' গ্রন্থে শিশু-শিক্ষার মূল তত্ত্ব প্রচার করলেন—'শিক্ষার জন্য শিশু নয়, শিশুর জন্যই শিক্ষা।' রুশোর এই তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিল। 'যে শিক্ষা এতকাল বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল সেই শিক্ষার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হল শিশু স্বয়ং; তাই এই শিক্ষার নতুন নামকরণ হল শিশু-কেন্দ্রিক (Paido centric) শিক্ষা। এই হল শিক্ষা-জগতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মূলকথা।) রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদের উৎস থেকে শিক্ষার এই আধুনিক ভাবধারা উৎসারিত হল। তাই রুশো আধুনিক শিক্ষার জনক।

ফ্রেডেরিকা ম্যাকডোনাল্ড রুশোর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"রুশোর সবল অপ্রতিহত কণ্ঠ সমগ্র ইউরোপে মানুষের অধিকারের দাবী জানিয়েছিল, কিন্তু তার চেয়েও জোরে যা ধ্বনিত হয়েছিল, তা হল শিশুর অধিকারের কথা * * * পেস্তালৎসি ও ফ্রয়েবেলেরও পূর্বে তিনি এক নূতন শিক্ষানীতি প্রচার করলেন এবং আধুনিক সভ্যজগৎ থেকে শিক্ষার নামে শিশু-উৎপীড়নের অবসান ঘটালেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে শিশুর আনন্দময় প্রভাতকে এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছিল—"

শিশু-শিক্ষায় এই শিশু-কেন্দ্রিক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনে রুশোর নাম শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগেই বলেছি, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূলকথা হল শিক্ষার কার্যে শিশুর কথাই মনে রাখতে হবে সর্বাগ্রে। শিশুর মন, শিশুর রুচি, শিশুর চিন্তা, বুদ্ধি সামর্থ্য এই সকল বিচার করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে।

রুশো বললেন—শিশুর প্রকৃতি অনুসারেই নির্ধারিত হবে শিক্ষার প্রণালী ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা

রুশোর এই তত্ত্বটিকেই আরো স্পষ্টভাবে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করলেন রুশোর ভাবশিষ্য পেস্তালৎসি। শিশুর প্রকৃতি জানা মানেই হল (শিশুর মনস্তত্ত্বকে জানা।) তাই পেস্তালৎসি সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটি শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—(I wish to psychologise education—Pestalozzi)।

শিক্ষার এই নতুন ভাবধারাটিকে সার জন য়্যাডাম ল্যাটিন ব্যাকরণের একটি সূত্রের উপমা দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"Verbs of teaching govern two accusatives, one of the person another of the thing : Magister Latinam Johannem docuit—the master taught John Latin—"

"শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিখিয়েছেন—"

এই ল্যাটিন বাক্যটির কর্তা শিক্ষক, কিন্তু কর্ম জন ও ল্যাটিন। পুরানো পদ্ধতির শিক্ষায় প্রাধান্য ছিল ল্যাটিন কর্মের, কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে প্রাধান্য জনের। (The old teachers laid most of the stress on Latin, the new lay it on John—John Adam) সুতরাং প্রাচীন কালের ল্যাটিন-জানা শিক্ষকের বর্তমানে কোন মূল্যই থাকবে না যদি তিনি জনকে ভাল করে না জানেন। আগেই বলেছি, জনকে জানা মানেই হল জনের মনস্তত্ত্ব জানা। সুতরাং (আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথাই হল মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা।)

শিশুমন কি চায়, কোন দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কিসে তার আনন্দ-বিষাদ, তার অনুরাগ-বিরাগ, কতটুকু তার বুদ্ধি-বিবেচনা সামর্থ্য—এ সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ দার্শনিকেরা যে সব সত্য উদ্ঘাটন করেছেন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রসঙ্গে সেগুলি সব সময়েই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

শিশুকে কি শেখাতে হবে এবং কি করে শেখাতে হবে, এই দুটো সমস্যারই সমাধান করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক সত্য অনুসন্ধান করে।

রুশো শিক্ষার যে নতুন পথের দিশা দেখালেন, যে তত্ত্বের ইঙ্গিত দিলেন পরবর্তীকালে পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবেল, মন্তেস্বরী প্রমুখ শিক্ষাবিদবৃন্দ তাকে শ্রেণী কক্ষের পাঠদান-প্রক্রিয়ার মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত করে তুললেন। হার্বার্ট পরে এইসব মনস্তত্ত্বমূলক শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুললেন।

শিক্ষা বনাম পাণ্ডিত্য

শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ভাবধারার আর একটি বড় কথা হল পাণ্ডিত্য (Instruction) ও শিক্ষা (Education) এই দুটো শব্দের মধ্যে মূলগত পার্থক্য

নির্দেশ করা। সেকালে শিক্ষা বলতে পাণ্ডিত্য অর্জন বা জ্ঞান সঞ্চয়ের পরিমাণ বোঝান হত। বহু তথ্যে-সমৃদ্ধ পণ্ডিত তৈরী করাই ছিল শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু সমস্ত জগৎকে একমাত্র ছাপা-বই-এর মধ্যে দিয়ে দেখা কখনই সত্য দেখা নয়। (শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে পুরোপুরি মানুষ করে তোলা, মানুষের চরিত্র গঠন করা এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে গড়ে তোলা। অর্থাৎ দৈহিক (Physical) মানসিক (mental) ও আত্মিক (spritual) এই তিন দিকেরই সুষম বিকাশসাধন করা—এই হল বর্তমান যুগের শিক্ষার সংজ্ঞা।)

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গিয়ে বলছেন—"মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া আমাদের স্বভাবের বিধান ছিল।" শিক্ষার আধুনিক ভাবধারায় এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে।

সর্বজনীন শিক্ষা

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে সমাজকেন্দ্রিকতায়। আগেকার মতে শিক্ষালাভের অধিকার কেবল অভিজাত শ্রেণীর ভাগ্যবানদেরই ছিল। শিক্ষাকে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকার করা হয়নি। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দি। ইয়োরোপেও রুশোর আমলে শিক্ষার যে সঙ্কীর্ণ পরিসর ছিল তা শুনলে অবাক হতে হয়।

—সেকালে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল, চাল-চলন কথাবার্তা শেখা, নাচ গানের মাষ্টারের কাছে নাচ-গান শেখা—যাতে তারা বড় হয়ে 'বনেদী ঘরের' চাল রক্ষা করতে শেখে—(Ancient Regime.—Taine)।

আধুনিক শিক্ষায় এই সব সঙ্কীর্ণতা ঘুচাবার চেষ্টা চলেছে।

সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, শিশু সেই সমাজেরই অংশ। বর্তমান শিশু-শিক্ষায় তাই সমাজবোধ জাগ্রত করবার ব্যবস্থা। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান; শুধু তাই নয় বিদ্যালয় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ।

তাই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সহজেই সামাজিতকা গুণের অনুশীলন হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত বিশিষ্ট্যেরও যাতে চর্চা হতে পারে—আধুনিক শিক্ষায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশু তার বিদ্যালয়-জীবনে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে-মিশে সহযোগিতামূলক কর্মের মধ্যে দিয়ে অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে যায়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে হলেও সামাজিক পটভূমি দরকার, কারণ বহু বিচিত্রের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করে চলতে চলতেই ব্যক্তিগত গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করে।

(Individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on common interests and common activities—P. Nunn)

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষার ভাবধারায় শিক্ষাকে একান্তভাবে গ্রন্থ-নির্ভর করে না রেখে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলা হয়েছে। শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে তারা সব সময়েই কর্মচঞ্চল। সব সময়েই তারা কিছু করতে চায়, ভাঙতে চায়, গড়তে চায়, নতুন কোন কিছু কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকতে চায়। শ্রেণীকক্ষের চারদেয়ালের মধ্যে চুপচাপ বসে নীরস পুস্তকের পাতা থেকে জ্ঞানগর্ভ বাণী আহরণ করা তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই আধুনিক শিক্ষার মূল কথাই হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (learning by doing)। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম গ্রন্থ নয়, কাজ। এইজন্য শিক্ষার আধুনিক ভাবধারায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সকল কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে কেবল যে শিক্ষাটাই পাকা হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, চিত্তের প্রসারতা ঘটে এবং সৃজনী-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে বলে শিক্ষার প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

(Students can put in their best effort only when the relationship between their life and their lessons is made manifest, for this will create the necessary feeling of

interest and provide the requisite motivation—M. Commission's Report.)

শিশুর আনন্দ ও স্বাধীনতার মূল্য স্বীকার করা হয়েছে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে। বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা আজকাল নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখা হচ্ছে। বাইরে থেকে ভয় দেখিয়ে শাসন করার কোন মূল্যই নেই আধুনিক শিক্ষাবিদদের কাছে। ছেলেরা আনন্দচিত্তে একান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাধুলা করবে, পড়াশুনা করবে। পড়াশুনাটা ভয়ের বস্তু হবে না, আনন্দের বিষয় হবে। ছাত্রেরা নিজের দায়িত্বে স্বাধীনভাবে যাতে পড়াশুনা করে, এই দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন আজকালকার শিক্ষাবিদেরা।

শিশু-শিক্ষায় কিণ্ডারগার্টেন বা মন্তেস্বরী পদ্ধতি শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও স্বাধীনতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে।

শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদা

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদারও পরিবর্তন ঘটেছে যথেষ্ট। প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন শিক্ষা-রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়ক। শিক্ষার্থীর সেখানে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে। সে আজ শিশুর সামনে নয়, পাশে। শিক্ষকের ভূমিকা আজ শিক্ষার্থীর বন্ধু, সহযোগী ও পথ-প্রদর্শক—তাই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব বেড়েছে অনেক, মর্যাদারও নব মূল্যায়ন হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও আবেগের মূল্য

আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (Instinct) আর আবেগের (Emotion) কোন মর্যাদাই ছিল না। বাইরের থেকে জ্ঞানের বোঝা শিশুর চিত্তের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে, তার ভাললাগা মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দের কোন কথাই নেই।

অথচ বর্তমানের শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক আবেগ ও প্রবৃত্তির মর্যাদা সমধিক, এই প্রবৃত্তি আর আবেগকে ত বাহিরে থেকে জোর করে চাপা দেওয়া যায় না; সে তার প্রকাশের পথ আবিষ্কার করে নেবেই। স্বাভাবিক পথ যদি না পায় তবে অস্বাভাবিক সমাজবিরোধী পথেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে সৃষ্টি

করবে সমস্যামূলক দুর্মেধা বালক।—তাই আধুনিক শিক্ষার মূল কথাই হল প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের সুষ্ঠু উদগতি।

বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি

বুদ্ধিবৃত্তির (Intellect) চর্চাই ছিল এককালে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন সেইখানে হৃদয় বৃত্তির (Emotion) চর্চারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

হৃদযবৃত্তির সুষ্ঠু অনুশীলনের ফলেই মানুষ সার্থক সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। সুতবাং আজকের দিনে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অনুষ্ঠানাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীর সামাজিক বৃত্তিব সহায়ক হৃদয়াবেগের অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি

শিক্ষাদান-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আধুনিক ভাবধারা একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

পদ্ধতি বলতে আগে আমরা জানতাম পাঠ্যপুস্তকেব শুষ্ক পত্রগুলি বেত্র সাহায্যে ভীত সন্ত্রস্ত শিশুকণ্ঠে জোর করে পুরে দেওয়া—কটূক্তির মসল্লা ছাড়া তাতে আর কিছু বড়-একটা থাকত না।

কিন্তু বর্তমান শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি শিশুর রুচি সামর্থ্য বুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রবণতা বিচার করে শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হয় বলে নানা প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর (individualistic) পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডালটন পরিকল্পনা, উইনেটকা পরিকল্পনা, ডেক্রলি পদ্ধতি, বাটাভিয়া পদ্ধতি, ইত্যাদি সর্বপ্রকার পদ্ধতির মূল কথাই হল শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের মর্যাদা স্বীকার।

(শিশু ভালবাসে খেলা করতে, তাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রীতিই শিক্ষাদানের কাজে লাগান হয়েছে মন্তেস্বরী ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে।)

(শিশুরা শ্রেণীকক্ষে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকতে চায় না, অপরের হুকুমে চলাফেরা করেও তাদের তৃপ্তি নেই, তারা নিজেদের হাতে সব কিছু করতে চায়। অসীম কৌতুহল শিশুদের। তারা সব কিছু নেড়ে-চেড়ে দেখতে চায়, বুঝতে চায়—তাই শিক্ষায় নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে—প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method), ওয়ার্ধা পদ্ধতি।)

এইভাবে শিক্ষা হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর নির্ভরশীল, অথচ শিক্ষার্থীর সামাজিকবোধ জাগ্রত করতে হবে। নান্ সাহেবের ভাষায় বলা যায়—শিক্ষাকে ব্যক্তিতা ও শিক্ষার্থীকে সামাজিকতার উপর স্থাপন করতে হয়। (individualise education but socialise the pupil—Nunn).

আধুনিক শিক্ষালয়

আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষালয়েরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরানো দিনের শিক্ষালয়কে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন—'কলে-ছাঁটা বিদ্যা উৎপাদনের কারখানা', 'বেত্ররাজ-অধিরাজিত পুস্তকভার-জর্জরিত নিষ্করুণ কারাগৃহ'। কিন্তু বর্তমান দৃষ্টিতে শিক্ষালয়ের নূতন নামকরণ হল শিশুর বাগান (Kinder-garten) অথবা শিশুভবন (Casa-dei-Bambini)।

গৃহ আর বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান গিয়েছে ঘুচে। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম আবহাওয়ায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে একান্ত পুঁথিগত অবাস্তব বিমূর্ত শিক্ষাধারার পরিবর্তে বর্তমানে আনন্দময় পরিবেশে শিশুমনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতিতে জীবনধর্মী বাস্তব শিক্ষার প্রবর্তন করার চেষ্টা চলেছে সব দেশে।

("The New Education is an educational philosophy that is improving school room practices, making learning a purposeful process, giving children the sense of reality in the school, making schools into work-shops laboratories and inspiring educational experimentations."—Horne)

আমাদের দেশেও আজ এই নূতন শিক্ষার অরুণোদয় লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানাদিক দিয়া আঘাত করিতেছে—জ্ঞান সামগ্রীর সীমা, ভারতের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের

মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে, সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে, এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।”

কার্য-সমস্যা পদ্ধতি

(Project Method)

প্রজেক্ট পদ্ধতির অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকে এর নাম নিয়েছেন "কার্য-সমস্যা পদ্ধতি"। অবশ্য কার্য-সমস্যা পদ্ধতি—এই নামটির মধ্যেই এই পদ্ধতির কার্যপ্রণালীর ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই সব জিনিস হাতে নাড়াচাড়া করে দেখেশুনে শিখতে চায়। কোনকিছু যদি সমস্যার আকারে তাদের সামনে আসে তবে তা সমাধান করতে গিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি জেগে ওঠে, আগ্রহ উদ্দীপনা বর্ধিত হয়। তাই কোন শিক্ষার বস্তুকে সোজাসুজি গ্রন্থনিবদ্ধ অবস্থায় শিশুমনের দরজায় হাজির না করে সমস্যামূলক কাজের আকারে আনলে তা অধিকতর কার্যকরী হয়! এই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরই কার্য-সমস্যা পদ্ধতি গঠিত হয়েছে।

যাই হোক ডাঃ স্টিভেনসন এই পদ্ধতির একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—কোন একটি সমস্যামূলক কার্যকে তার স্বাভাবিক পটভূমিতে রেখে যদি সার্থকভাবে সমাধান করা যায়, তবেই তাকে কার্য-সমস্যা পদ্ধতি বলতে পারি। (problematic act carried to completion in its natural setting—Dr. Stevenson.)

এই পদ্ধতিটি পূর্বে শুধুমাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যই ব্যবহৃত হত। পদ্ধতিটির মূলকথা হচ্ছে—কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা, তবে সেই কাজটি হবে ছাত্রদের স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক ও সার্থক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কোন একটি সমস্যামূলক কার্য ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং ছাত্রদের স্বচেষ্টায় তার সমাধান করতে হয়।

এই পদ্ধতির মধ্যে তিনটি সর্তের উল্লেখ দেখা যায়—প্রথমতঃ, কার্যটি সমস্যামূলক হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ সেটি স্কুল-ঘরে বসে খেলার ছলে করলে হবে না, তার জন্যে স্বাভাবিক পটভূমি চাই এবং তৃতীয়তঃ, কার্যটি শেষ পর্যন্ত সুসম্পন্ন হওয়া চাই।

১৯১৮ সালে সর্বাত্মক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন জন ডিউইর শিষ্য ডাঃ কিলপ্যাট্রিক। তিনি স্টিভেনসনের সংজ্ঞাটি পুরোপুরি

মানেননি। তাঁর মতে সামাজিক পটভূমিতে কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ সর্বান্তঃকরণে করতে নামলে তবেই তাকে প্রজেক্ট প্রদ্ধতি বলা চলবে। (Whole hearted purposeful activity executed in a social environment)।

প্রজেক্ট পদ্ধতির এই সংজ্ঞাটি পরে তিনি সংশোধন করে আরো সুস্পষ্ট করেন। তিনি বলেন প্রজেক্ট পদ্ধতি হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা অভিজ্ঞতা এবং সেই স্বতঃপ্রণোদিত উদ্দেশ্যই স্থির করবে কাজের লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রিত করবে কাজের পদ্ধতি এবং তার পিছনে থাকবে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি।

ষ্টিভেনসনের সংজ্ঞার মধ্যে এই পদ্ধতির একটা বাস্তব পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু কিলপ্যাট্রিক এসে একে শিক্ষাদানের বাস্তব-পদ্ধতির পর্যায়ে না রেখে একেবারে দার্শনিক তত্ত্বে তুলে দিয়েছেন এবং জোর দিয়েছেন উদ্দেশ্যের উপরে, পদ্ধতির উপরে নয়। তাই মনরো একে বলেছেন শিক্ষার দর্শনতত্ত্ব (Philosophy of education)! এই হিসাবে কিলপ্যাট্রিকের সংজ্ঞা ষ্টিভেনসনের সংজ্ঞা থেকে আরও ব্যাপক।

তবে কিলপ্যাট্রিক হচ্ছেন প্রয়োগবাদী জন ডিউইর শিষ্য। সেই দিক দিয়ে এই পদ্ধতি যদি শিক্ষাদানের কাজে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা না যায় তবে ত তার কোন মূল্যই নেই। তাই তিনি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য এই পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে গিয়ে একে চার ভাগে বিভক্ত করলেন।

(i) উৎপাদক পদ্ধতি (Producer's project)—কোন কিছু উৎপাদন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য এই উৎপাদন বলতে কেবল বস্তুই বোঝাবে না, চিন্তাও বোঝাবে।

(ii) ভোগ্য পদ্ধতি (Consumer's project)—কোন কিছু আনন্দের স্বাদগ্রহণ করাই যেখানে উদ্দেশ্য—যথা গান শোনা, বাজী পোড়ানো, ছবি দেখা ইত্যাদি।

(iii) সমস্যা পদ্ধতি (Problem project)—কোন কিছু সমস্যামূলক কাজ নিজের ইচ্ছায় নিয়ে সমাধান করাই যেখানে উদ্দেশ্য।

(vi) বিশেষ দক্ষতা অর্জন পদ্ধতি (Skill project)—কোন বিষয়ে কৌশল বা দক্ষতা অর্জনই যেখানে উদ্দেশ্য।

কিলপ্যাট্রিক এই সকল পদ্ধতিকে আবার মোট দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন।

যথা—(ক) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা (খ) সমবেত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ কতকগুলি কাজ সমবেতভাবে কয়েকজন ছাত্র মিলেমিশে করতে পারে অথবা কতকগুলি কাজ কোন ছাত্র এককভাবেও করতে পারে। শুধু পদ্ধতিতে নয়, কার্য-নির্ধারণেও প্রজেক্ট দু'জাতের হতে পারে। যথা—

(১) বুদ্ধিমূলক (২) কার্যমূলক।

(১) বুদ্ধিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে হাতে-কলমে কোন কাজ করতে হয় না, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে সেই কাজের বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। যেমন মনে করা যাক, নবম শ্রেণীর ছাত্রেরা আগ্রার তাজমহল দেখতে যাবার ইচ্ছা করছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে খরচপত্রের হিসাব, মানচিত্র নিয়ে যাবার পথ এবং পথে আর কি কি দ্রষ্টব্য আর তার খোঁজখবর নেওয়া, রেলের টাইম-টেবল দেখে রেলের সময় ঠিক করা, পথে কি জিনিস নিতে হবে, কোথায় ওঠা হবে তার ব্যবস্থা করা, হোটেলওয়ালা রেল কোম্পানীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা, তাজমহলের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজ করতে লেগে গেল, এবং তার থেকে অনেক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নানাপ্রকার জ্ঞান অর্জন করল।

অবশ্য ডঃ ষ্টিভেনসনের মতে এটাকে খাঁটি প্রজেক্ট বলা চলবে না। কারণ প্রজেক্টের মূল কথা স্বাভাবিক পরিবেশ (Natural setting) এবং কাজের সুসম্পাদন (Carried to completion) কোনটাই হল না এখানে।

(২) কার্যমূলক সমস্যা সমাধানে ছাত্রকে প্রকৃত কার্যটিই হাতেকলমে করতে হয়। যেমন বাগান করা কার্য মনস্থ করলে কোথায় কোন গাছ লাগাতে হবে তার পরিকল্পনা তৈরী করা থেকে সুরু করে চারা বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করা, জমি তৈরী করা, সার সংগ্রহ, জল দেওয়া প্রভৃতি সব কাজই ছেলেদের করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী নানাপ্রকারের ছোট বড় কাজ নিয়ে বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে বসেই করা যায় এমন অনেক কাজ আছে। যথা, কাগজের কাঠির বা মাটির কোন কিছু তৈরী করা, কাগজ তৈরী করা, ভূ-গোলক তৈরী করা। তবে বিদ্যালয়ের সীমার মধ্যেই যে সব করা যাবে তার কোন মানে নেই। প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের সীমানা ছেড়ে বাইরেও ছাত্রদের নিয়ে যেতে হতে পারে।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে—কাজটা যেন ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তারা নিজের ইচ্ছাতেই যে কাজ করতে চাইবে সেই হল আসল প্রজেক্টের কাজ।

কিলপ্যাট্রিকের নির্দেশমত প্রজেক্টের সমস্ত কাজ আগাগোড়া ছেলেদেরই করতে হবে, এমন কি পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যন্ত। শিক্ষকের স্থান এখানে পরিচালকের, হিতৈষী বন্ধুর। উপকরণ হিসাবে একেবারে আসল জিনিসটাই (concrete) চাই, এবং পরিবেশও স্বাভাবিক ও সামাজিক চাই। কোন রকম অনুকল্প চলবে না।

প্রজেক্টের যে কোন কাজকে চার অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) উদ্দেশ্য নির্ণয় (purposing), (২) পরিকল্পনা প্রণয়ন (planning), (৩) কার্য সম্পাদন (executing), এবং (৪) পরিশেষে কার্যের সমালোচনা (judging)। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই চারিটি স্তরের মধ্যে দিয়ে কাজ এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে কি কি জাতীয় কাজ করান যেতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কিলপ্যাট্রিকের এক শিষ্য তাঁর এই প্রজেক্ট পদ্ধতিকে পাঁচটি শাখায় ভাগ করেছেন যথা—(১) আবিষ্কার (exploration), (২) নির্মাণ (construction), (৩) যোগাযোগ সাধন (communication), (৪) ক্রীড়া (play), এবং (৫) কারুশিল্প (skill)। বিভাগগুলির নামের মধ্যেই রয়েছে তার কার্যপদ্ধতি সুতরাং বেশী বলার দরকার নেই। ঐ সকল কার্যপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা বাইরেকার বিরাট বিশ্বের সম্বন্ধে কৌতূহলাক্রান্ত হলে তবেই এ পদ্ধতি সার্থকতা লাভ করবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে এ জাতীয় প্রজেক্ট পরিচালনার যে বিশেষ অসুবিধা ঘটে এ ত বলাই বাহুল্য। বাস্তব পরিবেশ (environment) এবং বাস্তব পদার্থ (concrete things) বিদ্যালয়ে সব সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য এম. ই. ওয়েলস্ এর একটা সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে আসল বস্তুর পরিবর্তে নকল বস্তু দিয়ে ক্রীড়াচ্ছলেও (make-believe play) প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

যাই হোক, বহু শিক্ষাবিদ্ এই প্রজেক্ট পদ্ধতি নিয়ে বহুরকম আলোচনা করেছেন এবং এর বহু পরিবর্তনও করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে (১) শিশুরাই কাজের ইউনিট স্থির করবে (২) শিশুরাই

তার পরিকল্পনা করবে (৩) শিশুরাই কাজ পুরাপুরি সম্পাদন করবে এবং (৪) শিশুরাই সেই কাজের সমালোচনা করে ভুলত্রুটি নির্ণয় করবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি প্রয়োগের অনেকগুলি **সুবিধা** আছে যথা—

(১) নানা কাজের মধ্য দিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা হয় বলে শেখাটা ছাত্রের মনে বাস্তব রূপ নিয়ে সার্থক হয়।

(২) কার্যকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন বিষয়জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়।

(৩) ছাত্ররা তাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার শেখে।

(৪) ছাত্রের সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৫) শ্রেণী-পাঠনার একঘেয়েমি ভাব নষ্ট হয়।

(৬) সমস্যার আকারে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সামনে উপস্থিত হয় বলে শিক্ষার জন্য ছাত্রেরা বেশ আগ্রহশীল হয়।

(৭) ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রজেক্ট পদ্ধতি বিদ্যালয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারেনি, কারণ এর অনেকগুলি **অসুবিধাও** আছে। তার মধ্যে প্রধান কথা এই পদ্ধতিতে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায় না। শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানের মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায় এবং শ্রেণী-কক্ষের বাঁধাধরা রুটিনের কাজ সব গোলমাল হয়ে যায়।

এই সব দিকে বিবেচনা করে বর্তমানে প্রজেক্ট পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিয়মের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সকল ছাত্রকে নিয়ে একটা বৃহৎ প্রজেক্ট অবলম্বন করে সবরকমের শিক্ষা দেবার চেষ্টা না করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ছোট ছোট প্রজেক্ট পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এমন কি দৈনিক পঠনের মধ্যেও প্রজেক্ট পদ্ধতির তত্ত্বটি ব্যবহার করা যেতে পারে, ছাত্রদের কোন সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজে থেকে তার সমাধান করতে বলে।

পাঞ্জাব প্রদেশের মোগা নামক স্থানে মিশনারীগণ প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার এক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। সেখানে সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শ্রেণী-পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। সবরকম শিক্ষাই সেখানে নানাপ্রকার কার্য সমস্যার আকারে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেক শিক্ষাবিদ মোগার এই কার্যপদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা

(Basic Education)

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে শিশুশিক্ষার যে নূতন পদ্ধতি পরিকল্পনা করেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে **বুনিয়াদী শিক্ষা**। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নূতনত্ব কেবলমাত্র পদ্ধতি-ঘটিতই নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ, উভয় দিক দিয়েই এই পরিকল্পনা এমন একটি যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে, যে এর নূতন নামটি সর্বাংশেই সার্থক বলা যেতে পারে।

বলাই বাহুল্য, 'বুনিয়াদী' এই কথাটির মধ্যেই এক নূতন পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং আদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোন সৌধ গড়তে গেলে যেমন প্রথমেই তার বুনিয়াদটি ভালভাবে পোক্ত করে গড়ে নিতে হয়, তা নইলে উপরের অট্টালিকা টেকে না, তেমনি জাতি গঠনের বেলাতেও শিশুশিক্ষার বুনিয়াদটি তদনুযায়ী পোক্ত করে তুলতে না পারলে পরবর্তী জীবনের সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায়। মোট কথা, যে শিক্ষাপদ্ধতিটি আদর্শ জাতি-গঠনের ভিত্তি স্বরূপ হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নরনারীকে দায়িত্বশীল আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, একমাত্র তাকেই বলা যাবে বুনিয়াদী শিক্ষা।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সেই উন্নততর ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের বুনিয়াদ। তাই তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক নামকরণ—"**বুনিয়াদী শিক্ষা**" (Basic Education)।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

মহাত্মাজী কর্তৃক এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কারের পিছনে সামান্য একটু রাজনৈতিক পটভূমি আছে সে সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটু আলোচনা করে নেওয়া ভাল। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব যে সমাজ-জীবনের একটা সাময়িক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাটি উদ্ভূত হলেও জাতীয় জীবনের চিরন্তন চাহিদা পূরণে এর মূল্য অপরিসীম। তাই তদানীন্তন কালের সামাজিক সমস্যা আজ কিছুমাত্র না থাকলেও সেই শিক্ষাপদ্ধতির চাহিদা

স্বাধীন ভারতের আদর্শ নাগরিক গড়ার কাজে আরো বেড়ে গিয়েছে। ভারতে তখন বিদেশী শক্তির প্রভুত্ব। দেশে শিক্ষাবিস্তারে তাদের কোন দায়ও নেই, দায়িত্ব নেই—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় তাদের উদাসীনতা অপরিসীম। দেশের নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছেন। জনশিক্ষাকে ব্যাপকতর করবার জন্য সরকারের কাছে তাঁরা অনেক প্রস্তাব-পরিকল্পনা এবং দাবী জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য ফল আশানুরূপ হয়নি। এরপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন-আইনের বলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ক্ষমতায় আসীন হলেন, সাতটি বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন।

এতদিন ধরে দেশে জনশিক্ষা বিস্তারের যে দাবী তাঁরা করে আসছিলেন, সেই দাবীপূরণের ভার এইবার তাঁদের উপরই পড়ল। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অর্থ কোথায়? এত বড় বিশাল দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ, এখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে বা ব্যাপকতর ভাবে প্রচলন করতে হলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কোথা থেকে তা আসবে?

বিষম সমস্যার সম্মুখীন হলেন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা। সমাধানে এগিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর নূতন শিক্ষাপদ্ধতির নয়া পরিকল্পনা নিয়ে। এই পরিকল্পনায় কেবল অর্থসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে তাই নয়, জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার যে পার্থক্য, সে হল জাতিগঠনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ঘটিত।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে মহাত্মা গান্ধী দেখলেন শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার অকারণ আধিপত্য, তথাকথিত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে একটা নূতন ধরনের জাতিভেদের সৃষ্টি, কাজের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞানের অপেক্ষা পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের অধিক মর্যাদা দান, কোন কিছু বৃত্তি-শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, একান্ত অবাস্তব কৃত্রিম এবং পুঁথিগত জ্ঞানকেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের অর্থের সুবিপুল অপচয়—এই সবগুলিই প্রকট হয়ে উঠেছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায়। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"The present system of education does not meet the requirments of the country in any shape or form. English,

having been made the medium of instruction in all the higher branches of learning, has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. It has prevented knowledge from percolating to the masses. This excessive importance given to English has cast upon the educated classes a burden which has maimed them mentally for life and made them strangers in their own land.

Absence of vocational training has made the educated classes almost unfit for productive work and harmed them physically. Money spent on primary education is a waste of expenditure in as much as what little is taught is soon forgotten and has little or no value in terms of the villages or cities."

মহাত্মাজী তাঁর নব পরিকল্পনায় এই সকল ত্রুটি সংশোধন করে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করলেন যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসকল ত্রুটির সংশোধন হতে পারবে, জাতির সত্যকার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে পারবে, এবং এই দেশের ছেলেমেয়েরা গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে। 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মাজী তাঁর এই নূতন শিক্ষাব পবিকল্পনাগুলি প্রকাশ করলেন।

শিক্ষা-পারকল্পনার মূল কাঠামো

মহাত্মাজী স্থির করলেন প্রাথমিক শিক্ষার কাল অন্ততঃ সাত বৎসর হওয়া চাই। এই সাত বৎসরে যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই দেওয়া হবে। বিদেশী ভাষা, তথা ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার জগদ্দল পাথর অপসারিত হয়ে গেলে এই সময়ের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা প্রবেশিকা (matriculation) স্তরের সব কিছু আয়ত্ত করে নিতে পারবে। শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন এক বৃত্তিমূলক হস্তসম্পাদ্য শিল্পকর্ম। মহাত্মাজী চরকা বা তকলিতে সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন. শিল্পকে শিক্ষাদানের উপলক্ষ্য হিসাবে মনোনীত করেন। তাঁর মতে এর ফলে লাভ হবে দুদিক দিয়ে।

প্রথমতঃ, শিশুরা কাজের মাধ্যমে সব কিছু শিক্ষালাভ করে বলে শিক্ষাটা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময়। শিশুমনে আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং নীরস পুঁথি-পাঠের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি লাভ করে খেলার ছলে মনের আনন্দে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ভালভাবে শিখে নিতে পারবে। দ্বিতীয় কথা

হল ছাত্রদের উৎপাদিত বস্ত্রাদি বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রি করতে পারলে তা থেকেই তাদের বেতন পরিশোধ হবে। আর্থৎ বিদ্যালয়-পরিচালনার খরচ ছাত্রদের দ্বারাই উঠে আসবে, এরজন্য আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। আর্থিক হিসাবে বিদ্যালয়গুলি আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

এই দুটি বিষয়ই অবশ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে যা' আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে অপরিহার্য। যথাসময়ে সেগুলির আলোচনা করা যাবে।

সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মারোয়াড়ী শিক্ষা-সমিতির রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাবিদদের এক অধিবেশন হয়। মহাত্মাজী এই অধিবেশনে তাঁর ওই প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করলেন। সমিতি তখন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ জাকির হোসেনকে চেয়ারম্যান করে এক বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন করে দিলেন এই নয়া পরিকল্পনা বিচার করে দেখবার জন্য। ওয়ার্ধায় এই পরিকল্পনা প্রথম রচিত হয় বলে এটি **ওয়ার্ধা পরিকল্পনা** (Wardha Scheme) নামেও পরিচিত।

এই বিশেষজ্ঞ সমিতি মহাত্মাজীর পরিকল্পনাটি বিভিন্ন দিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখে কয়েকটি স্থানে কিছু কিছু পবিবর্তনের প্রস্তাব করলেন।

মহাত্মাজী-গঠিত মূল পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছিল—

(১) **কোন একটি উৎপাদনাত্মক কারুশিল্প** (Productive Craft)।

এই কারুশিল্প প্রধানতঃ, সুতোকাটা, কাপড় বোনা, চাষবাস করা, বাগান করা, চামড়ার কাজ—মাটির কাজ করা ইত্যাদি নানারকম শিল্পের মধ্যে যে কোন একটি কাজ ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী বেছে নিতে পারা যায়।

(২) **মাতৃভাষা**।

(৩) **গণিত**।

(৪) **ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান সম্বলিত সমাজবিদ্যা**।

(৫) **সাধারণ বিজ্ঞান**।

এর মধ্যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান।

(৬) **শিল্প-কলা** (arts)।

(৭) **হিন্দুস্থানী ভাষা।**

(৮) **নৃত্যগীতাদি ললিত কলা।**

এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—কোন একটি বিশেষ উৎপাদনাত্মক হাতের কাজকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation of studies) শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। চরকা বা অন্য কোন কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে তারি অনুবন্ধ হিসাবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় পরিবেশন করবেন শিক্ষক। একে অনুবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্রবন্ধ-পদ্ধতি (concentric system of correlation) বলা যেতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। বিদেশী ভাষা বা ইংরেজি ভাষা পঠন-পাঠনার কোন ব্যবস্থাই থাকবে না।

দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ভাষা গ্রহণ করা যাবে।

শিক্ষাকাল হবে সাত বৎসর।

জাকির হোসেন কমিটি গান্ধীজীর এই নয়া পরিকল্পনা বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে একে আন্তরিকভাবেই অনুমোদন করলেন; অবশ্য সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন করবার প্রস্তাবসহ।

প্রথমতঃ—গান্ধীজী কোন একটি কারুশিল্পকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। জাকির হোসেন কমিটি তাকে আরো প্রসারিত করে দিতে চাইলেন। কমিটির মতে বিশেষ কোন কারুশিল্প ছাড়া শিক্ষার্থীর সামাজিক বা ভৌগোলিক পরিবেশকেও কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তার অনুবন্ধ রচনা করা যেতে পারে—

"All teaching should be carried on through concrete life situations relating to craft or to social and physical environment so that whatever the child learns, becomes assimilated into his growing activity.—"

দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষাব্যবস্থাকে আত্মনির্ভরশীল করতে গিয়ে ছাত্রদের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের পণ্যমূল্য থেকে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের যে প্রস্তাব করেছিলেন মহাত্মাজী, কমিটি তা অনুমোদন করেননি। দেশের শিশুশিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ দেশের সরকারের। এই দায়িত্ব শিশুদেরই বহন করতে হলে

বিদ্যালয়গুলি শিশুশ্রমিক কারখানায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে—এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অবশ্য ছেলেদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হবে এবং বিক্রয়মূল্য বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহে কিছু কিছু সাহায্যও করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র এরই উপর বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পিত হবে না। কারণ তাহলে বিদ্যাচর্চা অপেক্ষা অর্থচর্চাই বিদ্যালয়গুলির প্রধান কর্ম হয়ে উঠতে পারে।

এইভাবে নানাপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কাঠামোটা দাঁড়াল—

(১) শিক্ষাকাল সাত বছরের পরিবর্তে আট বছর স্থির করা হল। সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক (free & compulsory) ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। এই আট বছরের শিক্ষাকাল আবার দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম পাঁচ বছর নিম্ন বুনিয়াদী (Junior Basic) এবং পরের তিন বছর উচ্চ বুনিয়াদী (Senior Basic)।

(২) মাতৃভাষাই হবে সকল রকম শিক্ষার মাধ্যম।

কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে কোন একটি হস্তসম্পাদ্য উৎপাদক শিল্পকর্ম (manual productive work or craft).

(৪) ছাত্রদের শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য কোন বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। তাদের মূল্যায়ন হবে দৈনন্দিন কার্যের আভ্যন্তরীণ মূল্য নিরূপণের দ্বারা।

(৫) পাঠ্যপুস্তক যতদূর সম্ভব বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

(৬) লেখাপড়া চর্চার সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দৈহিক শ্রমিনির্ভর কাজ, খেলাধূলা, সমবায় সূচক কাজ, অবসর-বিনোদনের শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুরই চর্চা করতে হবে ভালভাবে।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজী তাঁর এই বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা আরো সম্প্রসারিত করেন। কেবলমাত্র শিশুশিক্ষায় নয়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোটাই তিনি তাঁর নূতন শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত করলেন এবং তার নূতন নামকরণ করলেন—**নঈ তালিম** বা নূতন শিক্ষা।

নঈ তালিম শিক্ষাব্যবস্থা চারিটি খণ্ডে বা স্তরে বিভক্ত ; যথা—

(১) **প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা** (Pre-basic education)।

(২) **বুনিয়াদী শিক্ষা** (Basic education)।

(৩) **উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা** (Post-basic education)।

(৪) **বয়স্ক শিক্ষা** (Adult education)।

সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোই বুনিয়াদী পদ্ধতিতে কর্মকেন্দ্রিক ভাবে পরিচালিত হবে। তবে প্রাক্-বুনিয়াদী স্তরে খেলাকেই করা হবে শিক্ষাদানের উপলক্ষ্য।

—এই হিসাবে দেখতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষা হল নঈ তালিমের একটি স্তর।

সারজেণ্ট পরিকল্পনা ও বুনিয়াদী শিক্ষা

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীর সকল দেশেই তখন শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জোর চেষ্টা চলেছে। আমাদের দেশেও ভারত-সরকার শিক্ষা-পুনর্গঠনের জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি' (Central Advisory Board of Education) গঠন করেন। সেই সময় ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন স্যার জন সারজেণ্ট (Sir John Sargent)।

সারজেণ্টের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আলোচনা করে যে রিপোর্ট দান করেন তাকে 'সারজেণ্ট-পরিকল্পনা' বা কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির রিপোর্ট (C. A. B. Report) বলা হয়।

এই রিপোর্টেও মহাত্মাজীর পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করা হল। এবং তার ফলে সরকারীভাবেই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি অনুমোদন লাভ করল।

তবে সারজেণ্ট রিপোর্ট বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী যাকে একমাত্র জাতীয় শিক্ষা হিসাবে রচনা করেছিলেন সারজেণ্ট তার মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা স্বীকার করে শিশুশিক্ষার বিকল্প হিসাবে স্বীকার করলেন।

পঠনকাল সাত বৎসরের পরিবর্তে আট বৎসর করা হল আর ইংরেজিকে একেবারে বর্জন না করে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে ঐচ্ছিক করে রাখার কথা বলা হল।

সুবিধা ও অসুবিধা

আগেই বলেছি, বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধা কি হতে পারে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন দিক থেকে তা বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন।

দেশের উন্নতিমূলক যে কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন দেশব্যাপী অশিক্ষার ফলে তা কোনটাই ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যাই হল দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা। এইজন্য মহাত্মাজী তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন, এবং বাধ্যতামূলক করতে গেলেই তাকে অবৈতনিক করতে হয়। অথচ এই বিরাট দেশের শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভার বহন করবার ক্ষমতা তখনও হয়নি দেশের। তাই তাঁর পরিকল্পনায় শিক্ষাকালীন উপার্জনের ব্যবস্থা (earning while learning) তাঁকে করতে হয়েছিল।

যাই হোক আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের বিচারেও এই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতা কতটুকু সংক্ষেপে তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে—

মনস্তাত্ত্বিক দিক (Psychological)

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই পরিকল্পনা বিশেষভাবেই সার্থক। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল গ্রন্থের উৎপীড়ন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলাধূলা করতে চায়, হাতে-কলমে কাজ করতে চায়, মস্তিষ্কের ব্যবহার থেকে পেশীর ব্যবহারে তারা উন্মুখ বেশী। অথচ তাদের আমরা শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে তাদের অপরিণত মস্তকে একরাশ শুষ্ক পুঁথির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মনে করেছি শিক্ষার 'হদ্দমুদ্দ' করা হল। কিন্তু শিশু-মনস্তত্ত্বে তার উল্টো কথা বলে। পুঁথিগত বিমূর্ত জ্ঞানের কথা জোর করে গলাধঃকরণের বয়স ওটা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সে হাতে কলমে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য বিষয় সে জেনে নেয় আনন্দচিত্তে। একেই বলে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (learning by doing)।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু কাজ করে তাই নয়, কাজের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যও থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যটিকে তারা রূপ দেয় কাজের মাধ্যমে। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ (purposive work) করায় শিক্ষার্থী পেশী সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও সঞ্চালিত করতে শেখে।

তৃতীয়তঃ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, যূথবদ্ধতা প্রভৃতি মনের অনেকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই উদ্গতি লাভ করে।

চতুর্থতঃ, হস্তসম্পাদ্য কারুকলা চর্চার ফলে শিশুমনে সৃজনী প্রতিভার (creative urge) উন্মেষ ঘটে, আত্মবিকাশ সম্ভব (self expression) হয়।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মবিকাশ (self expression), পন্থা যদি হয় আনন্দময় (joyful), পদ্ধতি যদি হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (spontaneous), তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

শিক্ষাতাত্ত্বিক-দিক (Pedagogical aspect) :

শিক্ষাতত্ত্বের বিচারেও বুনিয়াদী শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর।

শিক্ষণীয় বিষয় এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতারূপে শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। কেবলমাত্র আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন বা গ্রন্থপণ্ডিত হওয়াই ত শিক্ষার সার্থকতা নয়। মহাত্মাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন শিশুর দেহে মনে ও আত্মার যা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট গুণ সুপ্ত হয়ে আছে তাকেই প্রকাশিত করে তুলতে হবে। (All-round drawing out of the best in child & man—body, mind and spirit)

কেবলমাত্র বইএর পাতা মুখস্থ করে এই ত্রিবিধ দিকের বিকাশ সম্ভব হয় না। এরজন্য চাই পেশী, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের যুগপৎ ব্যবহার। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ না করলে কখনই তা লাভ করা যায় না।

বুনিয়াদী শিক্ষাব শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বাস্তব অভিজ্ঞতারূপেই শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাছাড়া শিশু বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের যোগাযোগ স্থাপন কবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই এবং মাতৃভাষাই তাব আত্মিক বিকাশের প্রধানতম অবলম্বন। বুনিয়াদী শিক্ষা মাতৃভাষাকে বাহন করায় শিক্ষাণীয় বিষয়গুলির সহজ আয়ত্তীকবণ সম্ভব হয়।

সামাজিক দিক (Sociai aspect)

মানুষ সামাজিক জীব। শিক্ষার উপযোগিতা বিচারে সামাজিকতার বিচার ও তার মূল্য-বিচারও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিদেশী ভাষা, তথা ইংরাজী ভাষা বহুদিন ধরে শিক্ষার বাহন হয়ে থাকায় দেশবাসীর মধ্যে ইংবেজি-জানা আর না-জানা, এই জাতীয় একটা নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ঘরের পাশের ইংরেজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক সমাজের মধ্যে থেকেও সামাজিকতা-বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রাধান্য দেওয়ায় এই ত্রুটি ঘটতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ—হাতে-কলমে কাজের প্রতি একটা অকারণ অবজ্ঞা এবং কলমপেশা কাজের প্রতি একটা অহেতুক শ্রদ্ধা আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সমাজের মধ্যে একটা কৃত্রিম জাতিভেদ গড়ে উঠেছে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় হাতের কাজের প্রাধান্য দেওয়ায় এই জাতীয় অহেতুক জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ ঘটবে।

তৃতীয়তঃ—প্রাথমিক শ্রেণীতে যত ছাত্র পড়বে সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নীত হতে পারবে না। মধ্য পথেই পড়া শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাতের কাজ শিখে গেলে জীবনসংগ্রামের কিছু হাতিয়ার সংগ্রহ হবে।

চতুর্থতঃ—সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সহযোগিতামূলকভাবে শিক্ষালাভ করবে। আত্মনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-জীবনযাত্রার প্রণালী শিক্ষা লাভ করবে।

(The child will develop, through these activities, a sense of personal worth and a spirit of social service.)

বুনিয়াদী শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা হল এর সমাজধর্মিতা। শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্যজ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলে না, আদর্শ সামাজিক মানুষ গড়ে তোলে। কারণ, সহযোগিতামূলক সামাজিক মনোবৃত্তির উপরই এই শিক্ষার বুনিয়াদ।

বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার দিনে জীবনসংগ্রামের হিংস্র প্রতিযোগিতায় মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্ধ। ভেঙ্গে পড়েছে সহযোগিতা-নির্ভর সমাজবন্ধন। কৃষি ও কুটিরশিল্পের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল পল্লীগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং স্ফীত হয়ে উঠছে শত শত ধনগর্বিত যন্ত্রশিল্পনির্ভর নাগরিক জনপদ।

বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার এই ভয়াবহ দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করবার জন্য মহাত্মাজী যে একটা নূতন শান্তিপ্রিয় শ্রেণীহীন উদার সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, ঐ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই তার বুনিয়াদটি প্রোথিত। বুনিয়াদী শিক্ষা তাই শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই যুগান্তর ঘটাইনি সমাজের ক্ষেত্রেও তা বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি বলছেন—

"My plan…is thus conceived as the spearhead of a social

revolution···It will provide a healthy and moral, basis of relationship between city and the villages,

নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। সেই সমাজের গোড়ার কথাই হবে জীবনের পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতা-নীতির প্রবর্তন। ভোগ ও সংগ্রামের পাশাপাশি ত্যাগ ও সহযোগিতার জয়গান ধ্বনিত হবে মানুষের কণ্ঠে। ডঃ জাকির হোসেন বলেছেন—"The scheme envisages idea of a co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children."

সমালোচনা

বুনিয়াদী পদ্ধতির যে সব বিভিন্ন নিয়মাবলী মহাত্মাজী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে সমালোচনার বস্তু হয়েছে অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। যে পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাজী এই ব্যবস্থা করেছিলেন আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং শিক্ষালয়গুলি শিশু-শ্রমিকের কারখানায় রূপান্তরিত হবার আশঙ্কা আজকাল আর নেই।

তবে ছেলেদের হাতের কাজ বাজারে বিক্রয়যোগ্য করে তুলবার একটা সার্থকতাও আছে। ছেলেরা যে সব জিনিস তৈরী করছে তারও মূল্য আছে, চাহিদা আছে, এটা জানলে ছেলে উৎসাহিত হবে। আরো ভালভাবে কাজ করতে আগ্রহান্বিত (motivated) হবে।

পণ্যকে লাভজনক করতে হলে উৎপন্নের খরচা যত কম করা যায় ততই ভাল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উৎপন্ন পণ্যের আর্থিক লাভ অপেক্ষা গুণগত উৎকর্ষই মুখ্যকথা। সুতরাং উৎপন্নের খরচা বেশী পড়লেও ক্ষতি নেই। মোট কথা, শিল্পকে এখানে শিক্ষার সহায়ক হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষাকে শিল্পের উপর নির্ভরশীল করলে চলবে না।

এ বিষয়ে ডঃ জাকির হোসেন বলেছেন—

"We consider the scheme of basic education to be sound in itself. Even if it were not self-supporting in any sense it should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction."

আর একটি সমালোচনার বিষয় হল শিক্ষায় শিল্পকেন্দ্রিকতা। আগেই বলেছি, যে কোন একটি কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রবদ্ধ (concentric correlation) প্রণালীতে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু শিশুর জ্ঞাতব্য সকল বিষয় ধারাবাহিক রূপে কোন শিল্পকেন্দ্রিকভাবে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। জোর করে করতে গেলে তা একান্ত কৃত্রিম এবং হাস্যকর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সকলপ্রকার শিক্ষাকেই শিল্পকেন্দ্রিক করে রাখলে শিক্ষার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যাবে, ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে সেই সব ফাঁক ভরাট করবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু কিছু মৌখিক পাঠদান করলে ভাল হয়।

তৃতীয়তঃ—ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এমনই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি যে কোন একটি প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে আংশিকভাবে একে জুড়ে দেওয়া যায় না! অথচ দেশে রাতারাতি প্রচলিত পদ্ধতি উচ্ছেদসাধনও সম্ভবপর হবে না। সে ক্ষেত্রে এক পদ্ধতি থেকে অপর পদ্ধতিতে এসে ভর্তি হওয়া ছাত্রের পক্ষে কঠিন।

চতুর্থতঃ—ওই শিক্ষা মানুষের মনকে ক্রমশ শান্ত নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্য জীবন ও কুটিরশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আকর্ষণ করবে। অথচ পৃথিবীব্যাপী আজ যন্ত্রযুগের অগ্রগতি চলেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা চলেছে, অর্থোপার্জনের ব্যাকুলতা চলেছে। সেক্ষেত্রে এই শিক্ষা ভাবী সমাজে প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে, তা আজ জোর করে বলা যাচ্ছে না।

পঞ্চমতঃ—ইংরেজিভাষাকে একেবারেই অস্বীকার করার ফলে জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে আমাদের ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ না করতে হয় সেটাও চিন্তার বিষয়। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আজ ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ বুনিয়াদী শিক্ষাকাল পর্যন্ত অর্থাৎ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা যদি কেউ না শেখে তবে পরবর্তী জীবনে তা নতুন করে শিখে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সহজ হবে না।

ষষ্ঠতঃ—সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেবে শিক্ষক নিয়ে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণ শিক্ষা দিতে পারেন বা দিয়েও থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে শিক্ষা দেওয়া আদৌ সম্ভবপর হবে না। উপযুক্ত চালকের হাতে চালিত হতে না পারলে সমস্ত শ্রমই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কর্মের

মাধ্যমে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি অনুবন্ধ সূত্রে গেঁথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করতে হলে শিক্ষকের চাই বুনিয়াদী শিক্ষণ-তত্ত্বের জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। বুনিয়াদী শিক্ষালয় বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষক তৈরী হচ্ছে না বলেই বুনিয়াদী শিক্ষা আজও তেমন সমাদৃত হয়নি সমাজে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রজেক্ট পদ্ধতি

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী পদ্ধতির শিক্ষা এবং জন ডিউই-প্রবর্তিত প্রজেক্ট পদ্ধতির শিক্ষা উভয়ই কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মভিত্তিক। কোন একটি হস্তসম্পাদ্য কর্মকে ভিত্তি করেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা উভয় পদ্ধতিতেই। এই হিসাবে এই দুটিকেই এক জাতীয় পদ্ধতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব ও পদ্ধতি এই উভয় দিক থেকেই পার্থক্য প্রচুর।.

তত্ত্বহিসাবে প্রজেক্ট পদ্ধতিকে শিল্পকেন্দ্রিক করা হয়েছে কেবলমাত্র শিশু মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব দুটোরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই প্রজেক্ট পদ্ধতিকে বলতে হয় কর্মকেন্দ্রিক আর বুনিয়াদী পদ্ধতি হল শিল্পকেন্দ্রিক (not activity centred, but 'craft-centred—Gandhiji)। সেইজন্যই বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের একটা আর্থিকমূল্য স্বীকার করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা—প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় বিষয়টি শিক্ষার্থীরাই নিজেদের ইচ্ছা এবং প্রবণতা অনুসারে নির্বাচন করে নেয় কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয়টি পূর্বনির্দিষ্ট। সমাজ ও দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে তা নির্ধারিত হয়।

তৃতীয় কথা—প্রজেক্ট পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি মাত্র; সমাজ বা দেশের চাহিদার সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই, কিন্তু বুনিয়াদী পদ্ধতিতে এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি সমাজজীবনের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র বিমূর্ত শিক্ষাদানের কেন্দ্র নয়। সামাজিক জীবন যাপন শিক্ষার কেন্দ্র (The school becomes a real social unit and children get real training in the art of living together.)।

তাই বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় অধিগত করার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ নাগরিক হিসাবে আদর্শ সমাজ গঠন করবার শিক্ষাও লাভ করে শিক্ষার্থীরা। এইটেই হল বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।—(A true social sense is

devloped in him which makes him willing to serve and happily to carry out those duties which make harmonious living together in a community possible.)

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে এ সব কিছুই নেই।

ওয়ার্কসপ পদ্ধতি

(Workshop Method)

শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে ওয়ার্কসপ পদ্ধতি খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র বছর পঁচিশেক পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতির উদ্ভব। তারপর নানা প্রকার-পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই ওয়ার্কসপ পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। এই পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যদি কখনও কোন বিষয় সমস্যার আকারে আমাদের সামনে আসে তাহলে তা সমাধান করার জন্য স্বভাবতই আমরা কায়মনোবাক্যে উদগ্রীব হয়ে উঠি, আমাদের সমস্ত মন ঐ সমস্যা-সমাধানেব দিকে আপনা থেকেই কেন্দ্রীভূত হয়। তার ফলে শিক্ষার কাজটা পাকা হয়। বলাই বাহুল্য এই পদ্ধতিটিও একজাতীয় প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method) তবে 'কার্যমূলক নয়, বুদ্ধিমূলক। অবশ্য প্রজেক্ট পদ্ধতি থেকে এর কার্যপ্রণালী বিভিন্ন, উদ্দেশ্য বিভিন্ন, তাই স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবেই এটিকে গ্রহণ হয়েছে।

কার্য পদ্ধতি

এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন কিছু অনুশীলন করতে হলে অথবা শিক্ষালাভ করতে হলে প্রথমে একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত একদল শিক্ষার্থী প্রয়োজন। তারা একসঙ্গে বসে মিলেমিশে আলাপ-আলোচনা পঠনপাঠনার মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান করতে বসবে। এই সব শিক্ষার্থীরা হলেন ঐ ওয়ার্কসপ সভার সভ্য। সভ্যেরা প্রথমেই কয়েকটি সমস্যা সভার মাঝে উপস্থাপিত করবেন এবং অন্যান্য সকলেই সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে নিজেদের মধ্যে এক একটিকে গ্রহণ করবেন। দলের সভ্যসংখ্যা খুব বেশী হলে (স্বভাবতই স্কুলে যা হবে) কয়েকটি ছোট ছোট উপদলে সভ্যদের ভাগ করে নেওয়া হবে এবং এক একটি উপদল এক-একটি সমস্যা আলোচনার জন্য গ্রহণ করবেন।

এরপর উপদলগুলি বিভিন্ন জায়গায় বসে স্বতন্ত্রভাবে কাজ আরম্ভ করে দেবেন। প্রথমে একটি সম্মিলিত সঙ্গীত দিয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে,

এর ফলে সভার পরিবেশটি বেশ মনোরম্ ও স্বচ্ছ হবে, এবং সভ্যদের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বেড়া ভেঙে গিয়ে একাত্মতাবোধ জাগ্রত হতে পারবে। তার পর সভার কর্মপরিষদ গঠন করা হবে।

কর্মপরিষদে একজন থাকবেন **পরিচালক** (Director)। তাঁর কাজ হবে মোটামুটি সভার কাজ পরিচালনা করা। সমস্যার সমাধানে কখনও বা পাঠাগারের সাহায্য নিতে হবে কখনও বা শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে— এ সব পরিচালক ব্যবস্থা করবেন। মোটকথা, পবিচালকের নেতৃত্বেই সভা তার কার্য পরিচালনা করে চলবে।

দ্বিতীয় জনকে বলতে পারি **পরামর্শদাতা** (Consultant)—তাঁর কাজ দ্বিমুখী। একদিকে তিনি সভাপরিচালনায় পরিচালককে সাহায্য করবেন, আলোচনাকালে কারো কোন ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করে দেবেন, অপরদিকে প্রয়োজন হলে তিনি কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন জটিল সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করে দেবেন।

তৃতীয় জন হলেন **তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি** (Resource person) কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার উপরই যদি সমস্যা-সমাধানের ভার সম্পূর্ণ ভাবে দেওয়া থাকে তাহলে কাজ কখনই আশানুরূপ হতে পাবে না। মাঝে মাঝে এমন জায়গায় আটকে যাবে যেখান থেকে তারা নিজেদের বুদ্ধিতে কিছুতেই বেরিযে আসতে পাববে না। সেইখানে তাঁদের ঠিক পথটি চিনিয়ে দেবার জন্য এমন একজন ব্যক্তির সহায়তা চাই যিনি এইসব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানী এবং তথ্যসমৃদ্ধ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দলে শিক্ষক থাকবেন এই তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে। অবশ্য তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে সভার কাজে যোগ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রয়োজন হলে ছাত্রেরা তাঁর কাছে যাবে এবং তিনি প্রয়োজন মত সাহায্য করবেন।

এছাড়া একজন **রেকর্ডার** নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, যার কাজ হবে সকলেব বক্তব্য লিখে রাখা।

এইভাবে কর্মপরিষদ গঠন করা হয়ে গেলে সভার কাজ শুরু হবে। সমস্যাটিকে নানা ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে ফেলা হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় সমস্যাটির সঙ্গে হয়ত অনেক সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। সেই সমস্ত প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাব উপরু সমাধানের আলোকপাত

করতে হবে। মূল সমস্যাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত যেসব গৌণ সমস্যার সন্ধান পাওয়া যাবে সেগুলি বিভিন্ন সভ্য সমাধানের জন্য গ্রহণ করবেন।

সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে নানাদিকে আলোচনা করে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পুস্তকাদি লাইব্রেরী থেকে পড়ে নিয়ে এবং শেষে প্রয়োজন হলে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির (Resource person) সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্যাগুলির সমাধানে উপনীত হবেন। সেই সব উপসমস্যার সমাধান করে নিয়ে তারপর মূল সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হবেন।

এই সমাধান-কার্যের সহায়ক হিসাবে লাইব্রেরী ও তথ্যজ্ঞব্যক্তির উপদেশ-নির্দেশ ত প্রয়োজন হবেই ; তাছাড়া মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা বিভিন্ন স্থানে সরজামিনে দেখাশোনা করা প্রয়োজন হতে পারে। মোট কথা, একটি সমস্যা থেকে একাধিক সমস্যার উদ্ভব হবে—সেগুলি পর্যায়ক্রমে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে সাজান, বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করা, আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করা, তার প্রত্যেকটি মূল্যায়ন করা, এই ভাবে কাজ চলবে দিনের পর দিন, যতদিন না সমস্যাটির সুসঙ্গত সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ সমাধানে এসে উপনীত হওয়া যাচ্ছে। এই ভাবে কাজ করে চললে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বহুবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে ছেলেরা এবং এই জ্ঞানার্জনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের নীরস পাঠদান প্রসঙ্গে বাইরে থেকে অনিচ্ছুক মনের উপর জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ছাত্রেরা নিজেরাই সৃষ্টি করছে সমস্যা এবং নিজেরাই আগ্রহী হয়ে তার সমাধান-প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থান থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আহরণ করছে জ্ঞান। সুতরাং এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যে অনেক বেশী কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শুধু তাই নয়, জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব, দায়িত্ববোধ, উৎসাহ, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

এই পদ্ধতির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সাধারণত অপর কোন পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। যথা—

(১) একান্তভাবেই শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে যা কিছু কাজকর্ম হয় বা জ্ঞানানুশীলন হয় সবই শিক্ষার্থীর নিজেদের ইচ্ছায়, নিজেদের উৎসাহে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় হয়।

(২) শিক্ষক তাঁর সুউচ্চ উপদেশক-নির্দেশকের ভূমিকা ত্যাগ করে শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়াবেন।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার ধারা এবং জ্ঞানসঞ্চয় দুটি স্বতন্ত্র না হয়ে একীভূত হয়ে যায়।

(৪) এই পদ্ধতি ছাত্রদের স্বয়ংক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে এবং তাদেব আত্মনির্ভর হতে শেখায়, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে।

(৫) শিক্ষার্থীর শিক্ষাটি পুঁথিগত হয়ে না থেকে বৃহত্তর জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবারিত হয়ে যায়। যে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে আজ সে নিজেকে তৈরী করতে এসেছে সেই সমাজের সঙ্গে তার প্রত্যেকটি যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়।

(৬) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা নিজের জীবনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করে, অপরের সংগৃহীত অভিজ্ঞতা চোখ বুঁজে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় না। সুতরাং এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকে।

(৭) সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে শেখে বলে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হবার উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষাটিও এই প্রসঙ্গে সে লাভ করতে পারে।

(৮) নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় বলে শিক্ষার্থী আত্মবিকাশের সুযোগ সবচেয়ে বেশী পায়।

(৯) প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করতে শেখে। এইভাবে সমবায়-প্রবৃত্তির (co-operative mentality) চর্চা হয়। বর্তমানের গণতান্ত্রিক যুগে এটির মূল্য যে কতবেশী তা সহজেই অনুমেয়।

(১০) সমবায় পদ্ধতিতে কাজ হলেও এর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হবার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও প্রবণতা অনুসারে বিষয়টি আলোচনা করবার স্বাধীনতা রয়েছে।

এই ওয়ার্কসপ পদ্ধতি প্রথমে আমেরিকায় প্রচলিত হলেও বর্তমানে ভারতবর্ষেও নানা স্থানে এর ব্যাপক অনুশীলন চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারী শিক্ষাবিভাগ (The Ministry of Education, Govt. of India), নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল (All India Council for Secondary Education) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আগ্রহী হয়েছেন।

ডাল্টন পরিকল্পনা

(Dalton Plan)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে ডাল্টন পরিকল্পনায়। মিস্ হেলেন পার্কহার্ষ্ট হচ্ছেন এই অভিনব পরিকল্পনার প্রবর্তক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাল্টন নামক স্থানে মিস্ পার্কহার্ষ্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এই নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তাই স্থানের নামানুসারে এই পরিকল্পনার নাম হয়েছে ডাল্টন পরিকল্পনা। বিকল্পে একে পার্কহার্ষ্ট পরিকল্পনা (Purkhurst Plan) বা প্রয়োগশালা পরিকল্পনাও (Laboratory Plan) বলা হয়।

ইস্কুল বলতে চিরাচরিত যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ডাল্টন প্ল্যানে তা একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এতদিন আমরা দেখে এসেছি পাঠগ্রহণেচ্ছু ছাত্রেরা নিজ নিজ শ্রেণী-কক্ষে সমবেত হয়ে বসে থাকে। ঘণ্টা বাজে আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকমহাশয়রা রুটিন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে পাঠদান করে বেড়ান। অর্থাৎ, ছাত্রেরা বসে থাকে আর শিক্ষকেরা রুটিন অনুসারে ঘুরে বেড়ান। ডাল্টন প্ল্যানে এটা একেবারে উল্টে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শ্রেণী-কক্ষ নেই, রুটিন নেই, ঘণ্টাও নেই।

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। কক্ষগুলিও সাধারণ শ্রেণী-কক্ষের মত বিশেষত্বহীন নয়। বিভিন্ন বিষয়ের কক্ষগুলি বিষয় অনুযায়ী ছবি, চার্ট, ম্যাপ, মডেল, গ্রন্থ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ায় প্রত্যেকটি কক্ষে পঠনোপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

ছাত্রেরা তাদের নিজ নিজ রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে কোন বিষয়ে যে কোন সময়ে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা পাঠ নিতে পারে। এর ফলে প্রত্যেকটি ছাত্র তাদের আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে বিষয়ের অনুশীলন করতে পারে। যতই আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual differences) কথা প্রচার করি শ্রেণী-কক্ষের পাঠদানের পুরাতন পদ্ধতিতে তার বিশেষ কোন মর্যাদাই রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু ডাল্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের

মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে একটি অসুবিধা হতে পারে। এইভাবে পঠন-পাঠনা সম্পূর্ণ ছাত্রদের দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়ায় ফাঁকিবাজ ছাত্রদের ফাঁকি দেবার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। সুতরাং শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়ত সকলের পক্ষে সম্ভব হবে না। যার যেটা অরুচিকর বা কঠিন লাগবে সে সেটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চাইবে, ফলে শিক্ষাটা সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না।

এই অসুবিধার প্রতিকারকল্পে ছাত্রদের প্রতি মাসে একসঙ্গে একমাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

যে যখনই যা পড়ুক মাসের শেষে তার নির্দিষ্ট কাজটুকু (assignment) শেষ করতেই হবে, এবং বিভিন্ন বিষয় পাঠ করে তার সারমর্ম লিখতে হবে। পরে শিক্ষকমহাশয় সেই সব রচনা দেখে প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যেক বিষয়ের পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (graph) প্রস্তুত করবেন। এই রেখাচিত্র দেখলেই ছাত্রদের নানা বিষয়ের উন্নতি-অবনতির পরিচয় পাওয়া যাবে!

ডাল্টন প্ল্যানে পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। উন্নতির রেখাচিত্র দেখেই তাদের উন্নতি-অবনতি নির্ণীত হয়। কোন-ছাত্র পূর্বনির্দিষ্ট কাজ সুসম্পূর্ণভাবে যতক্ষণ না করতে পারছে ততক্ষণ তাকে আর নূতন কাজ দেওয়া হয় না। আবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি কারো কাজ শেষ হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে আরো নূতন কাজ পায়! সহপাঠীদের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না!

এই পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষাদানের এমন কতকগুলি **সুবিধা** আছে যা অন্য কোন পদ্ধতিতে নেই। যথা—

(১) ডাল্টন প্ল্যানে ছাত্রগণ তাদের নিজ নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে। মেধাবী ছাত্র বা অল্পমেধা ছাত্র প্রত্যেকেই নিজস্ব সামর্থ্য অনুসারে এগিয়ে চলে। একজনের জন্য অপরজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(২) বিদ্যার্জনে ছাত্রেরা যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হতে শেখে। আত্মচেষ্টায় উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে এই পরিকল্পনায়।

(৩) এই পরিকল্পনায় ছাত্রদের ইচ্ছামত পড়াশুনা করবার সুযোগ থাকায় তারা নিজেদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন বিষয়ে সময় দিতে পারে, তার ফলে

যে বিষয়ে তারা কাঁচা সে বিষয়ে বেশী সময় দিয়ে সংশোধন করে নেবার সুযোগ পায়।

(৪) ছাত্রগণের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আত্মনির্ভর হতে শেখে।

(৫) শ্রেণী-কক্ষের পরিবর্তে বিষয়কক্ষের ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। বিষয়কক্ষগুলি যেন শিক্ষালাভের প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটরি। এই জন্য এই পরিকল্পনাকে ল্যাবরেটরি পদ্ধতিও (Laboratory method) বলা হয়।

(৬) নিজ নিজ রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে পড়াশুনা করতে পারে বলে ছাত্রেরা অধিকতর উপকৃত হয়, উৎসাহিত হয়।

(৭) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র দেখে ছাত্রেরা প্রতিদিনই তাদের উন্নতি-অবনতির স্বরূপ জানতে পারে, এবং আপেক্ষিকভাবে পাঠোন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে পারে।

(৮) প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে পড়তে পাওয়ায় পাঠ সুষ্ঠু হয়।

(৯) প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিতে পারেন।

(১০) পড়াশুনা পরীক্ষা-শাসিত নয় বলে বাছাই করে পড়া, না বুঝে মুখস্থ করা প্রভৃতি বর্তমান শিক্ষার অনিবার্য কুফল থেকে অব্যাহতি ঘটে।

কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ডাল্টন পরিকল্পনা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি বা সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয় নি। কারণ এর কতকগুলি **অসুবিধা** আছে। যথা—

(১) অত্যন্ত ব্যয় বহুল, কারণ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং সুসজ্জিত বিষয়কক্ষ ল্যাবরেটারী না থাকলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না।

(২) ছাত্রের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকায় অপরিণতবুদ্ধি শিশুশ্রেণীর পক্ষে এ পন্থা একেবারেই অনুপযোগী। কারণ শিক্ষকের সহযোগিতা ব্যতীত নিজের নিজের দায়িত্বে তারা পড়াশুনায় অগ্রসর হতে পারবে না।

(৩) শ্রেণী-পাঠনায় যে গণমনের বিকাশ ঘটে এখানে সে সম্ভাবনা নেই, শুধু গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞানই নয়, গণচেতনা বা সামাজিকতাবোধও আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। ডাল্টন পরিকল্পনায় সে ব্যবস্থা নেই।

(৪) সকল বিষয় শিক্ষার উপযোগিতা সমান নয়।

(৫) শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের পরিবর্তে পাঠ্যগ্রন্থের উপরই ছাত্রদের নির্ভর করতে হয় বেশী।

(৬) কেবলমাত্র ছাত্রের লেখা সারমর্ম অনুসারে পাঠোন্নতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সুতরাং উন্নতির রেখাচিত্রটি সত্যসত্যই উন্নতির চিত্র কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়, এবং এরই উপর নির্ভর করে পঠন-পাঠনার অগ্রগতি সব সময়ে আশানুরূপ ফল নাও দিতে পারে।

(৭) রুটিন বা ঘণ্টা না থাকলে বিদ্যালয়ের কোন নিয়মশৃঙ্খলাই থাকে না।

(৮) এই পরিকল্পনায় শিক্ষককে একেবারেই নিষ্ক্রিয় দর্শকের শ্রেণীতে নামিয়ে আনা হয়েছে। একই ঘরে একই বিষয় প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা শিক্ষকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

(৯) ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিক্ষক হয়ত বিষয়-কক্ষে প্রস্তুত হয়ে একাই বসে থাকবেন, আবার কখনও বা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্র একসঙ্গে এসে হাজির হবে। কারণ, কে কখন কি বিষয় পড়বে সেটা সম্পূর্ণই ছাত্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা

ডাল্টন প্ল্যানের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করে দেখা গেল এর অনেকগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অনেক শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার কিছু কিছু অদল-বদল করে শ্রেণীপাঠনার অনুপূরক ভাবে সংশোধন করে নিয়েছেন। এর ফলে অসুবিধাগুলি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়ে ডাল্টন প্ল্যান সহজসাধ্য হয়েছে এবং শ্রেণীপাঠনাও উন্নততর হয়েছে। এ সংশোধিত পরিকল্পনায়—

(১) স্কুলের সময়টাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগে রুটিন-অনুযায়ী শ্রেণী-পাঠনা এবং শেষভাগে ডাল্টন প্ল্যান-অনুযায়ী বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রথমভাগে শিক্ষক যে পাঠ দিলেন দ্বিতীয়ভাগে ছাত্র তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে স্বচেষ্টায় তার অনুশীলন করতে পারে।

(২) ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের জন্য সুসজ্জিত বিষয়-কক্ষ রেখে বাকিগুলি শ্রেণী-কক্ষেই পঠন-পাঠনা চলতে পারে।

(৩) ঘণ্টা এবং রুটিনকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। প্রথমাংশ ত যথারীতি রুটিন অনুসারেই চলবে, দ্বিতীয় অংশেও ঘণ্টা বাজবে তবে ছাত্রেরা ইচ্ছা করলে কোন বিষয় এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা ধরে পড়তে পারবে।

(৪) কেবলমাত্র সারমর্ম লেখার উপরই উন্নতি রেখা রচিত হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র মৌখিক বা লেখার পরীক্ষাও নেওয়া হবে এবং উভয়ের সম্মিলিত ফল দেখেই উন্নতি-রেখা রচিত হবে।

কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশে কয়েকটি সরকারী স্কুলে এই সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা অনুসারে পঠন-পাঠনার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু নানা প্রকার অসুবিধার জন্য পরে তা পরিত্যক্ত হয়।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি

(The Kindergarten Method)

বিখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবল্ শিশুশিক্ষার যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তার তিনি নাম দিয়েছেন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি। 'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দটির অর্থ হল শিশুর বাগান। নামটি থেকেই ফ্রয়েবলের শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। ফ্রয়েবলের মতে শিশুরা বিশ্বউদ্যানের চারাগাছ আর শিক্ষক হচ্ছেন বাগানের মালী। মালী যেমন যত্ন করে সার জল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে গোরুছাগলের মুখ থেকে বেড়া দিয়ে চারা গাছগুলিকে রক্ষা করে, শিক্ষক তেমনি শিশুচারাগাছগুলি বড় করে তুলবেন। চারাগাছের মতই শিশুরা প্রকৃতির কোলে মাটির রস পেয়ে আকাশের আলোবাতাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে। এই হল তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্য।

শিশুমাত্রেই খেলা করতে চায়, নাচগান হৈ-হল্লা করতে ভালবাসে, সবকিছু ভাঙ্গতে চায় গড়তে চায়। বিচিত্র জগতে তারা নূতন অতিথি, তাই তাদের বিস্ময়ভরা চোখ। আনন্দভরা মন।

সুন্দর ফুলের মতই তারা ফুটে উঠে পৃথিবীর বুকে। ফ্রয়েবল্ শিশুদের এই আনন্দস্বরূপটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিশু-শিক্ষার নাম যে শিশুপালবধ চলছে তার প্রতিবিধান করতে গিয়ে সৃষ্টি করলেন এই নূতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 'বিদ্যালয়' এই শব্দটাও তিনি ব্যবহার করলেন না। তার পরিবর্তে কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুর-বাগান নাম দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যটি পরিস্ফুট করতে চাইলেন।

কিণ্ডারগার্টেনের মূলকথাই হল 'খেলার মাধ্যমে শিক্ষা' আর শিক্ষার মূলকথা হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনা। নবাগত শিশু জগতের সমস্ত জ্ঞানকে ত ইন্দ্রিয়-মাধ্যমেই গ্রহণ করবে তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনাই (Sense Training) হল শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা। এরজন্য ফ্রয়েবল্ বিচিত্র রঙের নানারকম খেলনা আবিষ্কার করেছেন। এইগুলির তিনি নাম দিয়েছেন উপহার (Gifts)। একটা বাক্সে থাকে নানারঙের পশমের বল, অন্য

কতকগুলিতে থাকে ছোট ছোট কাঠের ঘনক, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, কাঠি, নানারঙের তুলো স্থতো ফিতে—এই সব বিচিত্র রঙের ও ঢঙের জিনিস। এইগুলির সাহায্যে ছোট ছোট শিশুদেব বর্ণ আর আকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

আগেই বলেছি, এই পদ্ধতির গোড়ার কথাই হল আনন্দের মধ্যে দিয়ে খেলাধূলার ছলে শিশুদের শিক্ষাদান। তাই খেলাধূলা করবার প্রচুর ব্যবস্থা থাকে এই পদ্ধতিতে। আর প্রকৃতি-পরিচয় হল শিক্ষার প্রধান বিষয়। হাতে কলমে কাজ করা, নানাবিধ হাতেব কাজ শিক্ষা করা, ছবি আঁকা, নাচ গান গল্প, অভিনয় করা, এই সব হল শিক্ষায় পদ্ধতি। কর্মসঙ্গীত (Action Song) এই পদ্ধতির একটা বিশেষ অঙ্গ। গানের তালে তালে নানারকম কাজ করতে দেওয়া হয় শিশুদের—ছন্দের আনন্দের সঙ্গে কাজের আনন্দ মিশে শিশুদিগকে আনন্দময় করে তোলে। এই সব আনন্দময় কাজেরও নানাপ্রকার শ্রেণীকবণ করেছেন ফ্রয়েবল্। কাজগুলির নাম দিয়েছে তিনি বৃত্তি (Occupation)। নানারকমের কাগজ মোড়া; কাগজের ভাঁজে নানারকম খেলনা তৈরী করা, মাদুর বোনা, ঝুড়ি-বোনা, কাগজের ফুল তৈবী করা সেলাই করা প্রভৃতি নানা ধরনেব বৃত্তি নির্দেশ কবেছেন ফ্রয়েবল্। উপহার ও বৃত্তি (Gifts & Occupations) এই দুটিই হল ফ্রয়েবলের শিশুশিক্ষায় প্রধান উপকরণ।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের বাস্তব জগতেব পরিবেশে রাখা হয় বলে তারা জাগতিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিকতার শিক্ষাও ধীরে ধীরে অর্জন করে। তার স্কুল হবে এমন একটা জায়গায় যেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস, সত্যেব মূলতত্ত্ব, ন্যায়পরতা, সাধুতা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রেরণা প্রভৃতি শিখতে পারে, বই পড়ে নয়, নিজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা।

ফ্রয়েবলের দার্শনিক চিন্তার মূল কথাই হল যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক এবং অখণ্ড আনন্দময় সত্তা থেকে উদ্ভূত। সেই বিশ্বসত্তার অনুভূতি প্রত্যেকের মনে জাগ্রত করে দেওয়াই হল শিক্ষার কাজ। তাঁর মতে জীবজগৎ, প্রকৃতি-জগৎ আর ভগবান এই তিন একই সূত্রে বিধৃত। এক ভগবৎসত্তাই বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। বিশ্বোদ্যানের শিশুচারাগুলি তাই বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র থেকে রস গ্রহণ করে আপনার আনন্দে আপনি বিকশিত হয়ে উঠে স্বাভাবিক ভাবে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে এক পরমশক্তির

লীলা। এই শক্তির লীলা ত চলেছে শিশুর মধ্যেও। কিন্তু সেই লীলা আমরা অনুভব করতে পারিনে। নানা বাধায় এই বিশ্বব্যাপী শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ হতে পারে না আমাদের মধ্যে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে সেই বাধাকে অপসারিত করে ভগবৎশক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব করা, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী সকল প্রকার শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা।

মন্তেস্বরী পদ্ধতি

(The Montessori Method)

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে আর একজনের নাম বিশ্ববিশ্রুত—তিনি হলেন ইটালীর ডঃ মাদাম মারিয়া মন্তেস্বরী।

ফ্রয়েবলের মত তিনিও শিশুশিক্ষার তত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আজীবন গবেষণা করেছেন এবং একটি অভিনব ধারাবাহিক শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিকেই আবিষ্কারকের নামানুসারে বলা হয় **মন্তেস্বরী পদ্ধতি**।

মন্তেস্বরীর যুগে অর্থাৎ বিংশশতকের গোড়ার দিকে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (individual difference) খুব বড় করে দেখা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টাই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাই পাঠকক্ষে দলগতভাবে শিক্ষাদানের প্রতিবাদ স্বরূপই যেন মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে দেখবার ব্যবস্থা করা হল। ডঃ মাদাম মন্তেস্বরী প্রথম জীবনে চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে রোমের একটি দুর্বল-মেধা শিশু-আশ্রমের ভার প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি বিখ্যাত শিশু-শিক্ষাবিদ ডঃ সেগুঁই-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে কাজ করতে গিয়ে নিজেও স্বতন্ত্র ভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দেন। এইভাবে সেইখানে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার সূত্রপাত। আবিষ্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি সেই সব ক্ষীণবুদ্ধি অস্বাভাবিক ছেলেদের উপর প্রয়োগ করে ভাল ফল পেলেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে পদ্ধতিটি আরো সংস্কৃত ও সুমার্জিত করে স্বাভাবিক শিশুদের উপর প্রয়োগ করে দেখলেন, ফল আরো ভাল হয়েছে। তখন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মাদাম মন্তেস্বরী তাঁর নূতন পদ্ধতির পরীক্ষাগার হিসাবে নূতন শিশু শিক্ষালয় খুললেন; এবং এই শিক্ষালয়ের তিনি নাম দিলেন—'শিশু-নিকেতন' বা Casa-dei-Bambini। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে যে সব সুপ্ত প্রতিভা আছে, ক্ষমতা বা প্রবণতা আছে, নানাবিধ কাজকর্মের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলাই শিক্ষার মূল কথা—

(The child is a body which grows and a soul which

develops······We must neither mar nor stifle the mysterious form which lies within these two forms of growth, but await for the manifestation which we know will succeed one another.—M. Montessori)

বাহির-বিশ্বের সঙ্গে শিশুর পরিচয় তার ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে। সুতরাং সেই পরিচয়টি সত্য করে তুলতে হলে পরিচয় গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়গুলির সুষ্ঠু পরিমার্জনা চাই। এবং এই সুষ্ঠু ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা ছাড়া কখনও বিশ্বজগত সম্বন্ধে সত্য ধারণা গঠিত হতে পারে না। সুতরাং মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কি ভাবে এই পরিমার্জনা করা হবে? ডঃ মন্তেস্বরী এরজন্য কতকগুলি খেলনা-জাতীয় উপকরণ উদ্ভাবন করেছেন, এবং সেগুলির তিনি নাম দিয়েছেন ডাইডাকটিক যন্ত্র (Didactic apparatus)। এই সব খেলনাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে শিশুরা তা থেকে নিজেরাই নিজেদের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার কাজে এগিযে যেতে পারবে এবং নিজেরাই নিজেদের ভ্রম সংশোধন করতে পারবে।

ফ্রয়েবলের গিফট্ (gift) থেকে এগুলি নির্মিত হয়েছে।

এই বিদ্যালয়ে তিন থেকে সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। একজন পরিচালিকার (Directress) উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দেওয়া থাকে। বলাই বাহুল্য তাঁকে শিক্ষিকা বলা হয় না, বলা হয় পরিচালিকা। তাছাড়া পরিচালিকাকে সাহায্য করার জন্য সহকারীরূপে থাকবেন একজন চিকিৎসক এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক (care-taker)।

মন্তেস্বরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) **শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা**—ডাঃ মন্তেস্বরী তত্ত্বতঃ স্বীকার করেছেন, শিশুমনের পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা। সুতরাং যে শক্তি ও প্রবণতা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাকে শাসনের চাপে অবদমিত করে রাখলে তার পরিপূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব হতে পারে না।

প্রত্যেকটি নরনারী তাদের বয়স শ্রেণী নির্বিশেষে স্বাধীনতালাভের অধিকারী। বাইরের শাসন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে যেন কখনই বাধাদান না করে—এই হল তাঁর মত। তিনি বলেন বাইরে অবাধ স্বাধীনতা দিলেই

তা থেকে আসবে অন্তরের শৃঙ্খলাবোধ এবং সেই অভ্যন্তরীণ **শৃঙ্খলাই** হচ্ছে সত্যকার শৃঙ্খলা। (Discipline must come through liberty.)

তাছাড়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কোন কিছু বিশ্লেষণ করতে হলে যেমন বাইরেকার সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে হয় তেমনি শিশুর বিকাশকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হলে তাকেও শাসনের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব করে তুলতে হবে। (The school must permit the free, natural manifestations of the child if he is to be studied in a scientific manner.—Montessori)

(২) **শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীর সচেষ্ট পদ্ধতি**—এই শিক্ষাপদ্ধতি এমন ভাবে গঠিত হয়েছে যে প্রত্যেকটি শিশু নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষালাভ করবে এবং কোথাও কিছু ভুল করলে নিজেরাই তা সংশোধন করতে পারবে। এটাও তাঁর 'শিক্ষায় স্বাধীনতা' তত্ত্বেরই অঙ্গীভূত। কোন কিছু জোর করে শেখান বা ভুল দেখিয়ে দেওয়ার মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার খর্বতা আছে। সুতরাং মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে তা থাকতে পারে না।

তাঁর উদ্ভাবিত যে সব ডাইডাকৃটিক যন্ত্রাদি আছে সেগুলি পরিচালিকার নির্দেশমত ছাত্রেরা পর্যবেক্ষণ করবে, তত্ত্বাবধান করবে এবং তা থেকেই তারা নানাবিধ পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এমন কি ভুল করলেও সে ভুল সংশোধন করে নেবার ব্যবস্থাও আছে এই সব খেলনা-গুলির পরিকল্পনার মধ্যে। ডঃ মন্তেস্বরী একে নাম দিয়েছেন স্বয়ংশিক্ষা (auto education)।

খেলনাগুলির ব্যবহার করা সম্বন্ধে পরিচালিকা নিজের ইচ্ছার উপর যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন। কিণ্ডারগার্টেনে গিফট্ ব্যবহারে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ অবশ্য অনেক বেশী।

(৩) **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন**—ডঃ মন্তেস্বরীর শিক্ষাদর্শনের মূল কথাই হল প্রত্যেকটি মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে চাচ্ছে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেই স্বাতন্ত্র্যটি যেন কোন কারণেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

(If any educational act is to be efficacious, it will be

only that which tends to help towards the complete unfolding of the child's individuality.—M. Montessori)

সেইজন্য দলগত ভাবে শ্রেণীপাঠনার প্রচলিত ব্যবস্থাকে তিনি একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন। শ্রেণী রক্ষিত হয় প্রশাসনিক দিক থেকে বিদ্যালয়ের কয়েকটি একক (unit) নির্দেশ করবার জন্য মাত্র, পড়াশুনার জন্য কোন শ্রেণী-গত ব্যবস্থা তিনি রাখেন নি। তাই মাদাম মন্তেস্বরীর কথা বলতে গিয়ে—সার জন অ্যাডাম বলেন, তিনি শ্রেণীপাঠনার মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। (She tolled the knell of class teaching.)

(৪) **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিমার্জনা**—এই শিক্ষায় শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার এবং সেই সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন যাতে ভাল ভাবে করা সম্ভব হয় সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কতকগুলি বিশেষ ধরনের খেলনা তৈরী করেছেন। অবশ্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু মিল আছে এই পদ্ধতির। তবে ফ্রয়েবল এই ইন্দ্রিয় পরিমার্জনায় যতটা জোর দিয়েছেন ,ডঃ মন্তেস্বরী দিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশী, এবং এই কাজের উপযুক্ত খেলনাও (didactic apparatus) আবিষ্কার করেছেন সংখ্যায় অধিকতর।

(৫) **কর্মেন্দ্রিয়ের পরিমার্জনা**—শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয় নয় কর্মেন্দ্রিয় পরিমার্জনার ও নানা ব্যবস্থা আছে এই পদ্ধতিতে। শরীব সুগঠিত ও নীবোগ না হলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিমার্জনা কখনই ভাল ভাবে হতে পারে না। তাই শিশুব শরীর সুগঠিত করবার জন্য তিনি নানাপ্রকার দোলনা সিঁড়ি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন। দোলনায় দোলা, গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে অজ্ঞাতসারে শিশুরা তাদের দেহকে সুগঠিত করে তোলে।

এছাড়া মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে কিছু কিছু **হাতের কাজের** ব্যবস্থা আছে—তার মধ্যে বাগান করা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—বাগান রচনা করা বা কিছু কিছু পশুপাখি পোষা তিনি অনুমোদন করেন, কারণ তার মাধ্যমে শিশুরা প্রকৃতি-পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

খেলাধূলা, বিশেষতঃ কল্পনা-বিলাস খেলা (make-believe play) ডঃ মন্তেস্বরী বিশেষ আমল দেননি। তিনি বলেন শিশুকে সব সময়েই বাস্তবমুখী হতে শিক্ষা দিতে হবে। কল্পনার স্বর্গে পলায়ন করতে শিখলে তাদের চারিত্রিক

দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যাবে। ফ্রয়েবল অবশ্য শিশুদের কল্পনাশক্তি বিকাশের প্রয়োজয়ীয়তা স্বীকার করেছেন।

ডঃ মাদাম মন্তেস্বরী-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মূল তত্ত্বটি মাত্র এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এইবার ফ্রয়েবল ও মন্তেস্বরী এই দুই শিশুশিক্ষাবিদের তত্ত্ব ও পদ্ধতি ঘটিত বৈশিষ্ট্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি।

কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেস্বরী পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা

বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গুণে দুইজন শিক্ষাব্রতীর নাম একেবারে অভিন্নসঙ্গ হয়ে আছে—ফ্রয়েবল্ এবং ডঃ মন্তেস্বরী। শিশুশিক্ষাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সমস্ত কর্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়োজিত, শিশুশিক্ষাকে উপলক্ষ্য করেই তাঁদেব অমূল্য অবদান উৎসর্গীকৃত।

অবশ্য উদ্দেশ্য উভয়ের এক হলেও পদ্ধতিব স্বাতন্ত্র্য আছে, এবং এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে দিয়েই আজ এই মহান শিক্ষাব্রতীদ্বয় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করেছেন। ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন এবং মন্তেস্বরীর কাসা-ডি-বাম্বিনি যুগান্তর এনেছেন শিক্ষা জগতে। শিশু শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে গবেষণা করে গিয়েছেন, রুসো, পেষ্টালজি, হার্বার্ট প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ—শিক্ষাজগতে এঁদের দানও অসামান্য কিন্তু ফ্রয়েবল এবং মাদাম মন্তেস্বরীব অপূব পদ্ধতি, অভিনব পরিকল্পনা আজ পৃথিবীর সর্বত্র যে স্থান অধিকাব করেছে তেমন বোধ হয় আর কারো নয়।

লক্ষ্যের দিক দিয়ে এই দুই শিক্ষাবিদের মধ্যে যেমন রয়েছে মিল, তত্ত্বের দিক দিয়ে তেমনি পার্থক্য।

ফ্রয়েবলের আবির্ভাব হেগেলীয় দর্শনের পটভূমিকায় এবং মন্তেস্বরী প্রয়োগবাদী দার্শনিকেব যুগে জন্মেছিলেন সেটা ভুললে চলবে না। সেই হিসাবে এই দুই দর্শনতত্ত্বের মূলগত পার্থক্যও দুই শিক্ষাব্রতীর পরিকল্পনায রূপায়িত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি ফ্রয়েবল ছিলেন আদর্শবাদী আধ্যাত্মবাদী। তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে এক পরমাশক্তির লীলা; এই শক্তির লীলা চলেছে শিশুর মধ্যেও। এই দিক দিয়ে শিশু ও বিশ্বপ্রকৃতি সমগোত্রীয়। শিক্ষার কাজ হচ্ছে সমস্ত বাধা অপসারিত করে ভগবৎ শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করা,

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা। ডঃ মন্তেস্বরীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। একান্ত বাস্তব এবং প্রাকৃত দৃষ্টিতে তিনি শিশুর সমস্যাগুলিকে দেখেছেন। কোন প্রকার রূপকথার কল্পনাবিলাসের স্থান নেই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে—তা সে রূপকথা যত আধ্যাত্মিকতার রঙেই রাঙান হোক।

এক কথায় ফ্রয়েবলের শিক্ষাদর্শের লক্ষ্য অধ্যাত্ম জীবনের অনুযায়ী শিশুকে বিকশিত করে তোলা আর মন্তেস্বরীর শিক্ষাদর্শের লক্ষ্য শিশুর দেহ ও মনকে বাস্তব জগতের উপযোগী করে গড়ে তোলা—যাতে সে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

শিশুর শিক্ষায় প্রকৃতির প্রভাব উভয় শিক্ষাবিদই স্বীকার করেছেন, কিন্তু এই প্রকৃতির স্বরূপ দুইজনের কাছে দুই প্রকার। অধ্যাত্মবাদী ফ্রয়েবলের কাছে প্রকৃতি হচ্ছে সেই এক এবং অখণ্ড পরমাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাস্তববাদী মন্তেস্বরীর নিকট প্রকৃতি মানুষের কর্মজীবনের পটভূমি মাত্র। তাই ফ্রয়েবলীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রকৃতি-পাঠ হচ্ছে শিশুর পাঠ্যসূচীর কেন্দ্রীয় বিষয় অথচ মন্তেস্বরী প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন অপর পাঠ্যের পটভূমি হিসাবে, সহায়ক হিসাবে।

এইভাবে শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, পদ্ধতির দিক দিয়েও এই পার্থক্য আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য আপাতঃ দৃষ্টিতে শিক্ষাপদ্ধতির মূল কাঠামোটা একরকম বলেই মনে হয়—মনে হয় উভয় শিক্ষাবিদই ত ক্রীড়াচ্ছল (Playway) পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলেছেন। সেই দিক দিয়ে পদ্ধতির পার্থক্য কোথায়? কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলেই ধরা পড়ে যাবে পার্থক্য।

শিশুশিক্ষার নামে এতকাল দলগতভাবে শ্রেণীপাঠনার যে-প্রথা চলে আসছিল উভয় শিক্ষাবিদই তার প্রতিবাদ করেছেন। প্রত্যেক শিশুর প্রতি স্বতন্ত্র অভিনিবেশ প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উভয়েই অনুভব করেছেন। কিন্তু মন্তেস্বরী যেভাবে শ্রেণীপাঠনার কঠিন নিগড় ভেঙ্গে শিশুদের আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন—ফ্রয়েবল তা পারেননি।

সম্ভবতঃ হেগেলীয় সমাজ-চেতনার আদর্শ তাঁকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ মর্যাদার আদর্শে অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। ফ্রয়েবলীয় কিণ্ডারগার্টেনের শিশুরা খেলা করে, খেলার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করে কিন্তু সে খেলায় বাস্তবের অপেক্ষা

কল্পনাবিলাসের স্থানই বেশী। কিন্তু মন্তেস্বরী স্কুলে ছেলেরা খেলে বাস্তবধর্মী গঠনমূলক খেলা—সবপ্রকার কল্পনাবিলাস ডঃ মন্তেস্বরী সযত্নে দূরে পরিহার করে চলেছেন। কারণ তাঁর মতে নিছক কল্পনাবিলাস শিশুকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে, বাস্তব-বিমুখ করে তোলে।

মনে হয়, একজন কল্পনার রাশ আলগা করে দিয়ে শিশুমনকে ভাবজগতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চান অপর জন বাস্তবের রাশ টেনে তাকে কর্মজগতের কঠিন পাথরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে চান।

উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জনার কথা আছে। তবে ফ্রয়েবল যেমন একই সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জনা করবার ব্যবস্থা করেছেন ; মন্তেস্বরী তা করেননি। একটি একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বেছে নিয়ে পর পর পরিমার্জনার ব্যবস্থা করেছেন মন্তেস্বরী। ফ্রয়েবলীয় তত্ত্বে শিশুর মন অখণ্ড এবং অবিভাজ্য সুতরাং তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্র করে দেখবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সামগ্রিক ভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি একসঙ্গে গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই। তাই তাঁর বিখ্যাত গিফ্‌ট (gift) গুলির বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-পরিমার্জনার জন্য শ্রেণীকরণ করা নেই। রঙ্গীন উলের বল, কাঠের চৌকোণ ত্রিকোণ চোঙ প্রভৃতি নানা রঙ্গের ও আয়তনের খেলনা—কার্ডবোর্ডের কাজ, কাগজ কাটা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি নানা রকম উপকরণের মাধ্যমে চলবে শিশুর সামগ্রিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জনা।

মন্তেস্বরীর শিক্ষোপকরণগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তাদের শিক্ষা-মূল্যও বেশী। তাছাড়া এগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হল এর সাহায্যে শিশুরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি নিজেরাই সংশোধন করতে পারে, এর ফলে মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে শিক্ষাটা খেলার মাধ্যমে আপনা থেকেই চলতে থাকে···শিক্ষক-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। মন্তেস্বরীর এইসব ক্রীড়োপকরণগুলির নাম 'ডাইডাকটিক' যন্ত্র। মন্তেস্বরী-শিক্ষাপদ্ধতির সবচেয়ে বড় কথা হল—শিক্ষক-নিরপেক্ষ সচেষ্টনির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা। তাই মন্তেস্বরী তাঁর এই উদ্ভাবিত পন্থায় শিশুকে যেভাবে আনন্দের মধ্যে স্বাধীনতার মধ্যে ছেড়ে দিতে পেরেছেন এমন আর কেউ নয়। ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেনে শিশুরা শেখে কাজের মাধ্যমে কিন্তু মন্তেস্বরীর পদ্ধতিতে শিশুরা শেখে আনন্দের মাধ্যমে। এই আনন্দ নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দ, ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার আনন্দ।

তাছাড়া, ভাষা-শিক্ষার দিক দিয়ে ফ্রয়েবলের পদ্ধতি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে এই বিষয়ের অভিনব কৌশল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

যাই হোক এই দুই মহান শিশুশিক্ষাবিদের মধ্যে মতের ও পথের যত পার্থক্যই থাক, একথা আজ অনস্বীকার্য যে উভয়েরই মূল কথা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। গতানুগতিক প্রাণহীন যান্ত্রিক পদ্ধতির কঠিন শৃঙ্খল ভেঙ্গে শিশুর শিক্ষাকে এঁরা মুক্তি দিয়েছেন সৃজনধর্মী আত্মবিকাশের আনন্দলোকে। সেই দিক দিয়ে এঁরা সমস্ত জগতের নমস্য।

এই প্রসঙ্গে উভয় শিক্ষাবিদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি তুলনামূলক আলোচনা এখানে উল্লেখ করতে পারি—

(১) ফ্রয়েবল ছিলেন মূলতঃ দার্শনিক। তাই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূলতত্ত্ব বুঝতে হলে ফ্রয়েবলের দার্শনিক মতের সন্ধান নিতে হবে।

মাদাম মন্তেস্বরী ছিলেন চিকিৎসক। তাঁর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের। তাই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুকে ও তার চাহিদাকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, ও সেই অনুসারে তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলেছেন।

(২) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুকে এমন একটি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাতে অন্তরের সামাজিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়। শিশুরা একসঙ্গে খেলাধূলা করে, কাজকর্ম করে, পড়াশুনা করে তার ফলে তারা সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবার সুযোগ পায়।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন হয় বেশী। সেখানে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা, তাই তারা নিজেদের মনে নিজের মত স্বতন্ত্রভাবেও খেলাধূলা করতে পারে। কিন্তু সংঘ-চেতনা গড়ে উঠতে পারে না।

(৩) কিণ্ডারগার্টেনের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তার ফলে তারা সবাই একসঙ্গে কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, খেলাধূলা সবই করতে পারে। কাজকর্ম চলে রীতিমত সময়-পত্রিকা অনুসরণ করে। সেই হিসাবে এখানে ছাত্রের ব্যক্তি-স্বরূপ অপেক্ষা সমাজ-স্বরূপের প্রাধান্য বেশী। মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে কিন্তু রুটিন-বাঁধা শ্রেণী-পাঠদানের কথা নেই। শিশুরা তাদের ইচ্ছামত পড়তে পারে বা খেলতে পারে। এঘর ওঘর করা

বা চেয়ার ঠেলেঠুলে নিয়ে গিয়ে যেখানে ইচ্ছা বসে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা পড়াশুনা বা খেলাধূলা করতে পারে—সেদিকে কোন বাধা নেই।

(৪) শিশু শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি-পরিমার্জনার জন্য ফ্রয়েবল কুড়িটি গিফ্‌ট (gift) আবিষ্কার করেছেন। এই গিফ্‌টগুলি নাড়াচাড়া করতে করতেই শিশুদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জনা হয়। তারা এই গিফ্‌টগুলি নিয়ে খেলতে খেলতেই বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি বর্ণ কাঠিন্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে বহু রকমের উপকরণ (Didactic apparatus) ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়াভূতি-পরিমার্জনার জন্য, কতকগুলি লিখন-পঠন বা গাণিতিক সংখ্যা অনুশীলনের জন্য, কতকগুলি বা পেশী নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত হয়েছে! সুতরাং এই সকল উপকরণ যেমন-তেমন ভাবে খেলার ছলে নাড়াচাড়া করবার জন্য নয়, রীতিমত পরিচালিকার নির্দেশে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করতে হবে। এইগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে শিশুরা এর থেকে নিজেরাই নিজেদের ভুল সংশোধন করতে পারবে। 'ফ্রয়েবলের 'গিফ্‌টে' তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

(৫) খেলার উপর ফ্রয়েবল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং খেলার মাধ্যমেই তিনি নানাবিধ শিক্ষা দেবার কৌশল আবিষ্কার করেছেন।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে খেলাধূলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, খেলার অনুষঙ্গ হিসাবে কোন শিক্ষাব্যবস্থাও তাঁর নেই।

(৬) হাতের কাজের উপর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খুব দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রকৃতিপর্যবেক্ষণ, উদ্যানরচনা, মাটির কাজ, তাঁতের কাজ, কাগজের কাজ ইত্যাদি নানা ধরনের কাজের ব্যবস্থা আছে এই পদ্ধতিতে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে অবশ্য মাটির কাজ বা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিন্তু শিক্ষার উপলক্ষ্য হিসাবে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি।

(৭) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষকের উপর। শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্রেরা নানাপ্রকার সামাজিক গুণাবলীর চর্চা করে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ছাত্রদের দেওয়া হয় অবাধ স্বাধীনতা, এবং সেই অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে দিয়েই ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ (Free discipline) জাগ্রত করে তুলবার চেষ্টা করা হয়।

(৮) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে একজন শিক্ষিকার উপর পাঠপরিচালনার ভার দেওয়া থাকে কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চেষ্টায়। সেখানে শিক্ষকের কোন আবশ্যকতা নেই। তাই সেখানে থাকেন শিক্ষিকা নয়, পরিচালিকা (Directress)। তিনি একধারে দাঁড়িয়ে ছেলে-মেয়ের কাজ লক্ষ্য করেন মাত্র। বিশেষ প্রয়োজন না হলে তিনি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না।

(৯) কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষিকা স্থির করে দেন কোন ছাত্র কোন গিফট্ নিয়ে খেলা করবে বা কোন কাজ (Occupation) করবে। মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে শিশু নিজের ইচ্ছা বা রুচি অনুসারে নিজেই বেছে নেয় তার খেলনা (Didactic apparatus)। অবশ্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য বিভিন্ন খেলনা নির্বাচনে পরিচালিকার পরোক্ষ নির্দেশ থাকে। খেলতে ইচ্ছে না করতে চুপ করে বসেও থাকতে পারে বা অন্য কোন কাজ নিয়েও ব্যস্ত থাকতে পারে শিশুরা।

(১০) রুটিন বাঁধা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ চলে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। কারণ সেখানে শিক্ষার দলগত প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে সময়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। শিশু যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করতে পারে। কারণ সেখানে ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্বীকৃত।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

—যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ির যোগ থাকে না।

—রবীন্দ্রনাথ

—তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। —রবীন্দ্রনাথ

—Education, to those who give thair lives to it, is a joyous adventure, just because the teacher is ever a learner.

—J. J. Findlay

—The work of a teacher is two-fold, producing thought and traninig it. —Edward Thring

—The educator should be called, not a teacher, but a gardener. —Froeble

—The school master must always have the future of the boy before him. —John Locke

—The teacher should be an example in person and conduct of what he requires of his pupil. —Comenius

—A child is a book which the teacher is to leran from page to page. —Rousseau

বংশগতি ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়, তারপর পরিবেশের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নবজাত শিশু ক্রমশ পূর্ণতর মানুষরূপে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পিতামাতার মিলনে শিশুর সৃষ্টি, পরিপার্শ্বের স্পর্শনে শিশুর পুষ্টি। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে আজ আমরা যে ভাবে পাচ্ছি তার খানিকটা অংশ বংশগতির প্রভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সহজাতভাবে পাওয়া আর খানিকটা পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার সূত্রে অর্জিতভাবে পাওয়া।

বংশগতি বনাম পরিবেশ ঘটিত দ্বন্দ্ব

এই দুই অংশের পরিমাণ কত বা কোন অংশের প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী এই নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। পিণ্টার গ্যালটন, থর্নডাইক, গডার্ড, ডাগডেল প্রমুখ একদল বিজ্ঞানী বংশগতির একচ্ছত্র প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁদের কথা হল—'শুয়োরের কান দিয়ে কি আর রেশমের থলি বোনা যায় ?' অর্থাৎ বংশের প্রভাবে যারা শুয়োরের কান হয়ে জন্মেছে, হাজার চেষ্টা করলেও তাদের রেশমের সুতোয় রূপান্তরিত করা যাবে না। শুয়োরের কান আর রেশমের সুতো এ হল একেবারে জন্মগত ব্যাপার, কোন রকম কৃত্রিম প্রচেষ্টাতেও তাদের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়।

আবার পরিবেশের সমর্থকরাও বড় কম যান না। লক, হেলভেসিয়াস, জাড্, ক্যাটেল, বেগলে, ওয়াটসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীবৃন্দ মহাভারতের কর্ণের মতই বলেছেন—'জন্ম মোর যথা তথা কর্ম মোর হাতে—'

ওয়াটসন ত বংশগতির সমর্থকদের চ্যালেঞ্জ করে বললেন—যে কোন বংশের এক ডজন সুস্থ সবল শিশু যদি তাঁর হাতে দেওয়া যায় তাহলে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ করে তিনি তাদেরকে ইচ্ছামত মানুষ গড়ে তুলতে পারেন।

[Give me a dozen healthy infants well informed and my scientific world to bring them up in, I might train them to become any type of specialist, I might select, regardless of their hereditray equipment.]

মোট কথা এই দ্বন্দ্বের মূল বক্তব্য হল একজনের মতে পিতামাতার শুক্র ও ডিম্বকোষের (Sparmatozoa and ovum) সংসর্গের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের ভবিষ্যত-জীবনের পথ সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, পরিবেশ তার যতটুকু পরিবর্তন ঘটায় তা একান্তই নগণ্য।

অপরের মতে শিশু একেবারে মোছা শ্লেট (Tabula rasa) নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তারপর পরিবেশের প্রভাবে লেখা শুরু হয় সেই শ্লেটে। পিতামাতার যে প্রভাব আমরা শিশুর জীবনে দেখি তা পিতামাতার পরিবেশে শিশুরা মানুষ হয় বলে।

সমস্যা সমাধানে পরিসংখ্যান তত্ত্ব

কোন কোন বিজ্ঞানী পরিসংখ্যান তত্ত্বের সাহায্যে এই দুই মতের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত এবং কুখ্যাত ব্যক্তির বংশ-বিতান অনুসন্ধান করেছেন। ওয়েজউড,—ডারউইন,—গ্যালটন পরিবারের বংশধারা অনুসন্ধান করে দেখা গেল বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এই সব বংশের অধিকাংশ ব্যক্তিই জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত হয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে জ্ঞানীবংশের ধারা চলেছে, পরিবেশের প্রভাব তাকে বড় বেশী পরিবর্তন করতে পারেনি।

ডাগডেল আবার এর উল্টো দিকটাও দেখিয়েছেন কুখ্যাত যুক-পরিবারের বংশগতি আলোচনা করে। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন অপরাধ-প্রবণ ভবঘুরে জেলে। পরবর্তী দু'শ বছর ধরে এই বংশে যে সব ছেলেমেয়ে জন্মেছে, দেখা গেল তাদের অধিকাংশই হয়েছে দুর্বলমেধা, চোর, বদমাইস, উন্মাদ এবং সমাজ-বিরোধী প্রকৃতির লোক।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছেন গডার্ড। আমেরিকার জনৈক ক্যালিকাক্ পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেন ক্যালিকাকের দুই স্ত্রী। তাদের মধ্যে একজন সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশের মেয়ে, এবং অপজন হীনবুদ্ধি অপরাধপ্রবণ বংশের মেয়ে। আশ্চর্যের বিষয় প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশে অধিকাংশই মার্জিত রুচি, শিক্ষিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ভবঘুরে অপরাধপ্রবণ দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন।

যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করেও বেশ মজার তথ্য পাওয়া গেল। যমজ সন্তান দুই প্রকার হতে পারে—সমকোষী ও ভিন্নকোষী। যমজদ্বয়

যখন একই জননকোষ (zygote) বিভক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় তখন তাদের বলা হয় সমকোষী যমজ সন্তান (one-egg twins) আর একাধিক জনন কোষ থেকে যখন যমজ সন্তান জন্মায় তখন তাদের ভিন্নকোষী যমজ (two-egg twins) বলে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সমকোষী যমজেরা আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে অনেকটা এক ধরনের। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না।

কিন্তু ভিন্নকোষী যমজেরা দুটি স্বতন্ত্রভাবে জাত সন্তানের মতই। এদের মধ্যে পরিবেশ-ঘটিত প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী।

[·· · the one-egg twins have similar heredities, regardless of whether they are reared together or apart. Two-egg twins differ in heredity as much as do brothers and sisters born at different times······L. C. Dunn and T. Dobzhansky.]

সুতরাং ভিন্নকোষী যমজ অপেক্ষা সমকোষী যমজ সন্তানের অভিন্নতা বংশগতির অপরিবর্তনীয়-প্রভাবই প্রমাণ করে। উইংফিল্ড তাই বলেছেন যমজ সন্তানদের মানসিক শক্তির অভিন্নতা কেবলমাত্র পরিবেশ বিচার করে ব্যাখ্যা করা চলে না—[Environment is inadequate to account for the mental resemblance of twins.]

তবে বিপরীত মতের পরিসংখ্যানেরও অভাব নেই। পার্শি নান সাহেব ইংলণ্ডের বার্নাডো হোমস্ জাতীয় বিদ্যালয়ের উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসে ভাল পরিবেশে মানুষ করে তোলা হয়, তাদের অধিকাংশই সুশিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠেছে। [The records of such institutions as the Barnado Homes point in the same direction as East's scientific analysis ; for they tend to show that the most unpromising stock when properly nurtured, may yield good and sound human materials. —Percy Nunn.

বংশগতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

বংশগতির আর পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে পরিসংখ্যান তথ্য যে তত্ত্বই প্রকাশ করুক জীববিজ্ঞানীরা নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রজননতত্ত্বের

মূল সত্যটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। রসায়ন শাস্ত্র অনুযায়ী দুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থের, এবং এই যৌগিক পদার্থের গুণাবলী মৌলিক পদার্থগুলির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। জীববিজ্ঞান শাস্ত্র অনুসারেও দেখা যায় পুরুষের শুক্রের (sperm) সঙ্গে স্ত্রীডিম্বের (ovum) সংযোগে যে ভ্রূণের (zygote) উৎপত্তি ঘটে, গুণানুসারে তা শুক্র বা ডিম্ব থেকে স্বতন্ত্র।

ভ্রূণ (zygote) হচ্ছে নিষিক্ত প্রথম জীবকোষ। এই জীবকোষটি ক্রমশ বহুগুণিত হতে হতে পরে জীবদেহ গঠন করে। সুতরাং ভাবী মানুষটির সমুদয় সম্ভাবনা এই ভ্রূণবিন্দুটির মধ্যে সুপ্ত থেকে গিয়েছে বললে ভুল বলা হবে না—এই হল বংশগতি [The sum total of the potentialities possessed by an organism in the zygote stage of it's existences.]

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী, যে সমস্ত শারীরিক মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, ভ্রূণটির মধ্যে তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাটি সুপ্ত রয়ে গিয়েছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পিতামাতার গুণাবলীই যে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয় একথা মনে করলে অন্যায় হবে না!—কিন্তু আগেই বলেছি, মৌলিক পদার্থদ্বয়ের মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটির গুণাবলী মৌলিক পদার্থদ্বয় থেকে যেমন স্বতন্ত্র হয়, তেমনি ভ্রূণের গুণাবলীও শুক্রের বা ডিম্বের গুণাবলী হুবহু অনুসরণ করে চলে না।

বংশগতির সূত্র (Laws of Heredity)

বংশগতিধারাটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে তা থেকে আমরা কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। যথা—

(১) কোন একজাতীয় প্রাণী বা জীব সেই জাতীয় প্রাণী বা জীবই উৎপাদন করে থাকে। (like begets like)—অর্থাৎ মানুষের গর্ভে মানুষই জন্মাবে, বিড়ালের গর্ভে বিড়াল, গোরুর গর্ভে গোরু অথবা আমের বীজ থেকে আম গাছেরই উদ্ভব ঘটবে।—এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সেই রকম লম্বা পিতার সন্তান লম্বা, বুদ্ধিমানের সন্তান বুদ্ধিমান, ফর্সা পিতার সন্তান ফর্সা হবার সম্ভাবনাই অধিক। ইতিপূর্বে বংশগতির স্বপক্ষে যে পরিসংখ্যান তথ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তাও এই সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলে।

(২) সমজাতীয় জীব থেকে সমজাতীয় সন্তানই উৎপন্ন হয়। আবার পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে বিভিন্নতাও থাকে যথেষ্ট। উভয়ের মধ্যে সব সময়েই কিছু স্বাতন্ত্র্য, কিছু বিভিন্নতা এবং কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্তী পুরুষ অব্যবহিত পূর্ববর্তী পুরুষের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। অবশ্য এই পরিবর্তনের কারণ কি তা বলা যায় না।

(৩) অর্জিত বিদ্যা সোজাসুজি বংশধারায় চালান করে দেওয়া যায় না। শিক্ষিত পিতামাতার পুত্র হলেই যে সে সহজে শিক্ষিত হয়ে উঠবে এমন কথা নেই। সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর পিতার পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর নাও হতে পারে।

তবে গুণটা পুরোপুরি না দিতে পারলেও সম্ভাব্যতাটা বংশধারার মধ্যে কিছু পরিমাণে চালান করা যায়। শিক্ষিত পিতামাতাব সন্তান সমপরিমাণ শিক্ষিত হয়ত হবে না, তবে শিক্ষিত হবার সম্ভাবনাটা যে তার মধ্যে অধিকতর থাকবে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

(৪) পিতামাতা থেকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশধারা অনুসরণ করে চললে দেখা যাবে পৈতৃক গুণাবলীর সমতা ও বিসমতা উভয়ই সমানভাবে বংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এও দেখা যাবে ক্রমশ বৈচিত্র্যের সংখ্যা কমে গিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে আসছে গুণগুলি। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গড় অবস্থা আছে। যদিও মাঝে মাঝে গোটাকতক অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়, কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যেই অস্বাভাবিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে চায়। আকৃতির কথাই ধরা যাক—মানুষের একটা স্বাভাবিক গড় উচ্চতা আছে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি লম্বা এবং কয়েকটি বেঁটে মানুষ জন্মায়। কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যে দেখা যাবে লম্বা এবং বেঁটের সন্তানেরা গড়ের দিকেই সরে আসছে।

প্রজনন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

কিন্তু কেন এমন হয়? প্রজনন তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যাবে একটি নিষিক্ত ডিম্বকোষ (fertilised ovum) বহুগুণিত হতে হতে ক্রমশ সম্পূর্ণ দেহটি গঠিত হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টিধর্মী বীজপঙ্কটি (germ plasm) অবিকৃত থেকে যায় জীবের দেহে। সেই জীবকোষটি চলে যায় সন্তানের দেহে এবং নূতন সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকে দেহের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক

ওয়েজম্যান এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন মানুষ হল জননকোষটির ন্যাসরক্ষক মাত্র। এই হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ নয়, তারা যেন একই বীজপঙ্ক থেকে বিভিন্ন মাতৃগর্ভজাত দুই বৈমাত্রেয় ভাই। (father and son are two step-brothars by different mother)

ওয়েজম্যানের তত্ত্ব অনুসারে কোন গুণই ত বংশধারায় প্রবেশ করার কথা নয়। তাছাড়া একটি বীজপঙ্ক থেকে একটি বংশের ধারা উৎপন্ন হলে মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণও ব্যাখ্যা করা যায় না।

তাছাড়া পরীক্ষার দ্বারাও দেখা যায়, নিম্ন-শ্রেণীর জীবের মধ্যে বীজপঙ্ক অবিকৃত থাকলেও মানুষের দেহে তা শোষিত হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একটি বীজপঙ্ক সৃষ্টি হয়।

মেণ্ডেলের সূত্র (Mendel's law)

তাহলে বংশানুক্রমে গুণাবলীর প্রসারণ ঘটে কিনা এবং ঘটলে তা কেমন করে ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। প্রজনন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জন গ্রেগর মেণ্ডেল সাহেব উনিশ শতকের মধ্যভাগে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তারি মধ্যে এই প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর মিলেছে।

প্রথমে তিনি ক্ষুদ্র আর লম্বা দুই জাতের মটরদানার সঙ্কর উৎপন্ন দ্বারা পরীক্ষা করে দেখলেন, বংশধারায় গুণাবলীর প্রসারণ কি হিসাবে ঘটছে।

ক্ষুদ্র দানার আর লম্বা দানার সংমিশ্রণে যে ফলগুলি উৎপন্ন হল তা সবই হল লম্বাজাতের। হ্রস্বতার গুণটি যেন লুপ্তই হয়ে গেল। লম্বা গুণের চাপে ক্ষুদ্রতা গুণটি যেন পেছিয়ে পড়ল। মেণ্ডেল এই এগিয়ে-আসা গুণটির নাম দিলেন মুখ্য (dominant)। আর পিছিয়ে যাওয়া গুণটির নাম দিলেন গৌণ (recessive)। পরের পরীক্ষায় দেখা গেল গৌণ গুণটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি, সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র। সুযোগ পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করেছে বংশের মধ্যে। আরো আশ্চর্যের বিষয়, গুণের এই মুখ্যতা ও গৌণতা একেবারে গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।

অতঃপর এই লম্বাজাতের বীজগুলি বপন করে তা থেকে কিন্তু লম্বা আর ক্ষুদ্র দুই জাতের ফলই পাওয়া গেল ৩ : ১ অনুপাতে, অর্থাৎ উৎপন্ন ফলগুলির তিন ভাগ হল লম্বা জাতের আর একভাগ ক্ষুদ্র জাতের। ক্ষুদ্রগুলি হল

খাঁটি (pure) ক্ষুদ্র অর্থাৎ এগুলির মধ্যে আর লম্বা হবার গুণ থাকল না। কিন্তু তিন ভাগ লম্বার মধ্যে একভাগ হল খাঁটি (pure) লম্বা আর দুইভাগ মিশ্র (impure) লম্বা। মিশ্র-লম্বা ফল চাষ করে তা থেকে আবার পাওয়া গেল একভাগ খাঁটি লম্বা, একভাগ খাঁটি ক্ষুদ্র এবং দুইভাগ মিশ্র লম্বা।

রস (Ross) সাহেব তাঁর বইতে এই মেণ্ডেলীয় বংশগতির ধারা বোঝাবার জন্য একটি নকসা দিয়েছেন তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে—
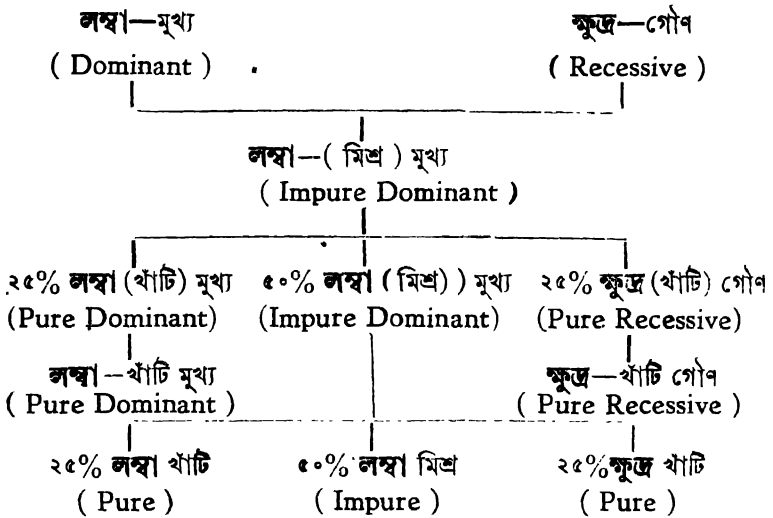
খাঁটি আর মিশ্র বলবার উদ্দেশ্য হল খাঁটিগুলির ঐ নির্দিষ্ট আকার একেবারে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে, আর মিশ্রগুলির তা হয় নি, একটু সুযোগ পেলেই তার মধ্যে বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মটরদানার পর আরো অন্যান্য উদ্ভিদ এবং ইতর প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা করেও মেণ্ডেল এক রকমই ফল পেলেন। সুতরাং মেণ্ডেলীয় তত্ত্বে বোঝা গেল পিতামাতার মধ্যে দিয়ে যদি দুই বিপরীতধর্মী গুণের সংমিশ্রণ ঘটে তবে মিশ্র বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই উভয়গুণের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ হতে পারে। পিতা ও মাতার জননকোষদুটির গুণানুসারে কোনও গুণ স্থায়ী রূপ পাবে, কোনটি আবার অস্থায়ী হিসাবে পরিবর্তিত হয়ে

যাবে পরবর্তী বংশে। এইভাবে মেণ্ডেলীয় সূত্রে পিতাপুত্রের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়েরই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

মোটকথা, বংশধারায় প্রভাবিত গুণগুলি জীবকোষের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ঘটে থাকে।

আরো সূক্ষ্মতর পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিটি জীবকোষের মধ্যে ক্রোমোসোম (Chromosome) নামে অনেক জোড়া সূত্রাকার বস্তু রয়েছে।

পুংবীজ এবং স্ত্রীডিম্ব যখন মিলিত হয় তখন মিলিত জীবকোষের (zygote) ক্রমোসোমের সংখ্যাও দ্বিগুণিত হয়ে যায়। প্রত্যেকটি জীবের এই ক্রমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন মানুষের ২৩ জোড়া, গোরুর ৮ জোড়া ইত্যাদি। এ বিষয়ে মর্গান সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করে স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন—The sperm of every species of animal or plant carries a definite number of bodies called chromosomes, The egg carries the same number. Consequently, when the sperm unites with egg, the fertilised egg will contain the double number of chromosomes. For each chromosome contributed by the sperm there is a corresponding chromosome contributed by the egg, i.e. there are two chromosomes of each kind which constitute a pair.

মর্গান সাহেব পরে আরো সূক্ষ্মতর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন প্রতিটি ক্রোমোসোমের মধ্যে আবার রয়েছে জিন (gene) নামক আরো সূক্ষ্মতর বস্তু। মানুষের মধ্যে এই জিনের সংখ্যা কয়েক সহস্র! এবং এদের বিভিন্ন ধরনের মিলনের ফলেই সন্তানের মধ্যে এত গুণবৈচিত্র্য দেখা যায়। [The unit of inheritance is undoubtedly the gene of the chromosomes—Sandiford] সুতরাং কোন গুণ কি ভাবে কতটুকু কার মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে যাবে তা নির্ণয় করা আদৌ সহজসাধ্য নয়।

যাই হোক এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল যে, **মানুষ তার আকৃতি আর প্রকৃতির অনেকখানি অংশই উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে, তবে কতটা পাবে এবং কি ভাবে পাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল।**

বংশধারায় অর্জিত গুণ

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তার কোন সদুত্তর ওতে পাওয়া গেল না। মার্জিতরুচি অভিজাত এবং শিক্ষিত বংশেই কেবল শিক্ষার ফল পাবে, অশিক্ষিত মূর্খ বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের বংশধারায় শিক্ষার কি কোন ফসলই ফলান যাবে না?—অর্থাৎ মূল প্রশ্ন হচ্ছে, অর্জিত গুণাবলী কি বংশধারায় প্রবেশ করে না?

বৈজ্ঞানিক ওয়েজম্যান বীজপঙ্কের অব্যাহত ধারা উল্লেখ করে, বংশে অর্জিত গুণের প্রবেশ অস্বীকার করেছেন, এ কথা বলেছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে পুরুষানুক্রমে ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন বংশে লেজহীন ইঁদুরের উৎপত্তি হয় কিনা। কিন্তু কোন ইঁদুরই লেজহীন হয়ে জন্মাল না। অর্থাৎ কর্তিত লাঙ্গুলের গুণটি বংশধারায় গেল না। কিন্তু ডারউইন 'জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) তত্ত্বে দেখিয়েছেন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় যে সব নূতন গুণ অর্জিত হয়েছে বংশধারায় সেই সব গুণ ক্রমশ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলেই জীবজগতে এত বৈচিত্র্য। লামাকের মতে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়ার ফলেই বংশধারায় ক্রমশ বৈচিত্র্য এসেছে। এই ভাবেই জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে, উটের পা চ্যাপটা হয়েছে, বাঘের গায়ে ডোরা হয়েছে, এমনি আরো কত কি!

অথচ ওয়েজম্যানের পরীক্ষায় এই সত্যের সমর্থন পাওয়া গেল না কেন?

প্রশ্নের উত্তরে বার্নাড শ ঠাট্টা করে বলেছিলেন—ইঁদুরগুলি তাদের দেহের উপরে আঘাতকে স্থায়ী করে ধরে রাখতে চায় নি। (Mice did not like to perpetuate the assault on them).

একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে, যে ইচ্ছাটি জীবের বাঁচবার ব্যাকুলতা থেকে উৎপন্ন এবং জীবনসংগ্রামে জয়লাভের সহায়ক, সেই জীবনপ্রয়াসটি মাত্র বংশধারায় সংক্রমিত হয় এবং ক্রমশ সৃষ্টিধারায় বৈচিত্র্য আনে।

এই তত্ত্ব অনুসারে আমরা মনে করতে পারি পরিবেশের সমস্ত প্রভাবই

বংশধারায় অনুপ্রবিষ্ট না হলেও জীবন-প্রয়াসের অনুকূল আচরণগুলির প্রভাব পড়ে বংশগতিতে। আজকে আমরা অনর্জিত বা সহজাত প্রবৃত্তি (Natural instincts) নাম দিয়ে মানুষের যে সব প্রবৃত্তিগুলিকে চিহ্নিত করেছি সেগুলিও জীবনপ্রয়াসের তাগিদে ধীরে ধীরে বংশধারায় অর্জিত হয়েছে। কি ভাবে এই নিরন্তর অর্জনকার্য চলেছে জীবের মধ্যে তা ইতিপূর্বে 'শিক্ষার প্রণালী' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। অর্জনকার্য আজও বন্ধ হয়ে যায়নি, ধীরে ধীরে তার কাজ সব সময়ে চলেছে, যার পরিচয় আমরা পাই পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়ার সার্থকতায়।

পরিবেশের প্রভাব

বংশগতির প্রভাবের কথা ত এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, এইবার দেখি পরিবেশের প্রভাব।

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে বড় হয়ে ওঠে তাই হল শিশুর পরিবেশ। এমন কি মাতৃগর্ভও নিষিক্ত বীজকোষের পরিবেশ মাত্র।

পরিবেশকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিকট পরিবেশ, দূর পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। দেশের আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব যে জীবের উপর কতবেশী তা ত আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।

সামাজিক পরিবেশ—অর্থে সামাজিক আচার আচরণ সংস্কার ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির কথা বলছি। মানুষের উপর এদের প্রভাবও অনস্বীকার্য।

তারপর **মানসিক পরিবেশ**—একজন ইতিহাসের ছাত্রের কাছে প্রাচীন যুগের একটা ছবি মুদ্রা বা মূর্তি যে প্রভাব বিস্তার করবে তার ঘরের পাশের নিত্য-দেখা কোন জিনিসই তেমন পারবে না। বাংলাদেশের যে ছেলেটি ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় ব্যস্ত তার কাছে তার অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রতিবেশী অপেক্ষা সেক্সপীয়র মিল্টন বাইরন অধিকতর আত্মীয়।

দেহের পরিবেশ সব সময়ে আমাদের মনের পরিবেশ হয় না। মানসিক পরিবেশ যেন মনের চারিদিকে একটা সংস্কারের দেয়াল তুলে দেয়। সেক্সপীয়র

তাই বলেছেন—"Make not your thought your prison"। সুতরাং মানুষের উপর এই মানসিক পরিবেশও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য।

জীবের জীবনে এইসব নানাজাতীয় পরিবেশের প্রভাব যে কত বড় তা ডারউইন সাহেব তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিস্' (Origin of Species) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে জীবের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত কত পরিবর্তনই ঘটে যায়, যার ফলে জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে। অরণ্যচারী, পর্বতবাসী, সমতলবাসী, মরুভূমিবাসী বিভিন্ন মানুষের আকার-প্রকারের মধ্যে যে পার্থক্য তা একান্তভাবে পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে ওঠে এবং বংশধারায় সংক্রামিত হয়ে যায়।

গ্রাম্যবালক ও শহরবাসী বালকের চালচলন আচার-আচরণ শিক্ষা-দীক্ষা এমন কি বুদ্ধির ক্ষেত্রেও যে পার্থক্য দেখা যায় তারও প্রধান কারণ পরিবেশ।

সুতরাং মানুষের প্রকৃতি গঠনে বংশগতির প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য পরিবেশের প্রভাবও তেমনি নগণ্য নয়।—এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মিচুরিন (Michurin) ও লাইসেঙ্কোর (Lysenko) চমকপ্রদ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করতে হয়।

মিচুরিন কেবলমাত্র পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ভিদ জগতে নাকি নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সাধারণ গমকে তিনি সাইবেরিয়ার বরফের উপর অঙ্কুরিত করেছেন, একজাতীয় গম থেকে নানা জাতীয় গম উৎপন্ন করেছেন, এমন কি গমের গাছ থেকে রাই পর্যন্ত ফলিয়েছেন।

তাঁর সেই পরীক্ষার মূলকথা হল **জীবের উপরে বংশগতির প্রভাব একান্তই নগণ্য, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছামত সব কিছুই করা যায়।** লাইসেঙ্কো এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন **মিচুরিনিজম্** (Michurinism)। মিচুরিনিজম্ জীববিদ্যায় যুগান্তর ঘটিয়েছে বলে লাইসেঙ্কো-পন্থীরা দাবী করেন।

[Lysenkc's followers claim many wonderful transformations of heredity. The most extravagant of these claims is that by planting common wheat under unfavourable

conditions one can transform it not only intc a wheat of a different species but even into rye.

Dunn & Dobzhansky]

অবশ্য এই দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে বর্তমান জীববিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর পরীক্ষাগারে মিচুরিনিজিমের তথ্য সন্দেহাতীতভাবে আজো প্রমাণিত হয়নি। আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে মিচুরিনিজম লাইসেঙ্কোর পরীক্ষাগারের বাইরে কোথাও সফল হয়নি।

······Every type of experiment in Lysenko's arseral was performed by biologists before him with results that fail to support him. And whenever his work is repeated by biologists and plant breeders outside the Soviet Unic n, the results contradict Lysenko's assertion—Dunn & Dobzhansky.]

বংশগতি ও পরিবেশের সমন্বয় :

এতক্ষণ ধরে বংশগতি আর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে যা বলা হল তাতে মনে হতে পারে জীবের জীবনধারায় উভয়ের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। কারো মতে একটার জয় কারো মতে অন্যটার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে উভয়ের প্রভাব পরস্পর পরিপূরক। বংশগতভাবে প্রাপ্ত দোষগুণ কতটা বিকশিত হবে সেইটে নির্ভর করছে পরিবেশের উপর। অনেক বীজ আর জমির উপমা দিয়ে উভয় শক্তির যুগপৎ প্রভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। ভাল বীজ না হলে কোন রসাল জমিই তাকে অঙ্কুরিত করতে পারবে না, আবার ভাল বীজ হওয়া সত্ত্বেও ইট পাথরে পড়লে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্যাণ্ডিফোর্ড প্রশ্ন করেছেন ইঞ্জিন আর গ্যাসোলিন এই দুটোর মধ্যে কোনটার উপযোগিতা বেশী ?—(Which is more important—the engine or the gasoline ?)

এই প্রশ্নের তিনি সহজেই উত্তর দিয়াছেন—কাউকেই আমরা ছোট করতে পারি না—(Nobody in his senses would be little either) অর্থাৎ উভয়েরই সমমূল্য।

বংশগতির প্রকৃতিটি একেবারে স্থিরনির্দিষ্ট। গুণগতভাবে সে একেবারে

অনড়—অনর্জিত, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সার্থক পরিবেশ তাকে উদ্দীপিত করে পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। আমের বীজের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের আমের সম্ভাবনাই বংশানুক্রমিকভাবে সুপ্ত থাকে। সারযুক্ত ভালমাটির পরিবেশ পেলে তবেই সেই সুপ্ত সম্ভাবনা সুপ্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। এমন কি নিকৃষ্ট ধরনের আমের বীজকে ভাল পরিবেশের প্রভাবে রাখলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছু ভাল ফল আশা করা যায়। বিপরীতক্রমে ভাল আমও হীনপরিবেশের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।—অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় **প্রত্যেক মানুষটি তথা প্রত্যেক জীবটি বংশগতি ও পরিবেশের গুণফলের সৃষ্টি**। বংশগতির ত্রুটি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে বেশ খানিকটা সংশোধন করা যেতে পারে, আবার পরিবেশের ত্রুটিও ভাল বংশগতি অনেকটা সেরে নেয়।

একটা জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করি। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে যদি একটি সম্পূর্ণ মানুষ বলে ধরা যায় তাহলে তার ভূমিকে বংশগতি আর উচ্চতাকে পবিবেশ মনে করা যেতে পারে। ভূমি বা বংশগতিব হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই বটে কিন্তু উচ্চতা বা পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে আমাদের। সুতরাং ভূমি কারো কম হলেও উচ্চতা যথাসম্ভব বাড়িয়ে সেটাকে পরিপূরণ করা যেতে পারে।
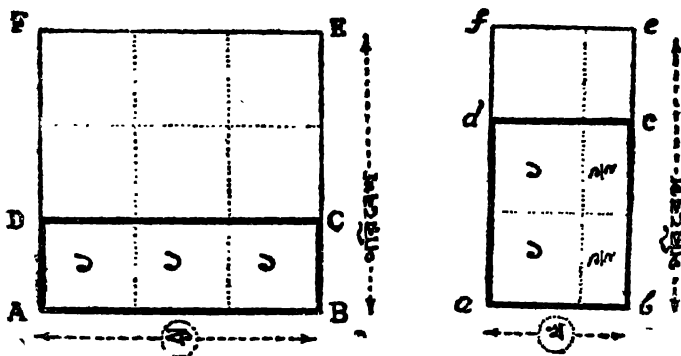
মনে করি, ক, খ দুই ব্যক্তি। তার মধ্যে ক-এর বংশগতি **খ** অপেক্ষা ভাল, ধরা যাক দ্বিগুণ (**AB**=৩, **ab**=১½)

কিন্তু **ক** অপেক্ষা **খ**-এর পরিবেশ যদি দ্বিগুণ উন্নত করা যায় তাহলে **ABCD** ও **abcd**র ক্ষেত্রফল সমান হয়ে যাবে। [**ABCD**=৩,

abcd=৩]। অর্থাৎ **ক** অপেক্ষা **খ** হীন বংশে জন্মেও উন্নততর পরিবেশের প্রভাবে উন্নত হতে পেরেছে। নান্ সাহেব বার্নাডো হোমসের ছেলেদের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এইভাবে তার ব্যাখ্যা করা যায়।

আবার উভয়েই যদি একপ্রকার হীন পরিবেশে থাকে তাহলেও বংশগতির প্রভাবে **ক**এর ফল **খ**এর চেয়ে উন্নত হবে।

কিন্তু উচ্চ বংশগতি যদি উচ্চ পরিবেশ পায় তবে তার ফল যে সর্বাপেক্ষা ভাল হবে তা ত সহজেই অনুমেয়। **ক** ও **খ** দুজনকেই যদি একই উন্নত পরিবিবেশে রাখা যায় তাহলে **ক**এব ফল **খ**এর চেয়ে উন্নত হবে। [**ABEF**=৯, **abef**=৪½]

ইতিপূর্বে বিখ্যাত ও কুখ্যাত পরিবারের বংশ বিতান থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাব ব্যাখ্যাও এভাবে করতে পারি।

সামাজিক বংশানুবর্তন (Social heritage) :

এতক্ষণ ধরে বংশগতি আর পরিবেশেব পারস্পরিক প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় দলেরই দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করা গেল। কিন্তু কারো দৃষ্টিতেই ব্যাপাবটিব সম্পূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়নি। পার্শি নান্ সাহেব বলেন বৈজ্ঞানিকেবা মানুষকে যেন জড় পদার্থ বলেই মনে কবেছেন। কিন্তু মানুষেব স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তার নিজেব প্রয়োজনের চাহিদা আছে। সেই অনুসাবেই সে তাব বংশগতি আব পরিবেশেব প্রভাবকে কাজে লাগাচ্ছে।

[… · the human organism, body and mind, is a centre of creative energy that uses endowment and environment as its working material ; so that the elements it receives from nature and nature do not make it what it becomes, except in so far as they are the bases of the free activity that is essential fact of its existence.—P. Nunn]

উডওয়ার্থ এই নির্বাচিত পরিবেশের একটা নূতন নামকরণ করেছেন কার্যকরী পরিবেশ (effective endowment)।

একই জমি থেকে আমগাছ আর নিমগাছ রস গ্রহণ করছে কিন্তু তার ফল হচ্ছে উল্টো।

একই পবিবেশে মানুষ হয়েও যমজ সন্তানদের কেউ হয় সাধু কেউ হয় গুণ্ডা।

'সুতরাং পরিবেশের প্রভাব মানুষ কতটা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে চায় সেটাও উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য এই ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে পরিবার, সমাজ ও গোষ্ঠী।

বর্তমান যুগে যে ছেলে জন্মায়, জন্মানর সঙ্গেই সঙ্গেই সে সভ্যতার নানা উপকরণের সংস্পর্শে আসে, সমাজ তার জন্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যালয় তৈরী করে রেখেছে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগের মনীষীদের চিন্তাধারার সম্পদ গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করে রেখেছে। শিশুর জীবন গঠনে এসকলের দানও নগণ্য নয়। স্যাণ্ডিফোর্ড এই কথাটাই সুন্দর করে বলেছেন—মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে জৈব বংশগতি নিয়ে এবং সামাজিক বংশগতির মধ্যে [Children are born with a biological heritage ; they are born into a social heritage.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিভার সম্ভাবনা নিয়ে যদি আফ্রিকার হটেনটট্‌দের সমাজে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব হত না।

যে বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা হয় সব সময়ে, সে বাড়ির ছেলে অজ্ঞাতসারেই পড়াশুনার প্রভাব লাভ করে। একেই আমরা নাম দিই সামাজিক বংশগতি (Social heritage)।

শিক্ষকের দায়িত্ব ঃ

বংশগতি আর পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব আলোচনা করা গেল। এ বিষয়ে শিক্ষকের কি করণীয়? মানুষের জীবনে বংশগতিই যদি একমাত্র প্রভাবশালী কারণ হত তাহলে শিক্ষকের ত কোন কিছুই করণীয় থাকত না। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না একথা ত সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু জীবন বিকাশে পরিবেশের দানও ত কম নয়। আগেই বলেছি বংশগতি দেয় সম্ভাবনা আর পরিবেশ দেয় তার রূপ। কে কতটা সম্ভাবনার মূলধন নিয়ে এসেছে তা ত জানা যাচ্ছে না, সুতরাং যথোপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে প্রত্যেকেরই সহজাত সম্ভাবনাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন শিক্ষক। শিক্ষকের অপর নাম পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী (manipulator of environment) ; সুতরাং শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য পরিবেশ (effective environment) রচনা করে সামাজিক মানুষ হিসাবে তাকে যথাসাধ্য ফুটে উঠতে সাহায্য করা ছাড়া

শিক্ষক আর কি করতে পারেন! বিদ্যালয়ের পরিবেশে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এসে শিক্ষার্থীর রুচি প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অন্যান্য শক্তি কি ভাবে বিকশিত হচ্ছে সে সবই শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বংশধারার ইতিহাসও যথাসাধ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই দুইটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনে কতটা কার্যকরী হচ্ছে।

তাই তুলনামূলক বিচার করতে গেলে বংশগতি আর পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধেও শিক্ষকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পুনরাবৃত্তিবাদ

(Recapitulation Theory)

মাতৃগর্ভে নিষিক্ত জীবকোষ থেকে জীবের উৎপত্তি। তারপর ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই নানা প্রকার পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে করতে বিচিত্র জীবলীলার অনুবর্তন চলে।

সেই হিসাবে প্রত্যেকটি জীব তার নিজ নিজ জীবনে জাতিগত জীবনের (racial life) বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ক্রমপর্যায় অনুসারে পুনরাবৃত্তি করে চলে। পশুজীবনে এই পুনরাবৃত্তির কাজ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কারণ সে ক্ষেত্রে তার জীবনধারণের পথ একেবারে ছকে-বাঁধা স্থিরনির্দিষ্ট।

মানুষের জীবনেও এই পুনরাবৃত্তি সমভাবেই কার্যকরী বলে অনেকে মনে করেন। মানুষের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির কাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) জৈব পুনরাবৃত্তি (biological recapitulation) ও (খ) মানসিক বা সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি (cultural recapitulation)।

জৈবপুনরাবৃত্তির মূলকথা—জীবসৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আদিতে ছিল এককোষদেহী আদ্যপ্রাণী, তারপর কোষবিভাজন পদ্ধতিতে ক্রমশ কোষ সংখ্যা বেড়ে চলল, সৃষ্টি হতে লাগল নূতন নূতন জীবের, শেষে বহুকোষদেহী জটিল মনুষ্য-দেহের ঘটল উদ্ভব। একটি এককোষদেহী অ্যামিবা থেকে শুরু করে সৃষ্টির বিচিত্র পথ পরিভ্রমণ করতে করতে আজকের এই অগণিত কোষ সমন্বিত জটিল মনুষ্যদেহে উপনীত হতে কত যুগযুগান্তর কেটে গিয়েছে, কে জানে।

উদ্‌বর্তন ক্রিয়ার এই যুগযুগান্তরব্যাপী পথ প্রত্যেকটি মানুষ তার মাতৃগর্ভে মাত্র কয়েকটি মাসে পরিভ্রমণ করে থাকে।

এককোষদেহী অ্যামিবা থেকে যেমন জটিল মনুষ্যদেহ হয়েছে তেমনি মাতৃগর্ভে নিষিক্ত জীবকোষ ক্রমশ কোষবিভাজন পদ্ধতিতে বহুগুণিত হতে হতে, শেষে মানবদেহের রূপ গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক উদ্‌বর্তন ক্রিয়ায় যেখানে যুগযুগান্ত লেগেছে এককোষদেহী থেকে বহুকোষদেহীতে পরিণত হতে সেখানে সেই সমস্ত পথটাই মানুষকে পরিভ্রমণ করে আসতে হয়, মাতৃগর্ভে

কয়েকটি মাসের মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষ তার জন্মকালে যেন জাতিগত উদ্‌বর্তনের সুদীর্ঘ পথটি একবার করে অতিক্রত পুনরাবৃত্তি করে আসে। তাই এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয়েছে পুনরাবৃত্তিবাদ।

এইখানে শেষ হল জৈবজীবনের পুনরাবৃত্তি। শুরু হল সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরাবৃত্তি।

সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি—শিশুর মানসিক বিকাশেও তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। গুহাশ্রয়ী একক বন্য অবস্থা থেকে আজকের এই সুসভ্য অবস্থায় আসতে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে মানুষকে। এই সকল অবস্থারই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে নবজাত শিশু থেকে পরিণত মানুষের অবস্থায় আসতে।

বন্য অবস্থায় মানুষের মানসিক গঠন যেমনটি ছিল তারি সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়াটি আমরা দেখতে পাই শিশুদের মধ্যে। তখনও মানুষের উচ্চতর মানসিক বৃত্তিব উদ্ভব ঘটেনি, আবার আদি মানুষের ব্যবহার যেমন প্রধানতঃ সহজাত প্রবৃত্তিজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, শৈশবের ব্যবহারও তাই।

এই সময় তাদের উভয়েরই কর্মপ্রচেষ্টার মূল প্রেরণা একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি। মানুষের মনে তখনও চিন্তাভাবনা যুক্তির উদ্ভব ঘটেনি, কেবলমাত্র ভাবাবেগের দ্বারাই সে তখন চালিত। শিশুদেরই মতই আদিম বন্য মানুষ খেলনা ভালবাসে। ঝকমকে জমকাল জিনিস, চকচকে কড়া রঙ, ঝমঝমে ঝঙ্কার তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বেশী আকর্ষণ করে। নিজেদের দেহকেই রঙচঙ দিয়ে সাজাতে চায়। নানা রকম ছবি এঁকে নাচ গান হল্লা করে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে চায়। ভূত পেত্নি, দৈত্যদানার অবাস্তব কল্পনা তারা বাস্তব পদার্থের মতই সত্য বলে বিশ্বাস করে। ভয় ভালবাসা ও ক্রোধ, এই তিনটি আবেগই তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। শিশু তার আদি পুরুষের মতই একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও নিষ্ঠুর, তাদের মতই সে আরাম বেদনা (pleasure and pain) নিন্দা প্রশংসা এবং পুরস্কার তিরস্কারের দ্বারা চালিত হয়। এককথায় মানুষের শৈশবকাল যেন মনুষ্য জাতিরই শৈশবকাল।

স্টানলি হল্ তাঁর খেলায় পুনরাবৃত্তি মতবাদে দেখিয়েছেন খেলার ছলে ছেলেরা কেমন করে সেই আদি জীবনের আনন্দময় দিনগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

আদিম বন্য অবস্থা থেকে মানুষ যেমন ক্রমশ এগিয়ে এসেছে—শিকার নির্ভর জীবনে, যাযাবর জীবনে, পশুপালনের জীবনে, তারপর কৃষিজীবনের

মধ্যে দিয়ে বর্তমানের শিল্পপ্রধান যান্ত্রিক জীবনে, শিশুও তেমনি জীবনায়নে শৈশব-কৈশোর, বাল্য বয়ঃসন্ধির মধ্যে দিয়ে পরিণত মানুষে এসে উপনীত হয়েছে। বন্যজীবনের সঙ্গে শিশুজীবনের ক্রমোন্নতির ধারা যেন সমান্তরাল ভাবেই এগিয়ে চলেছে।

কৃষ্টি বিবর্তবাদ (Culture Epoch Theory) ঃ

এই সত্যের উপর নির্ভর করে রেন এবং জিলার শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষ্টি বিবর্ত-বাদের (Culture Epoch Theory) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মতে বলা হয়েছে, সভ্যতার পথ অনুসরণ করে চলতে চলতে তার বিভিন্ন স্তরে মানুষ যে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রণালী অনুসরণ করে এসেছে শিশুকেও সেই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করে শিক্ষা দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুকালের পাঠ্যে রূপকথা বা ঐ জাতীয় আজগুবী কল্পনার কাহিনী থাকলেও শিশুমনকে তা সহজেই আকর্ষণ করবে। তারপর নানাপ্রকার অভিযান-মূলক কাহিনী এবং অভিযান-ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এইপ্রকার জাতিগত জীবনে যে যে ভাবের ছাপ পড়েছে, শিশুর ব্যক্তিগত জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে শিক্ষার প্ররোচনা বা উদ্দীপনা হিসাবে তাতে সবচেয়ে বেশী ফল পাবার সম্ভাবনা। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবন যেন আগাগোড়া সমন্তরালভাবেই চলে এসেছে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্য এই মতের চমৎকারিত্ব আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে এর মধ্যে অনেক ত্রুটিও দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথমতঃ, আদিম মানুষের যৌন আবেগ বিপুল কিন্তু শিশুদের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। সভ্য মানুষ অপেক্ষা আদিম মানুষের শারীরিক শক্তি ছিল অনেক বেশী। মানুষ যত সভ্যস্তরে এগিয়ে এসেছে ততই তার শারীরিক শক্তি কমেছে। কিন্তু শিশুদের বেলায় দেখা যায় এর বিপরীত।

আসল কথা হল, পুনরাবৃত্তির মতবাদে বংশগতির উপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশের উপর তা দেওয়া হয়নি, অনুমান করা হয়েছে অতীত জীবন ধারার প্রভাবটি বংশগতির মাধ্যমে একেবারে স্থিরনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয় শিশুর জীবনে। পরিবেশ তার বিশেষ কোন পরিবর্তনই করতে পারে না।

প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে জাতিগত জীবনের ছাপটি একেবারে

দৃঢ়ভাবে পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে বংশগতির মাধ্যমে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করলে পুনরাবৃত্তির বাঁধা পথটা আর ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু সত্যই কি পরিবেশের প্রভাব এতই নগণ্য?

'বংশগতি ও পরিবেশ' আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি বংশগতি জাতকের উন্নয়নের একটা সীমা নির্দেশ করে দেয় বটে কিন্তু সেই সীমার মধ্যে কে কতটা বাড়বে সেটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশগতি যে মানসিক সামর্থ্যের সীমা বেঁধে দেয় তার কতটুকু কাজ লাগবে বা না লাগবে সেটা ত নির্ভর করবে পরিবেশের উপর। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে আমরা বলতে পারি গুহাবাসী আদিম মানুষের উপর বিচিত্র পরিবেশের প্রভাব পড়ে তাকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে এসেছে সভ্য মানুষের দিকে। নবজাত শিশুর উপরও পরিবেশের প্রভাব পড়ে তাকে উন্নতির পথে নিয়ে চলে। কিন্তু দুই পরিবেশ ত এক নয়, তাদের প্রভাবও নিশ্চয়ই এক ধরনের হবে না। তাহলে বন্য মানুষের জীবনধারা ও সভ্য শিশুর জীবনধারা একই সমান্তরালভাবে এগিয়ে যাবে কিসের প্রেরণায়? কি সেখানে সাধারণ উদ্দীপক?

সুতরাং এই পুনরাবৃত্তি মতটার কিছু অংশ সত্য এবং বাকীটা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের জীবনে অনেকখানি পূর্বপুরুষদের ছাপ রয়ে গিয়েছে। জৈবজীবনেও পূর্বতন জীবকুলের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে সেই জীবন অতীত জীবনের অন্ধ অনুবৃত্তি মাত্র নয়। পরিবেশের প্রভাবে তার পথ পরিবর্তনীয়।

সুতরাং রেন ও জিলার এই পুনরাবৃত্তিবাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে কৃষ্টি-বিবর্তনবাদ রচনা করেছিলেন সেটাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে বাধা আছে। শিশুশিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনায় জাতিগত প্রগতির ধারাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বরং নীতি হিসাবে কয়েকটা মৌলিক নির্দেশ গ্রহণ করতে পারি। বন্য মানুষের অবস্থা থেকে সভ্য মানুষের অবস্থায় উপনীত হবার মূল কথা হল, সরলতা থেকে জটিলতা (from simple to complex)—কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি মানসিক ক্ষেত্রে। তাই শিশুশিক্ষার নীতি হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি কয়েকটি নির্দেশনা—সরল থেকে জটিল (from simple to complex), বাস্তব থেকে কাল্পনিক (from real to imagi-

nary), বিশেষ থেকে সাধারণ (from particular to general), তথ্য থেকে তত্ত্ব (from concrete to abstract)।

শিশুশিক্ষায় এই মূল নীতিগুলির মধ্যেই কৃষ্টি-বিবর্তবাদের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু রয়েছে তাকে আজ সত্য বলে সকল শিক্ষাবিদই মেনে নিয়েছেন।

জীবনায়ন

(Stages of Development)

জীবনের পথ-পরিক্রমা ঃ

মানব শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকে বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা অর্জন করতে করতে জীবনের পথে এগিয়ে চলে, তারপর মৃত্যুর দ্বার দিয়ে একদিন অকস্মাৎ এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই জীবনায়নের পথে মানুষ একান্ত অসহায় শিশু অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রমশ পূর্ণ পরিণত মানুষের অবস্থায় এসে উপনীত হয়, মানসিক ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে।

শিশুর পাঠক্রম নির্ধারণ করতে গেলে তার এই শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়সে তার মানসিক গঠন বিভিন্ন প্রকার, শক্তি সামর্থ্য ও রুচি বিচিত্রতর।—শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার স্তরবিন্যাস শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার ক্রমপরিণত স্তর অনুসারেই গঠিত হয়।

জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মানবের এই জীবৎকালকে রুশো চারিটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল (infancy); পাঁচ থেকে বার বৎসর পর্যন্ত বাল্য (childhood); বার থেকে পনের পর্যন্ত বয়ঃসন্ধি বা প্রাক্ কৈশোর (early adolescence) এবং পনের থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত কৈশোরোত্তর (late adolescence) কাল।

প্রত্যেকটি অংশের জন্য তিনি স্বতন্ত্র পাঠপদ্ধতির কথাও বলে গিয়েছেন। পরবর্তী কালে অবশ্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানবিদগণ বিভিন্নভাবে মানবজীবনের স্তর ভাগ করবার চেষ্টা করেছেন। ডঃ আর্নেষ্ট জোনসএর মতে মানবজীবন চারিটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত, যথা—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তর, শৈশব (infancy), তারপর দ্বিতীয় স্তর বাল্যকাল (childhood) দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্যন্ত, তৃতীয় স্তর কৈশোর (adolescence) অষ্টাদশবর্ষ পর্যন্ত এবং শেষ স্তর পূর্ণ-বয়স্ককাল (adult) অষ্টাদশবর্ষ বয়স থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ডঃ জোনস্ ছাড়া আরো অনেকে নানাভাবে এই স্তরভাগ করবার পরিকল্পনা করেছেন; তবে ডঃ জোনসের স্তরবিন্যাসই মোটামুটিভাবে আমরা গ্রহণ

করতে পারি। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানবের এই জীবৎকাল চারটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত—**শৈশব** (infancy), **বাল্য** (childhood), **কৈশোর** (adolescence) এবং **পূর্ণবয়স্ক** (adult)। এই চারিটি অংশের মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়েই শিক্ষা-বিজ্ঞানের কাজ, কারণ মানুষ পূর্ণবয়স লাভ করার প্রাক্কাল পর্যন্ত শিক্ষালয়ের প্রত্যক্ষ-প্রভাবাধীন থাকে।

সুতরাং এই কয়টি অংশের মানসিক পরিণতির বৈশিষ্ট্য ও তজ্জনিত পাঠক্রম ও পঠনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এইখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

শৈশব (infancy) :

মাতৃগর্ভের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ থেকে শিশু পৃথিবীর এই শব্দবর্ণগন্ধময় বিপুল সমারোহের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বিচিত্র উত্তেজনা শিশু-চিত্তকে নিরন্তর আঘাত করতে থাকে। এই আঘাতের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া তখনও শিশু শেখেনি। কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের অঙ্গ সঞ্চালনের কৌশলটি শিশু ক্রমশ আয়ত্তে এনেছে—এছাড়া আর কোন অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর জানা নেই। জন্মের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শের প্রাথমিক অনুভূতিগুলি শিশুর আয়ত্তে আসে, তারপর আসে দেখা শোনা এবং পেশী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রভৃতি উচ্চতর অনুভূতি। এই সময়ে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর, তারপর বেশ কিছুকাল বাদে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ক্রমশ শিশু লক্ষ্য করে একটি বিশেষ ব্যক্তি তাকে আদর করে, খেতে দেয়, একটি বিশেষ ধরনের রঙিন খেলনা তার হাতের কাছে দেখতে পায়, দোলনা বা কোলের মৃদু দোলানি তাকে আরাম দেয়, ঘুম পাড়ানিয়া গানের একটানা সুর তাকে আনন্দ দেয়। ক্ষুধার অস্বস্তি, পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গের দংশন-জ্বালা, হঠাৎ আঘাত লাগার বেদনা—তাকে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এমনিভাবে শিশুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমশ ভরে উঠতে থাকে ; দু'একটা করে অভ্যাস আয়ত্তে আসে। নূতন নূতন জিনিস শিক্ষা করে শিশু—শেখাটা চলে অবশ্য 'চেষ্টাভ্রান্তির নীতি', (trial and error method) অনুসরণ করে।

এইভাবে একান্ত **নিকটতম পরিবেশ** থেকে শুরু হয় শিক্ষার কাজ। জড়

ও জীবের পার্থক্য তখনও সে বুঝতে শেখেনি, একটা বেড়ালের বাচ্চা আর একটা কাঠের পুতুল দুটোই তার কাছে সমপর্যায়ের। মা ও ধাত্রীর পার্থক্য তার কাছে বড় নয়। পার্থক্য শুধু আনন্দ ও বেদনা ঘটিত বিভিন্ন অনুভূতির।

ভাললাগা মন্দলাগার (pleasure & pain principle) **মাপকাঠি** দিয়েই শিশু তার অজানা জগৎকে বিচার করছে।

এই অবস্থায় মানব শিশুর সঙ্গে ইতর প্রাণীর বড় বেশী পার্থক্য নেই, কারণ উভয়েই তখন একমাত্র **সহজাত প্রবৃত্তির** (instinct) তাড়নায় চলে। ইতর প্রাণী সাধারণতঃ এই স্তরেই থেকে যায়, আর মানবশিশু ক্রমশ তাব সহজাত প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরিয়ে তাকে জয় করতে শেখে।

তিন-চার বৎসর বয়স থেকেই শিশুমনে একটা আত্মপর বোধ জগতে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে চেতন শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। আত্মপব বোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু একান্তভাবে হয়ে পড়ে **আত্মকেন্দ্রিক**। জগতের সবকিছু যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘটছে। সে চায় সবাই তাকে আদর করুক, সকলের মনোযোগ তার দিকেই কেন্দ্রীভূত হ'ক, সকলেই তার হুকুম পালন করুক। এককথায় মানবশিশু একান্ত স্বার্থপর। সে একটি ক্ষুদে ডিক্টেটর, বাপমায়ের ভালবাসার উপরেও সে একাধিপত্য অধিকার চায়। তাই ভাই বোনেদের উপরে তার হিংসা, মাতৃস্নেহের ভাগীদার বলে।

এই আত্মকেন্দ্রিকতার চরম পরিণতি **আত্মপ্রেম** বা **আত্মরতি** (auto erotic)। শিশু আপনার প্রেমে আপনি মুগ্ধ, নিজেকেই সে সবচেয়ে ভালবাসে। এই প্রবৃত্তির নাম দেওয়া হয়েছে নার্শিসিজম (Narcissism)। গ্রীক পুরাণের আত্মপ্রেমমুগ্ধ নার্শিসাসের কাহিনী থেকেই এই আত্মরতিজাত প্রবৃত্তিটির নামকরণ।

শিশুপ্রকৃতি এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে **অন্তর্মুখী** (introvert)। বাইরের লোকের সঙ্গে বড় বেশী মেলামেশা সে করতে চায় না। শিশুমনের এই অন্তর্মুখীনতার কারণ সম্ভবতঃ দুইটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির যুগপৎ তাড়না। আগেই বলেছি শিশু হল ক্ষুদে ডিক্টেটর, তার ক্ষুদ্রজগৎত সব কিছুই যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘটে এই হল তার ইচ্ছা। সবকিছুর মধ্যেই সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়, প্রবৃত্তির মধ্যে **আত্মপ্রসারেচ্ছা** (Self assertion) হয় প্রবল। কিন্তু বাইরের রূঢ় বাস্তবজগতে তা ত সম্ভব হয় না, প্রতিপদেই তার এই আত্মপ্রসারেচ্ছা বাধা পায়। জেগে ওঠে বিপরীত প্রবৃত্তি **আত্মবিলোপ**

(Self abasement)। তাই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে শিশু বাস্তব জগত থেকে সরে কল্পনার জগতে গিয়ে প্রবেশ করে, কারণ সেইখানে সে ইচ্ছামত আত্মপ্রসারের সুযোগ পায়। কল্পনার জগতের মাঝখানে বিরাজ করে শিশু স্বয়ং। ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে মাকে উদ্ধার করে, কখন-বা রামের মত বনবাসে যায়, সঙ্গে যায় তার মা, কখনও হয় বিড়ালছানার কানাই মাষ্টার, কখনও বা গলির মোড়ের ফেরিওয়ালা। মেয়েরা খেলাপাতি ঘরকন্নার ধুলোমাটির ভাত তরকারি রাঁধে, পুতুলের বিয়ে দেয়; বাস্তব জগতের অনুকরণ করে কল্পনার জগতে। এই জাতীয় খেলার নাম দেওয়া হয়েছে **কল্পনা-বিলাসের খেলা** (make-believe play)। রবীন্দ্রনাথের শিশুকালের এই মনোভাবটি সুন্দরভাবে তিনি লিখেছেন তাঁর ছেলেবেলার গ্রন্থে "—একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে 'আমার অচল' পাল্কি। হাওয়ার তৈরী বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলেছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখন বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করতে, ছম্ ছম্।...তারপর একসময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্; ঢেউ উঠতে থাকে ফুলে ফুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, 'সামাল, সামাল, ঝড় উঠল—' "

এই বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য **পুনরাবৃত্তি** বা জানা পথে (routine and repetition tendency) চলবার প্রবৃত্তি। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা নূতন বন্ধু করতে চায় না, নূতন খেলা খেলতে চায় না, পুরানো গান পুরানো ছড়া পুরানো সুর বারবার পুনরাবৃত্তি করতেই বেশী আনন্দ পায়। নূতনের অভিযান অপেক্ষা পুরানোর পুনরাবৃত্তির ইচ্ছাটি শিশুমনে অন্তর্মুখীতা থেকেই উদ্ভূত হয়। নূতনের অভিযানে নূতন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন করে চলতে হয়। শিশু-মন তখনও তার জন্য তৈরি হয়নি।

অনুকরণ প্রবৃত্তি এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে শিশুর ব্যবহারে। খেলাধূলা চলাফেরা সবকিছুর মধ্যে দিয়েই শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে চলতে চায়। মেয়েদের ঘরকন্না করা বা ছেলেদের মাষ্টার হয়ে রেলিং-ছাত্রকে পড়ান— এসবই হল বড়দের আচরণের অনুকরণ।

আর একটি বড় প্রবৃত্তি এই সময়ে দেখা দেয়—সেটি **অদম্য কৌতূহল**। বাবা হয়ত একটা বড় কলের পুতুল কিনে এনে ছেলেকে দিলেন। ছেলে সেটা কোথায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে—তা নয়; কিছুক্ষণ পরেই হয়ত দেখা গেল পুতুলটি সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। ছেলের ছেলেমিতে নিশ্চয়ই বাবার রাগ হবে। কারণ আমরা ভুলে যাই যে শিশুমনের সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তি হল কৌতূহল। তার জন্যেই শিশু সবকিছু নিজে হাতে করতে চায়, ভাঙ্গতে চায়, আবার ভেঙ্গে গড়তে চায়, জানতে চায় প্রত্যেকটি 'কি কোথায় কেন'র জবাব।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই কৌতূহল-প্রবৃত্তিই হল শিক্ষকের প্রধান সম্পদ। কৌতূহল-নিবৃত্তির প্রসঙ্গেই নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিশু। অনেক সময় হয়ত অহেতুক কৌতূহলের প্রশ্নবন্যায় পিতামাতা অভিভাবক-শিক্ষক উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। তবু একে কখনও জোর করে চেপে দেবার চেষ্টা করতে নেই। যতদূর সম্ভব ধীরভাবে শিশুমনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের এই শৈশবকালই হচ্ছে শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাল, এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিনিচয় নমনীয় ও পরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে, সহজাত, প্রবৃত্তিগুলির সহজেই ইচ্ছানুসারে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাই সুঅভ্যাস গঠন করা এই সময়ে যত সহজে সম্ভব এমন আর কোন কালেই নয়। এই সময়েই হল শিশুর সর্বাঙ্গীন গঠন কাল। চরিত্রবান সুনাগরিক হিসাবে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে এই সময়ের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

এই বয়সে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের (Abstract knowledge) কোন মূল্য নেই। যে কোন ঘটনাই হোক শিশু তাকে তার **নিজের অভিজ্ঞতার স্তরে** এনে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। ইতিহাসের গল্পে যত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী শিশু শুনুক, তার নিজের তৈরি প্যাকাটির তীরধনুক নিয়ে খেলাপাতির শিকার-কাহিনী তার কাছে ঢের বেশী উত্তেজনাকর।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—জগতের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশুর যোগাযোগ সবে শুরু হয়েছে। তাই নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বেলায় যত **অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার** করা যায় অভিজ্ঞতাটি ততই শিশুর আয়ত্তে আসে। এই বয়সের শিক্ষাপদ্ধতিতে এই তথ্যটি বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

এই বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য **কর্মকেন্দ্রিকতা**। সবকিছু সে নিজের হাতে গড়তে চায়, সে স্রষ্টা। সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে দিয়ে তার আত্মপ্রসার ঘটে। বড়রা অনেক সময়ে শিশুদের অপটু হাতের কাজে সাহায্য করে কাজটাকে সুন্দর করতে গিয়ে শিশুদের বিরক্তিভাজন হয়। আমরা শিশুদেব ভুল বুঝি—কাজটা সেখানে বড় নয়, করাটাই বড়।

শিশুশিক্ষার গোড়ার দিকটা তাই গ্রন্থাশ্রয়ী না করে কর্মাশ্রয়ী করা প্রয়োজন। ফ্রয়েবল্ ও মাদাম মন্তেস্বরী উভয়েই শিশুশিক্ষাকে কর্মাশ্রয়ী করবার পরিকল্পনা করেছেন। ফ্রয়েবলের শিক্ষার উপকরণ Gifts & Occupations এবং মাদাম মন্তেস্ববীর Didactic apparatus এই উদ্দেশ্য নিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিশুশিক্ষার জগতে যুগান্তর এনেছে।

বাল্যকাল (Childhood)

পাঁচের পর থেকে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণতঃ বাল্যকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই সীমারেখার কিছু অদলবদল হতে পারে।

শৈশবকাল যদি ভালভাবে সুনিয়মাধীনে অতিবাহিত হয় তবে বাল্যকালের সকল সমস্যারই স্বাভাবিক সমাধান হয়ে থাকে।

শিশুকালে যে কৌতূহল-প্রবৃত্তির উন্মেষ, বাল্যকালে তা পূর্ণ বিকশিত। বৈচিত্র্যময় জগতের সব কিছু দেখেই সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সব কিছুর কারণ জানতে তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তাই এই সময়ে কৌতূহল-নিবৃত্তির প্রচেষ্টাই হল শিক্ষার মূলকথা—

এই স্তরে আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে—সেটি হল **যুথবদ্ধতা** (Gregariousness)। আত্মকেন্দ্রিক শিশু এইবার সংঘচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা একলা থাকতে ভালবাসে না, সব সময়ে সমবয়স্কদের সঙ্গে মিলেমিশে বেড়াতে চায়, ক্লাব সমিতি দল সংঘ ইত্যাদি গড়তে চায়।—শুধু তাই নয়, সংঘ-সমিতির প্রভাবও বালকের উপর পড়ে অপরিসীমভাবে। পিতামাতা অভিভাবকদের প্রভাব অপেক্ষা দলের প্রভাব তার উপর বেশী। অন্তর্মুখী শিশু এবার বহির্মুখী বালকে রূপান্তরিত হয়। সব সময়েই সে নিজেকে দলের একজন বিশ্বস্ত সভ্য হিসাবে জাহির করতে চায় এবং দলের লোকেদের কাছে বাহাদুরি দেখাবার লোভও হয়ে উঠে

দুর্দমনীয়। এ সময়ে সঙ্গীদের নির্দেশ তার কাছে বেদবাক্য। পিতামাতা গুরুজনদের আদেশ অবহেলা করেও তারা সঙ্গীদের কথা মেনে চলতে চায়।

এটা অবশ্য আত্মবিস্তার (self assertion) প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শৈশবের আত্মপ্রচার ও আত্মবিলোপের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে এই বয়সে আত্মপ্রচার-প্রবৃত্তিই বড় হয়ে ওঠে। আত্মপ্রচার ত একা থাকলে হয় না, সেজন্য অনুরাগী দল চাই। পাঁচজনের সামনে কৃতিত্ব দেখতে না পারলে ত বাহাদুরি হয় না, তাই ছেলেরা এসময়ে দলগতপ্রাণ হয়ে পড়ে।

এই বয়সে শিক্ষার পদ্ধতিতেও সংঘপ্রিয়তার সুযোগ নিলে ভাল হয়। খেলাধুলা, ব্যায়াম শিক্ষাভ্রমণ (Excursion), বিতর্ক সভা, অভিনয় প্রভৃতি এই বয়সের শিক্ষার আনুসঙ্গিক (Co-curriculum) হিসাবে খুবই উপকারী। শিক্ষাপদ্ধতিতেও প্রজেক্ট-পদ্ধতি (Project method) এই সময়ের উপযোগী।

সংঘপ্রিয়তা থেকেই বালকের মনে সূচিত হয় গণমনের (Group mind) লীলা। বালক যখন একা থাকে বা বাড়ীতে পিতামাতার কর্তৃত্বাধীনে থাকে তখন যে কাজ করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, দলে পড়ে সেই কাজ সে একান্ত অবহেলায় করে ফেলে। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে দলবেঁধে কোন কিছু করবার দিকে তার ঝোঁকটা হয় বেশী। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাই ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে বালক শেষে আদর্শ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

শিশুকালে যেমন সে তার নিজের ভাললাগা মন্দলাগার মাপকাঠিতে জগতের সবকিছুর মূল্য নির্ণয় করত, বালককালে তেমনি দলের নিন্দাস্তুতির মাপকাঠিতেই সে বিচার করে দেখতে শুরু করে।

সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না ক্রমশঃ কমে আসে, অর্থাৎ পূর্বের মত আর নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। ধীরে ধীরে সেগুলির উদ্বর্তন শুরু হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বালক ক্রমশই সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হতে শিখেছে।

কৈশোর (Adolescence)

মানুষের জীবনকে যে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হল তার মধ্যে এই কৈশোরকালটাই হল সবচেয়ে জটিল ও সমস্যামূলক। বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী এই সময়টা ঠিক কোন বয়সে আবির্ভূত হয় এবং কতদিন থাকে

সেবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই কৈশোরকালের আবির্ভাব-তিরোভাবের সময়ের অনেক বিভিন্নতা ঘটে থাকে। তবে সাধারণতঃ বারোর পর থেকে আঠার পর্যন্ত কৈশোরকাল বলে ধরা যেতে পারে। অনেকে আবার এই কালটিকে দুটো উপবিভাগে ভাগ করেন—প্রাককৈশোর (early adolescence) ১২-১৮ বৎসর, এবং কৈশোরোত্তর (late adolescence) ১৮-২৫ বৎসর কাল। অর্থাৎ প্রকৃত কৈশোরকালেব উভয় দিকের কয়েকটা বছর জুড়ে কৈশোরোচিত ভাব দেখা যায়।

যাই হোক, কৈশোরকালের শারীরিক ও মানসিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে বহু মনোবিজ্ঞানবিদ বহুভাবে গবেষণা করেছেন। ষ্ট্যানলি হল ত এই সময়টাকে ঝড়-ঝঞ্ঝার (Storm & Stress) কাল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ বা এ'কে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের কাল (Strain and Strife) বলেছেন। বালক এতকাল যে পথে চলে আসছিল অকস্মাৎ তার মোড় ফিরল পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিকে।

এক ধরনের মানসিক গতি-প্রকৃতি চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলছিল বালক, অকস্মাৎ যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। অপরিণত বাল্যজীবন ও পরিণত যুবকজীবন, এই দুয়ের মধ্যে যেন জোড় মেলান হয় এই সময়টাতে। তাই এ'সময়ের মনস্তত্ত্ব জটিল, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সমস্যামূলক, চিন্তাভাবনার গতি দুর্জ্ঞেয়। দেহমনের দুইকূল ছাপিয়ে যৌবনজলতরঙ্গ অকস্মাৎ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যে জীবন-তরণীর হাল ঠিক রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ নাবিকের হাতে নৌকোর হাল থাকলে জোয়ারের টানে যাত্রা সুগম হয়, কিশোরের নবজীবন সফলতাব স্বর্ণ উপকূলে সহজেই এসে উপনীত হতে পারে।

তাই হ্যাডো কমিটির রিপোর্টে প্রথমেই কিশোর বয়সের এই সম্ভাবনাকে এত বড় করে বলা হয়েছে—বার-তের বছর বয়স থেকেই কিশোরদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এরই নাম কিশোরকাল। এই জোয়ারের মুখে স্রোতের অনুকূলে যদি নবজীবনের যাত্রা শুরু করা যায় তাহলেই সৌভাগ্যের কূলে গিয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। ["There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of eleven or twelve, it is called by the name of adolescence.

If that tide can be taken at the flood, and a new voyage begun in the strength and along the flow of its current, we think that it will move on to fortune."—The Hadow Committee's report on "The education af the adolescence."]

যাই হোক এই বয়ঃসন্ধিকালে দেহমনের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে বালক অনেক সময় তাল রেখে চলতে পারে না। কার সঙ্গে কিভাবে কতটুকু মেলামেশা করতে হবে, কখন কি আচরণ করতে হবে, কিশোর-কিশোরীরা অকস্মাৎ তার কোন কোন দিশা পায় না।

'ছুটি'-গল্পের নায়ক ফটিকের বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বয়সী ছেলেদের দুর্দৈবের কথা সুন্দরভাবে লিখেছেন "—তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলেব মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আব নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে, লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশবের এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ কবা যায়, কিন্তু সেই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে-মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোন-এক শ্রেষ্ঠ

স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয—"

আগেই বলেছি—বয়ঃসন্ধিকালে দেহ ও মন উভয় স্তরেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। অতঃপর স্তরগুলিব আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে কবা যেতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক **দৈহিক পরিবর্তনের কথা**—

অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ডের মতে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তনটা অন্ততঃ দু'বছর পূর্বেই শুরু হয়ে যায়। ওজন আর উচ্চতার দিক দিয়েও মেয়েরা এই সময়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। [As the pre-pubertal acceleration of growth takes place some two years earlier in girls than in the boys, adolescence witnesses the phenomenon of a feminine superiority with regard both to height and weight.—Sandiford]

এই সময়ে ছেলেমেয়েরা অকস্মাৎ অনেকখানি লম্বা হয়ে পড়ে। দ্রুত অস্থিবৃদ্ধির ফলে হাত পা-গুলো হয় বেতর লম্বা, আকৃতি হয়ে যায় রোগা ঢেঙ্গা। পেশীতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়, অস্থি হয় ক্রমশ পুষ্ট, ফুসফুসের আয়তন বাড়ে, শক্তিশালী হয়। শ্বসনতন্ত্র, রক্তসংবাহনতন্ত্র, পাচনতন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি তন্ত্রের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই এই সময়ে তাদের প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যেব গুণগত ও পরিমাণগত মান ঠিক না বাখলে পরবর্তী জীবনে অপুষ্টি ঘটিত ও ক্ষয়জনিত নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই সময় থেকেই কিশোরকিশোরীদের যৌনজীবনের প্রত্যক্ষ স্ফুরণ ঘটে। কিশোর দেহে গুম্ফ শ্মশ্রুর আবির্ভাব হয়, কিশোরীদের মাসে মাসে ঋতুমতী হবার নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, স্তনোদ্গম শুরু হয়। বালকদের কণ্ঠস্বর এ সময়ে হঠাৎ বিকৃত হয়ে পড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়। শিশুকালের কোমল কণ্ঠস্বর যৌবনকালের পুরুষ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করবার জন্যে স্বরযন্ত্রে ভাঙ্গাগড়া চলে এ'সময়ে। সেইজন্য গলার স্বর সাময়িকভাবে বিকৃত হয়ে যায়।

অতঃপর মানসিক পরিবর্তনের কথা—

এইভাবে দেহের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করা গেল, মনের ক্ষেত্রে তা আরো বৈপ্লবিক। সবচেয়ে বড় কথা **যৌনচেতনার অরুণোদয়** এই সময়ে মনের দিগন্তকে রঙীন করে তোলে। বিপরীতলিঙ্গের প্রতি একটা অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলরহস্যের প্রতিও একটা অনুসন্ধিৎসা জাগে মনে। কিন্তু তাদের মনের এই গোপন যৌনজিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর পায় না সমাজে। সর্বত্র একটা চাপা চাপা লুকোছাপা ভাব, তাই অনেক ক্ষেত্রেই তারা একটা কাল্পনিক উত্তর মনগড়াভাবে তৈরী করে নেয়; কখনও বা বদছেলেদের সংস্পর্শে এসে মিথ্যা অসামাজিক পথে পা বাড়ায়।

এই সময়ে অভিভাবকদেব অত্যন্ত সতর্ক ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা দরকার। অজ্ঞাত একটা নূতন অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্তে এসে একান্ত ভীত-বিহ্বল চিত্তে সকলের কাছে সে চায় একটু স্নেহ-ভালবাসা সহানুভূতি। এরই অভাবে অনেক ছেলে সারাজীবনেব মত নষ্ট হয়ে যায়। বদছেলেদেব পাল্লায় পড়ে একেবারে সমাজবিরোধী চরিত্রহীন গুণ্ডাশ্রেণীর (Juvenile delinquent) দলভুক্ত হইয়া পড়ে।

কিশোর-কিশোরীরা এ'সময়ে আবার শিশুদেব মত **অন্তর্মুখী** হয়ে পড়ে। বাল্যের দল বা সংঘের কর্মমুখর প্রভাব ক্রমশ ঘুচে গিয়ে বালক আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ে। নানারকম আজগুবী পরিকল্পনা তাদের মাথায় সব সময়েই আলোড়িত হয়ে থাকে মনোবিজ্ঞানীদের মতে কিশোরকালকে তাই দ্বিতীয় শিশুকাল (Second childhood) বলে মনে করা হয়ে থাকে। কৈশোরকাল যেন শৈশবের পুনরাবৃত্তি।

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের কখনও কর্মহীন অবস্থায় একমুহূর্ত বসে থাকতে দিতে নেই। সব সময়েই কোন না কোন মানসিক বা শারীরিক শ্রমের কাজে তাদের নিযুক্ত রাখতে হয়। অনেকে মনে করেন 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' প্রবাদটি এই বয়সের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিশোরবয়সে কর্মহীন অলস মুহূর্তগুলি অস্ফুট যৌনকামনার রঙ্গীন নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে সন্দেহ করে অনেক কিশোরকে সবসময়েই কর্মব্যস্ত রাখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অবসর বিনোদন মাত্রই যে কিশোর বয়সে সর্বনাশ ঘটিয়ে দেবে এমন কথা মনে করবার কোন

কারণ নেই। বরং নানারকম নির্দোষ খেলাধূলা, বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities), ছবি-আঁকা, গানগাওয়া, বাগানকরা, অভিনয়-করা ইত্যাদি আনন্দবর্ধক কাজের মধ্যে কিশোর মনকে নিযুক্ত রাখলে ফল ভালই হয়। শিক্ষকের বা অভিভাবকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সকল লেখাধূলায় বালকেরা অংশ গ্রহণ করবে, এবং সেইসঙ্গে যুথবদ্ধতা, সংগঠনী, যোধন, আত্মপ্রচার, সঞ্চয়, কৌতূহল প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সার্থক উদ্‌বর্তন ঘটতে পারবে।

এই সময়ে বালকের স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় কারণ এইটেই হল দেহগঠনের কাল। বিশেষতঃ স্নান আহার শয়ন নিদ্রা পবিমিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া দরকার।

[Close attention must be paid to see that the scholars obtain a sufficient quantity of sleep on suitable bedding, live in fresh air, bathe frequently and wear loose hygenic clothing.—Sandiford]

দেহ ও মনের এই অগাম্য অবস্থায় বালককে অত্যন্ত কড়া নজরে রাখার উপদেশ দিয়েছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে দিয়ে বালককে মানুষ করে তুলতে হয়। পান ভোজন শয়ন ভ্রমণ বা পোষাক-পরিচ্ছদ কোন বিষয়েই যেন কিছুমাত্র আরামপ্রিয়তা বা বিলাসিতার ছোঁয়াচ না লাগে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুগৃহে অবস্থানকারী শিষ্যদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। জন লক ত এই বয়সের বালকদের চরম কষ্টকর জীবন যাপনের কথা বলেছেন। কোন রকম মুখরোচক মসলাযুক্ত সুখাদ্য গ্রহণেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। ষ্ট্যানলি হলও কিশোর-কিশোরীদের জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

[The Sparatan boys, at twelve, slept on straw on hay with no cover and at fifteen slept on reeds. The boy in general and specially the head hands and neck, should not be too warmly dressed in cold weather. Beds should be rather hard and covering should be light. Too soft beds predispose people to sensuous luxury and tempt them to remain

in them long after a wakening. The is just the hour most dangerous of all—Stanley Hall]

আগেই বলেছি কিশোরকাল হচ্ছে **শৈশবকালের পুনরাবৃত্তি**। সুতরাং এ সময়েও ছেলেমেয়েরা আবার আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। নিজের বেশভূষা পরন পরিচ্ছদের দিকে নূতন করে দৃষ্টি পড়ে। ভাল করে চুল ছাঁটা, স্নো পাউডার সাবান মাখা, নূতন ফ্যাসানেব জামা জুতা পবা এই সবদিকে কিশোর-কিশোরীরা অবহিত হয়ে ওঠে। মোটকথা নিজেকে বেশ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঁচ জনের সমানে প্রকাশ কববার ইচ্ছা জাগে এই সময়ে !

এই সময়ে মনের একটি বড় ধর্ম হল **বীরপূজা**। কিশোর-কিশোরীরা মনে মনে একটা আদর্শ বেছে নেয় এবং সেই আদর্শ অনুসারে চলতে চায়। এই আদর্শ কারো হয় দেশনেতা, কারো ধর্মনেতা, কারো কোন প্রিয় খেলোয়াড়, কারো বা কোনো ফিল্ম ষ্টার। আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে কেউ বা ধর্মমূলক বা সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবন অতিবাহিত করবাব সংকল্প গ্রহণ করে। কেউ বা প্রিয় খেলোয়াড় বা ফিল্ম-ষ্টারের হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করে চলতে চায়। কখনও বা প্রিয় শিক্ষকের চলাবলা এমন কি হাতের লেখাটি পর্যন্ত অনুকরণ করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়। এই সময়ে যে সব ছেলেমেয়ে সত্যকাব বড় আদর্শের সন্ধান পেয়ে যায় জীবনে, তাদেরি জীবন হয় সার্থক, আর যে দুর্ভাগা তা পায় না তারা সমাজ-বিরোধী দুষ্ট প্রকৃতি লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উৎসন্ন যায়।

নীতিবোধ ও ধর্মবোধ স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে মনকে প্রভাবিত কবে। এটাও অবশ্য বীর-পূজারই নামান্তর। তার ফলে এই সময়ে কোন কোন ছেলে উৎকট ধর্মবায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়ে। নানাপ্রকার ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মালোচনা ইত্যাদিতে মসগুল থাকে। কিন্তু এই ধর্মীয় ভাবাবেগ আবার ভাটার টানে সরে যায়, তখন হয়ত দেখা দেয় প্রবল নাস্তিকতা।

মোটকথা, দুই বিপরীতমুখী টানে মনের আবেগ দুই দিকেই সমান জোরে হেলে পড়তে পারে। কিশোর মন সব সময়েই বাস্তবরাজ্যকে অস্বীকার করে পলায়ন করতে চায় কল্পনার রাজ্যে। এই জাতীয় পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই সম্ভবতঃ নাস্তিকতার উদ্ভব।

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য মহৎ প্রেরণাও এই সময়ে কিশোরপ্রাণে স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হয়। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ, মহতের সেবায়

জীবন উৎসর্গ করবার ব্যাকুলতা কিশোর-কিশোরীদের মনে দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই।

এই ভাবাবেগ-প্রধান আদর্শনিষ্ঠ অন্তর্মুখী কিশোর-মনের পরিচর্যা করা যে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল কাজ তা সহজেই অনুমেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালও এই কৈশোরকাল। সুতরাং সার্থক শিক্ষক কিশোর-মনের গতি-প্রকৃতি বুঝে সেই অনুসারে সহানুভূতি ও ভালবাসা সহকারে শিক্ষাব ব্যবস্থা করে দেবেন, অস্ফুট কলিকাগুলি পূর্ণবিকাশিত পুষ্পে পরিণত করে নেবেন।

শিক্ষক

(The teacher)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান

শিক্ষা-প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত—শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষনীয় বিষয়। আগেই বলেছি—এই তিনটির মধ্যে এককালে শিক্ষকেরই ছিল একাধিপত্য। তারপর শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর প্রতাপ।—এ'দুটোর চাপে শিক্ষার্থীর পাত্তাই পাওয়া যেত না। বাইরের বিশাল বিশ্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই ছিল না। জগতকে সে দেখত শিক্ষকের কোলে চড়ে পুঁথির লেখা জানালার মধ্যে দিয়ে! জগতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষক তাঁর মনোমত বিষয়গুলি আহরণ করে তা'থেকে মানসিক রসায়ন প্রস্তুত করতেন—তারপর চামচে করে সেই রসায়ন শিশুর গলায় ঢেলে দিতেন তিনি ভবিষ্যতের জ্ঞানী মানুষ তৈরী করবার টনিক হিসাবে।

শ্রেণীকক্ষে ঢুকলেই দেখা যেত উঁচু একটা মঞ্চের উপরে টেবিল চেয়ারে গম্ভীর মুখে বেত্রপাণি শিক্ষক—ভীতচকিত পাংশু-মুখ ছাত্রের দল! সুতরাং বিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চে শিক্ষকই নায়ক।

আমাদের দেশে যদিও এই অবস্থা আজও অব্যাহত, তবু বলতে হবে যুগ পাল্টেছে। —শুরু হয়েছে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক যুগ। শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্ত মনোযোগ আজ কেন্দ্রীভূত শিক্ষার্থীর দিকে। শিক্ষক ক্রমশ সরে যাচ্ছেন পশ্চাৎ ভূমিতে। সুতরাং মনে হতে পারে যে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান গৌণ, শিক্ষালয়ে শিক্ষক আজ তাঁর গৌরবময় আসনটি ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই শিক্ষার নবমূল্যায়নে শিক্ষকের মূল্য বোধহয় নিম্নাভিমুখী।

বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

কিন্তু তা নয়। বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষকের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়েছে, দায়িত্ব হয়েছে আরো কঠিন। জাতি গঠন কার্যে শিক্ষককে এতকাল করতে হয়েছে শ্রমিকের কাজ।

ঝুড়ি ঝুড়ি মূল্যবান জ্ঞানের ইট কাঠই শুধু বয়ে বয়ে জড়ো করেছে—অল্পই তার কাজে লেগেছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের কাজ হল শিল্পীর কাজ। বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির যুগপৎ ব্যবহারে শিক্ষক আজ প্রত্যেকটি শিশুকে জাতির দৃঢ় বনিয়াদ হিসাবে গড়ে তুলবার ভাব নিয়েছেন। বিচিত্র বিশ্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথে শিশু এতকাল চলত শিক্ষকের কোলে চড়ে, আজ সে একাই চলতে চায়। শিক্ষক তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন সহজ সরল পথটি চিনিয়ে। শিক্ষার রঙ্গমঞ্চের প্রধান ভূমিকায় অভিনেতা আজ শিশু স্বয়ং একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিক্ষক হলেন সেই রঙ্গভূমির সুনিপুণ সজ্জাকর। শিক্ষক এমন কৌশলে পরিবেশ রচনা করবেন শিক্ষনীয় বিষয়ের উপযোগী সমস্ত কিছু উপস্থাপিত এবং সুসজ্জিত করবেন যাতে শিক্ষার্থী সহজেই খুঁজে পায় তার বাঞ্ছনীয় গন্তব্য পথ। একাজ গতানুগতিকভাবে বই-পড়া জ্ঞান দিয়ে করা যায় না, অত্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে নব নব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে তবেই করা সম্ভব হয়। এই জন্যই শিক্ষককে বলা হয় পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণকারী (manipulator of environment)।

শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল শিক্ষককে বলেছেন শিশু বাগানের মালি (gardener of the kindergarten), মাদাম মন্তেস্বরী বলছেন পরিচালিকা (directress)। এই নূতন ভূমিকায় শিক্ষককে অনেক জ্ঞান অভিজ্ঞতা ধৈর্য আয়ত্ত করতে হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষকের কাজ পূর্বের থেকে আরো জটিল, আরো গুরুত্বপূর্ণ, আরো দায়িত্বশীল। অতএব, সমাজের এতবড় সুকঠোর কর্তব্য পালনের ভার যার উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণের অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব—

শিক্ষক-সুলভ গুণগুলির কথা আলোচনা করবার পূর্বে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

শিক্ষকের দায়িত্ব দ্বিমুখী—

ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব—

প্রথম দায়িত্ব শিক্ষকের ব্যক্তিস্বরূপের, অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ঘটিত। এই প্রভাবকেই কয়েকটি বিভিন্ন দিক থেকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমতঃ—শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত পরিবেশের একটা বৃহত্তর অংশ হচ্ছেন শিক্ষক স্বয়ং। মানুষ হিসাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলীর অপরিসীম প্রভাব পড়ে তাঁর ছাত্রের উপর। শিক্ষক হলেন পিতৃকল্প বা পিতার প্রতিনিধি (father substitute)। পুত্রের উপর পিতার প্রভাবের মতই ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব।

দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষক হবেন শ্রেণীকক্ষের গণমনের (group mind) নেতা। অজ্ঞাতসারেই তিনি গণমনের উপর নিজের কল্যাণকারী প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষার্থী-সমাজকে সুপথে পরিচালনা করতে পারবেন। অনুকরণ (imitation), অনুবেদন (sympathy) এবং অনুভাবন (suggestion) মনের ত্রিমুখী বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রের মনে আদর্শের প্রতিরূপটি মুদ্রিত করে দিতে পারবেন।

[The teacher can no more prevent himself from acting on his pupils by suggestion, imitation, sympathy or otherwise than he can make himself invisible as he perambulates the class room—P, Nunn.]

তৃতীয়তঃ—শিক্ষকের জীবনাদর্শের প্রভাবেই সাধারণতঃ ছাত্রের জীবনাদর্শ গঠিত হয়। আগেকার দিনে শ্রেণীকক্ষে জ্ঞানদাতার ভূমিকামাত্র ছিল শিক্ষকের, শিক্ষার নবভাবধারায় ছাত্রের সমগ্র জীবনকেই স্পর্শ করবে শিক্ষকের প্রভাব। বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীব মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিগত প্রভাব ও অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবনকে নূতন করে গড়ে নিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের কাছ হইতেই মানুষ শিখতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।……গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে—"

চতুর্থতঃ—বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাবিতরণের কেন্দ্র নয়। বিদ্যালয় আজ আদর্শ সমাজের প্রতিরূপ হিসাবে গৃহীত। বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ সামাজিক পরিবেশ বচনা করে শিক্ষার্থীকে সামাজিক গুণাবলী অনুশীলনের সুযোগ দিতে হয়। এই দিক থেকেও শিক্ষকের সুসমঞ্জস ব্যক্তিসত্তার প্রভাব বিশেষ

কার্যকরী বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষক সুকৌশলে শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবেন।

পঞ্চমতঃ—বর্তমান শিক্ষা কেবলমাত্র গ্রন্থনিবদ্ধ নয়। পাঠাগার, যাদুঘর, পরীক্ষাশালা, ল্যাবরেটারী, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমেও শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সুতরাং শিক্ষক সেখানে কেবলমাত্র জ্ঞানদাতা গুরু-মশাই না হয়ে উপদেষ্টা বন্ধু হিসাবে জীবনের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে জ্ঞান সঞ্চয় করতে সাহায্য করবেন।

দ্বিমুখী দায়িত্বের অপর দিক হল তাঁর শিক্ষক-সত্তা অর্থাৎ শিক্ষকের পাণ্ডিত্য জ্ঞানের গভীরতা ঘটিত। একেও কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পাবে।

গুরু হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব—

প্রথমতঃ—শিক্ষক যে যে বিষয়ে পাঠদান করবেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান তাঁর অবশ্যই থাকবে। পাঠদান করতে যতটুকু জ্ঞানেব প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান আয়ত্তে না থাকলে পাঠদান কখনই স্বচ্ছন্দ হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যহ পাঠদান করতে যাবাব পূর্বে পাঠ্য-বিষয়গুলি শিক্ষক একবার ভালভাবে আলোচনা কবে নেবেন, তবেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ—মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব বিষয়ে বেড়েই চলেছে। নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব আলোচনা পুরাতন জ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত করছে। সুতরাং শিক্ষককেও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় রাখতে হবে। নইলে তিনি পুরাতনপন্থী (backdated) হয়ে পড়বেন।

এই দায়িত্বগুলি সার্থকভাবে পালন করতে হলে শিক্ষককে যে কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়, সে কথা ত বলাই বাহুল্য।

শিক্ষকোচিত গুণাবলী (অনর্জিত বা সহজাত)

এই গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি অনর্জিত বা সহজাত এবং কতকগুলি অর্জিত। প্রথমেই সহজাত গুণের আলোচনা করি। সহজাত গুণের মধ্যে আবার শারীরিক গুণের কথাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

অনেক শিক্ষাবিদের মতে শারীরিক গুণের গোড়ার **কথাই** 'হল 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী' অর্থাৎ শিক্ষককে **দর্শনধারী** হতে হবে প্রথমে। অবশ্য দর্শনধারী বলতে চিত্রাভিনেতাসুলভ সৌন্দর্যের কথা বলা হচ্ছে না। বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ হাস্যময়, শক্তিশালী অথচ সুসম দেহবিন্যাসমন্বিত চেহারা হলে ভাল। কারণ সমগ্র ছাত্রের মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হবে তাঁকে। সুন্দর সুগঠিত উন্নত দেহ সে বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। অবশ্য দৈহিক সৌষ্ঠব শিক্ষক-জীবনের সার্থকতা লাভের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তবে বিকলাঙ্গ পঙ্গু বা ব্যাধিগ্রস্ত শরীর হলে শিক্ষকতা কার্যে বিশেষ অসুবিধা হয়, সে কথা ত বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় কথা—**কণ্ঠস্বর**। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর বেশ সুমিষ্ট অথচ সুউচ্চ হওয়া দরকার। পড়ানোর প্রধান উপকরণই হল কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট উচ্চারণ, তোতলামি বা আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত ভাষা ইত্যাদি পাঠ-পরিচালনায় বাধাসৃষ্টি করে।

তৃতীয় কথা—**স্বাস্থ্য**। শিক্ষকের চেহারা সুন্দর অসুন্দর যাই হোক, তাঁর স্বাস্থ্যটি যে বিশেষ ভাল হবার দরকার সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষকতা কার্য শুধু মানসিক নয়, শারীরিক শ্রমসাধ্যও বটে। ছাত্রের সর্বপ্রকার ত্রুটি দূর করবার জন্য শিক্ষকের চাই নিরলস প্রচেষ্টা। তাই শিক্ষককে হাতে হবে সুস্থ সবল এবং কষ্টসহিষ্ণু।

চতুর্থতঃ—শিক্ষকের **অসীম ধৈর্য সহিষ্ণুতা সদাপ্রফুল্লিত শান্ত মেজাজ** শিক্ষকবৃত্তির বোধহয় সর্বপ্রধান গুণ। সদাচঞ্চল শিশুদের সর্বপ্রকার দুষ্টামি, পাগলামি বোকামি উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে তার মানসিক-বিকাশ সাধনের চেষ্টা করতে হবে শিক্ষককে।

পঞ্চমতঃ—**সহানুভূতিশীলতা**। শিক্ষকের স্নেহপ্রবণ হৃদয় সব সময়েই ছাত্রের মঙ্গল কামনায় ব্যাকুল থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি— "সব শেষে বলব যেটাকে সবচেয়ে বড় মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা

কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া তাদের বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব।…ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে। এই জন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়—মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ।" এই স্নেহই শিক্ষকতা বৃত্তির প্রধান উপাদান।. পিতা যেমন আপন সন্তানকে ভালবাসে তেমনি আন্তরিক ভালবাসা থাকবে ছাত্রদের প্রতি। বালকের প্রত্যেকটি ব্যবহার, বালকেব দৃষ্টিতে দেখে বিচার করতে হবে। নিজের বাল্যজীবনের কথা চিন্তা করে দেখতে হবে, তবেই চঞ্চলচিত্ত বালকের দুষ্টামির তাৎপর্য শিক্ষক বুঝতে পারবেন এবং তবেই তিনি বিচারের কঠোরতা স্নেহধারা সিঞ্চনে কোমল করে নিতে পারবেন।

ষষ্ঠতঃ—**বাগ্মিতা ও বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য**। শিক্ষকতার কার্যে এই গুণটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যে অথবা সুশাসন রক্ষার কার্যে শিক্ষকের প্রধান অবলম্বনই হল তাঁর বাক্য। সুতরাং সেই বাক্যেব সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে যিনি যতটা পারদর্শী হবেন শিক্ষকতায় তিনি ততটাই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই!

সপ্তমতঃ—শিক্ষকের যেন কোন **মুদ্রাদোষ না থাকে**। শিশুরা বড়ই অনুকরণ প্রিয়। শিক্ষকের মুদ্রাদোষগুলি স্বভাবতই তারা অনুকরণ করে ব্যঙ্গ করতে চাইবে।

অষ্টমতঃ—**প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**। এই গুণটিও শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠ-পরিচালনা করতে করতেই অনেক সময় অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে হবে শিক্ষককে। সুতরাং অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করবার জন্য শিক্ষককে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়।

নবমতঃ—শিক্ষক হবেন **চটপটে** (smart)। শ্রেণীকক্ষে তিনি এক জায়গায় থাকবেন বটে কিন্তু চারিদিকেই তাঁর নজর চলবে। তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির আড়ালে ছেলেরা লুকিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করলেও যেন তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি না এড়ায়। স্যাণ্ডিফোর্ড রহস্য করে বলেছিলেন—শিক্ষক যখন রামের দিকে দৃষ্টি দেবেন তখন শ্যামের গতিবিধিও যেন দৃষ্টিপথের আড়ালে না যায়। [The ability to see Tommy's movements while looking at John is essential to successful teaching]

দশমতঃ—**রসজ্ঞান** (sense of humour)। শিক্ষকের যথোপযুক্ত

রসজ্ঞান না থাকলে শ্রেণীকক্ষে পাঠ-পরিচালনা হবে অত্যন্ত নীরস ও বিরক্তিকর। গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক-ভাবে কিছু হাল্কা নির্দোষ হাস্যরসের অবতারণা করলে ছাত্রদের মনের এক-ঘেয়েমি দূর হয়ে যায়, পাঠদান সজীব হয়ে ওঠে, সমগ্র শ্রেণী আনন্দোদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

তবে এই হাস্যরসের সৃষ্টি করতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে যেন কোন খেলো রসিকতা বা ফাজলামি না করা হয়। ইংরাজীতে বলে—laugh with the teacher but not at the teacher, শিক্ষকের হাসির সঙ্গে ছেলেরা হাসবে, শিক্ষককে দেখে হাসবে না।

একাদশতঃ—শিক্ষককে হতে হবে **চরিত্রবান, সত্যবাদী** এবং **পক্ষপাতশূন্য**। এই কয়েকটি গুণ শিক্ষকতা বৃত্তির পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষকের কথার কোন দাম নেই, অথবা তিনি কারো প্রতি অযথা পক্ষপাতী বলে প্রমাণিত হলে শিক্ষার আদর্শই নষ্ট হয়ে যাবে। ছাত্রের কাছে কোন শ্রদ্ধা সম্মান তিনি পাবেন না।

দ্বাদশতঃ—**কর্মচতুরতা** (Tactfulness)—বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্য পরিচালনার সম্পর্কে শিক্ষককে অনেক সময় হয়ত অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে তৎপরতার সঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবার কৌশলই হচ্ছে কর্মচতুরতা। কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়।

ত্রয়োদশতঃ—**আত্মবিশ্বাস**। এই হল শিক্ষকতাগুণের চরম কথা। শিক্ষকের যদি যথোচিত আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে তিনি কখনই সার্থক শিক্ষক হতে পারবেন না। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস না থাকলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কখনই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিব সদ্ব্যবহাব করতে পারবেন না।

শিক্ষকোচিত গুণাবলী (অর্জিত)—

এতক্ষণ ধরে অনর্জিত বা স্বাভাবিক গুণপনার কথা বলা হল। এইবার অর্জিত গুণাবলীর আলোচনা করি। শিক্ষাকার্যটি একটি বিশেষ শিল্পকার্য, সুতরাং অন্যান্য শিল্পকার্যের মতই এইজন্য একটি বিশেষ ধরণের শিক্ষার অর্থাৎ **শিক্ষণের** (Training) **প্রয়োজন**। অপর শিল্পকার্যে জড় পদার্থ নিয়ে কারবার অথচ শিক্ষাকার্যের কারবার জীবন্ত পদার্থ নিয়ে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ে। তাই এ কার্যের পরিচালনা-শিক্ষা এত প্রয়োজনীয়।

প্রথমেই বিষয়-জ্ঞানের অনুশীলন—বিদ্যালয়ে শিক্ষণকার্যে ব্রতী হতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে **উচ্চশিক্ষালাভের প্রয়োজন**। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যতটুকু জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান শিক্ষকের আয়ত্তে না থাকলে তিনি কখনই সুষ্ঠুভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ—**মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন**। শিক্ষাদান করা মানে শ্রেণীকক্ষে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দান করা নয়, ছাত্রদের ঐ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। আগেই আমরা দেখেছি, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জনে শিশুকে সাহায্য করেন শিক্ষক। সুতরাং শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান না থাকলে কোনমতেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—**শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন**। এ সম্বন্ধে গতানুগতিক পন্থা পরিহার করে, মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করে চলবার উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান থাকলেই তা শিশুদের দেওয়া যায় না। সেটা নির্ভর করে দেবার কৌশলের উপর, এবং এই কৌশলই হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতি। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে-সব শিক্ষাদান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তারই সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া শিক্ষা কখনই সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারে না।

চতুর্থতঃ—বিষয়জ্ঞান ছাড়াও **সর্ববিষয়ে সাধারণ জ্ঞান** (general knowledge) যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই শিক্ষকের। একটি বিষয় সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা করতে হলে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করতে হয় এবং অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation of studies) পাঠদান করতে হলে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা দরকার।

পঞ্চমতঃ—**বস্তুমুখী পরীক্ষা পরিচালনার জ্ঞান**। শিক্ষাদানের কৌশল আজকাল নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে আজকাল যে সব বস্তুমুখী পরীক্ষার (objective test) প্রচলন হয়েছে সেগুলি প্রস্তুত করবার (test construction) এবং পরীক্ষা করবার বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষককে।

ষষ্ঠতঃ—**প্রদীপনের ব্যবহার ও প্রস্তুতকরণ**—শিক্ষাদানের সহায়ক হিসাবে আজকাল নানাধরণের দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপনের (audio-

visual aids) ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। টেপ্‌রেকর্ডার, ফিল্ম প্রজেক্টার, এপিডায়স্কোপ প্রভৃতি জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহার করতে না শিখলে এই সব বৈজ্ঞানিক প্রদীপনের সাহায্য পাবেন না শিক্ষক। সুতরাং এই সকল প্রদীপন ব্যবহার তাঁকে জানতে হবে।

সপ্তমতঃ—বর্তমান শিক্ষা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পাঠদান করতে হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পাঠ্য নির্বাচনের সময় এমন কি ছাত্রোত্তর জীবনের বৃত্তি নির্বাচনের সময় তাকে পথের নির্দেশ দিতে হয়। কারণ শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী পথে অগ্রসর হলে তবেই তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব হবে। প্রত্যেকটি ছাত্রকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার **শিক্ষা-বিষয়ক ও বৃত্তি-বিষয়ক পন্থা নির্দেশ** (Educational and Vocational guidance) করে দিতে হবে। সুতরাং এই পন্থা নির্দেশের কৌশলটিও শিক্ষককে আয়ত্ত করতে হয়।

ষষ্ঠতঃ—আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষক মহাশয়েরা আজকাল আর আগের মত শিক্ষাদান কার্যের কর্তৃকারক নন; অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দান করেন না, ছাত্রদের পরোক্ষভাবে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করেন, শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং তাদের শিক্ষালাভের কাজে সহযোগিতা করেন। এই দিক দিয়ে শিক্ষকের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাই বর্তমানে শিক্ষকের আর এক নাম দেওয়া হয়েছে **পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণকারী** (Manipulator of environment)। সুতরাং শিক্ষককে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করতে স্বভাবতঃই আগ্রহী হন।

সপ্তমতঃ—বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়গুলিকে একটা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয় ও সমাজ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অর্থাৎ শুধু লেখাপড়ার চর্চা করাই নয়, **বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ-কর্মের অনুশীলনও** করতে হয় বিদ্যালয়কে; এবং সেই সব সমাজ-সেবার কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করা শিক্ষকদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টমতঃ—বিদ্যালয়ে আজকাল সহপাঠক্রমিক (Co-curricular activity) কাজের গুরুত্ব বেড়েছে। একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা **অনুশীলনেই** বিদ্যালয়ের

কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের ছাত্রসংসদ, বিতর্কসভা, পত্রিকা পরিচালনা, পাঠাগার গঠন, সাহিত্যচর্চা খেলাধূলা ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হয় বিদ্যালয়কে। সুতরাং এই সব **সহপাঠক্রমিক কাজেরও অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ** থাকা চাই শিক্ষকের। শুধু মাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পাণ্ডিত্য অর্জন করলেই শিক্ষকের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

নবমতঃ—শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসে কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করল তার আবার কতটুকু পরিবর্তন ঘটল তারও মূল্যায়ন স্থির করতে হয় শিক্ষককে। শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী আছেন তাঁর সেই কার্য কতটুকু সার্থক হল সে বিচারও ত করতে হবে শিক্ষককেই। শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে পাঠোন্নতির পরিচয় গ্রহণই নয় শিক্ষার্থীর সর্বপ্রকার আচার-আচরণ চিন্তা ভাবনায় পরিচয়-সম্বলিত **সর্বাত্মক পরিচয়লিপি** (Cumulative Record Card) **রক্ষা করার কাজও** শিক্ষকের।

দশমতঃ—বিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এই তিনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন না করতে পারলে শিক্ষাদান কখনই সার্থক হতে পারে না। এর জন্য বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে অভিভাবক-দিবস পালন করতে হয়। 'অভিভাবক—শিক্ষক-সমিতি' গঠন করতে হয়। এ-বিষয়ে শিক্ষকদের **নেতৃত্ব গ্রহণ** করতে হয়।

শিক্ষক কি জন্মায় না তৈরী হয়? (Are teachers born or made ?)

শিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা গেল তাতে শিক্ষকের অনেকগুলি সহজাত গুণের কথা বলা হয়েছে। সেই জন্যই অনেকে মনে করেন শিক্ষকসুলভ গুণাবলী নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনিই মাত্র সত্যকার শিক্ষক হতে পারেন, অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ শিক্ষককে তৈরী করা যায় না, শিক্ষক জন্মায়।

সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষককে যদি তৈরী করা না যায় তবে এত শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি? অথচ শিক্ষকোচিত গুণাবলীর অধিকাংশই সে সহজাত যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ বলে গৃহীত হয়েছেন তাঁরা ত কেউই শিক্ষণতত্ত্ব শিক্ষা করে আসেন নি। সহজাত প্রতিভা বলেই তাঁরা শিক্ষাকার্যকে শিল্পকার্যে রূপান্তর করতে পেরেছেন। তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি?

এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষকের অনর্জিত গুণগুলিও অনুশীলন-সাপেক্ষ। শিক্ষাদান কার্যে নেমে যে উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন, তা স্বাভাবিকভাবে সকলের সমান থাকে.না। আর তা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সব সময়ে তা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায় না। তাই কেবলমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর না করে পূর্বসূরি সার্থক শিক্ষাবিদগণের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করলে অনেক সময়ের ও শ্রমের লাঘব হয়। তাছাড়া সব কাজেরই একটা ন্যূনতম কার্যদক্ষতা (minimum working efficiency) আছে। সেই পর্যন্ত প্রত্যেককেই গড়ে-পিঠে শিখিয়ে তৈরী করে নেওয়া যায়। শিক্ষণশিক্ষায় সেই ন্যূনতম দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারবেন সকলেই। তার মধ্যে যাঁর সহজাত গুণ অধিক, তিনি যে অধিকতর ভাল শিক্ষক হবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই, তবে দেশব্যাপী শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গড়শ্রেণীব শিক্ষকেরও প্রয়োজন কম নয়। দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে কোটি কোটি শিশুর জন্য লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে কবে কে কোথায় শিক্ষকের সহজাত প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হবেন তারই আশায় দেশ অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। কাজ চালাবার মত গডশ্রেণীর শিক্ষক তাকে তৈরী করে নিতেই হবে হাজারে হাজারে। এই কাজ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলির দ্বাবা নির্বাহ করা হচ্ছে।

তাছাড়া আরো একটি কথা বিবেচ্য—যাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষকোচিত গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা যে শুধু আদর্শ শিক্ষকই হয়েছেন তাই নয়—নিজেদেব জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে শিক্ষাতত্ত্ব রচনা করে গিয়েছেন। তাঁরা শুধু শিক্ষকই নন, শিক্ষাপথের তাঁরা আদর্শ পথিকৃৎ। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানলাভ কবলে এই পথের যাত্রীর ভুলত্রুটি ব্যর্থতার হাত থেকে সহজে অব্যাহতি লাভ করা যায়। মোটকথা, অনর্জিত গুণ নিয়ে জন্মালেও তাব অনুশীলন প্রয়োজন। পথিকৃৎগণের পথ অনুবর্তন করে, তাঁদের অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছা এবং আগ্রহ সহকারে চললে আদর্শ শিক্ষক হওয়া কঠিন হয়।

তাছাড়া মানুষের সব ক্ষমতাই ত প্রথমে পরিস্ফুটভাবে দেখা দেয় না। অনেক ক্ষমতা সুপ্তভাবে থেকে যায়। সময় সুযোগ এবং শিক্ষার সহায়তা পেলে সেই সুপ্ত ক্ষমতা জাগ্রত হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় সেই জাগানর কাজেও অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

যাই হোক, মোট কথা হল—শিক্ষক জন্মগ্রহণও করেন, আবার গঠিতও হন। তবে যাঁরা শিক্ষকোচিত অনর্জিত গুণগুলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে শিক্ষক হয়েছেন এবং যাঁরা কেবলমাত্র অর্জিত গুণের জোরে শিক্ষক হয়েছেন—তাঁদের থেকে যাঁরা জন্মগত শিক্ষক হয়েও গঠনগত শিক্ষণের অনুশীলনে শিক্ষক হয়েছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করি—

"—যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদেব ভাব নেবাব অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সমীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা পাওনার নাড়ীর যোগ থাকে না।··· যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকাব আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি।"

—এই চির নবীনতাই হল শিক্ষকবৃত্তির চরম কথা।

শিক্ষালয়

১। আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

—রবীন্দ্রনাথ

২। দস্তুর মত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। —রবীন্দ্রনাথ

৩। The ideal school should be a miniature of society in which a child can be taught to live, work and utilise his capacities and the complexities of modern social life.

—John Dewey

৪। A shool should be a natural society···there should be no cramping or stifling of citizen, but room for all.

—P. Nunn

৫। The school is but one among many educational agencies and forces of society. —Counts

৬। School houses should be comfortable and attractive.

—Comenius

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(Development of School Idea)

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়েই জলের দিকে ছোটে, খাবার ঠুকরে খেতে চেষ্টা করে, ছাগল-ছানা জন্মের কিছুক্ষণ পরেই উঠে দাঁড়াতে পারে, আর কয়েকদিন পরেই ঘাস পাতা ছিঁড়তে চেষ্টা করে—এইভাবে মনুষ্যেতর সকল শিশুই আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে অত্যাল্পকালের মধ্যেই। কিন্তু মানবশিশু সুদীর্ঘ কাল পড়ে থাকে একান্ত অসহায় হয়ে, তারপর অতি ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলতে শুরু করে জীবনের পথে। জীব মাত্রেই এই জগতে আবির্ভূত হয় প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ জাতীয় কতকগুলি অনর্জিত সহজাত স্বাভাবিক ধন নিয়ে। মানবেতর জীবলোকের এইগুলোই হল প্রধান পাথেয়, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই তারা চলতে শুরু করে জীবনের গতানুগতিক পথে। অর্জিত অভিজ্ঞতার রঙ হয়ত কিছু লাগে, কিন্তু তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। মানুষের বেলাতেও প্রবৃত্তির বেগটা সমানই আছে কিন্তু তার প্রকাশের ধারাটা গিয়েছে বদলে। মানুষ তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত করে সেই বেগগুলিকে এমন সুন্দর করে, এমন অভিনব করে প্রকাশ করে যে তার পিছনকার অদম্য জৈব প্রবৃত্তির মূর্তিটা আর তেমন ভাবে চোখে পড়ে না।

মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবনের পার্থক্য ঃ

এইখানে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবলোকের তফাৎ। মানুষের জীবনের পথে জটিল ও বন্ধুর। একজনের পথ অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র, তাই ঐ চলার কৌশল আয়ত্ত করার কাজটা কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিলে মানুষের চলবে না, পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী উত্তর-পুরুষদের কাজে লাগবে দিগদর্শনী হিসাবে—এবং এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারণের উপায় হিসাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শিক্ষালয় রূপ একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং শিক্ষালয়গুলির উৎপত্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। শিক্ষালয়ের উৎপত্তির কাহিনী জানতে হলে তাই সভ্যতার পথে

মানুষের জয়জাত্রার বিভিন্ন স্তরের পরিচয় আমাদের সর্বপ্রথম সংগ্রহ করতে হবে।—এবং তা করতে হলে বর্তমানেই এই পারমাণবিক যুগের থেকে বহু সহস্র বৎসর পিছিয়ে যেতে হবে সভ্যতার সেই অরুণোদয় প্রাক্কালে।

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি :

গুহাবাসী মানুষ পশুস্তর থেকে তখন খুব বেশী দূর সরে আসেনি। পশুদের মতই তার জীবনযাত্রা পরিচালিত হচ্ছে প্রবৃত্তির তাডনায়। তখনও গোষ্ঠি-চেতনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, পারিবারিক বন্ধনও দৃঢ় নয়, তথাপি তার নিজস্ব পরিজন বলতে অল্প যে কয়েকজন মানুষ একসঙ্গে দল বেঁধে বসবাস করে তাদের মধ্যেই চলতে থাকে **অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান**। বলাই বাহুল্য, এই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান কোন উদ্দেশ্যমূলক নয়, কোন পরিকল্পনা অনুসারে নয়, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যও নয়।

গুহাশ্রয়ী আদিম অবস্থা :

বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তিবশে মানুষ পাহাড়ে পবতে অরণ্যে প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছে, বন্য পশুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনপণ সংগ্রামে আত্মরক্ষা করেছে, খাদ্য সংগ্রহ করেছে। সংগ্রামে পরাজিত হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কখন বা জয়লাভ করে বাঁচার পথ সহজ করেছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরাজিত মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই বিজয়ী মানুষেব সকল কৌশল অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। কর্মক্লান্ত বিজয়ী বীর হয়ত সন্ধ্যার পর অবসর সময়ে আগুনের পাশে বসে গল্প করে তার যুদ্ধজয়ের কথা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা—কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, হয়ত কেবল মাত্র আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি বশেই, কিন্তু এই সঙ্গেই অজ্ঞাতসারে শুরু হয়েছে শিক্ষার কাজ। মোট কথা, **এই স্তরে শিক্ষাটা এসেছে একেবারে স্থূল জৈবজীবনের তাগাদায় উপজাত** (byproduct) **হিসাবে অনুকরণের মাধ্যমে**। সুতরাং এর কোন লক্ষ্যও নেই, পরিকল্পনাও নেই। এই হল শিক্ষালয়ের আদিম রূপ—এই অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীন, পরিকল্পনাহীন, আকস্মিক এবং অনুকরণনির্ভর শিক্ষা-ব্যবস্থা চলতে থাকে মানবসমাজের সুদীর্ঘ শৈশবকালে জুড়ে।

সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ :

যাই হোক, মানুষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসে সভ্যতার পথে—জীবন-সংগ্রাম ক্রমশঃ জটিল হয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে। জীবনযুদ্ধের অস্ত্রও ক্রমশঃ শাণিত

হতে থাকে। অস্ত্র-নির্মাণের নিপুণতা এবং অস্ত্র-প্রয়োগের কৌশল ক্রমশ প্রাথমিক স্থূল পর্যায় শেষ করে সূক্ষ্মতর পর্যায়েব উন্নীত হল। সেই সব অস্ত্র-নির্মাণ বা প্রয়োগ-কৌশল তখন শুধু আব পরিকল্পনাহীন আকস্মিকতার উপর ফেলে রাখা চলে না। **মানুষ অনুভব করল তার সেই সব নব নব উদ্ভাবিত কৌশল পরবর্তীদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা।**

সভ্যতার পথে আরো অনেকদিন এগিয়ে আসার পব জৈব-প্রয়োজনের গতি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে। মানুষ শিখেছে কাপড় বুনতে, মৃৎপাত্র তৈবী করতে, তীব ধনুক নির্মাণ করতে, পাথর থেকে সূক্ষ্মতর উন্নততব অস্ত্র তৈরী করতে, পশুপালন কবতে।—

এই শিক্ষা একদিনে হয়নি বা একজনের জীবনে হয়নি। অতীত অভিজ্ঞতাব অনেক মুকুলিত প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে তবেই ধীরে ধীরে সে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। দিনান্তে কর্মক্লান্ত অভিজ্ঞ প্রাচীনেরা আগুনের পাশে বসে অর্বাচীনদের কাছে অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত কবতে গিয়ে যে বীজ বপন করেছিলেন তা থেকেই পরে উৎপন্ন হয়েছে আজকের এই বিদ্যালয়গুলি।

বিদ্যালয় অবসর-যাপনের কেন্দ্র ঃ

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ইংরাজী স্কুল (school) শব্দের অর্থ শব্দটির উৎপত্তির অনুসন্ধানে মিলবে। অগ্নিকুণ্ড-কেন্দ্রিক অবসর-যাপনের কেন্দ্রগুলি পরে কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের স্থান হিসাবেই ব্যবহৃত হতে লাগল গ্রীক সখোল (skhole) শব্দের দ্বারা। এবং আরো পরে ইংরাজী 'স্কুল' শব্দটি গ্রীক স্খোল শব্দ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, এবং তার অর্থ হয়েছে বিদ্যা-বিতরণ কেন্দ্র।

অর্থাৎ এই অগ্নিকুণ্ড-কেন্দ্রিক অবসব যাপনের স্থানগুলিই হল বর্তমান শিক্ষালয়গুলির ভ্রূণাবস্থা।

তারপর সেই ভ্রূণগুলি ক্রমশ কেমন করে মানব গোষ্ঠীর বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়স্বরূপ হয়ে উঠল, সে কাহিনী বিস্ময়কর—

মানব-সভ্যতার উদ্‌বর্তনের কাহিনী বলতে গেলে আবার গোড়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। কোন্ সুদূর অতীতকালে মানুষ পৃথিবীর বুকে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, তখন কেমন ছিল তার বাহ্লিক রূপ, কেমন বা তার

অন্তরেব রূপ আজ তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। তবে অরণ্যাশ্রয়ী গুহাবাসী পশুর সঙ্গে তার কোন তফাৎ ছিল না। যমজ ভায়ের মতই তারা এই পৃথিবীর বুকে জৈব-জীবনের তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু তারপর? পশুজন্ম সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই জীবন-পথ অনুবর্তন করে চলেছে, কিন্তু মানুষ বেছে নিয়েছে স্বতন্ত্র পথ, যে পথে চলতে চলতে আজ সে-বিদ্যুতালোকিত বিস্ময়কর আণবিক যুগে এসে পৌঁচেছে। সে পথের দিশা তাকে কে দেখাল? উত্তরে বোধহয় বলা যেতে পারে—মানুষের বিস্ময় এবং তার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি। জগতের বিচিত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ এসেছে, পরিস্থিতির নূতনত্বে বিস্মিত হয়েছে—খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে কার্যকারণ সূত্র। এবং এই খোঁজাব পথেই প্রকৃতি তার অমিত শক্তির খবর এবং গোপন ঐশ্বর্যের খবব মেলে ধরেছে মানুষের সামনে। এই খোঁজার পথই হল মানুষের সভ্যতাব পথ। বিচিত্র তার ইতিহাস, সুদীর্ঘ তার কাহিনী।

প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যই কি কম? দিনে সূর্য চন্দ্রের অমোঘ-আবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বিস্ময়কর পটপরিবর্তন, ঝড, ঝঞ্ঝা, প্লাবন, ভূমিকম্পের আকস্মিক ভয়াল আবির্ভাব,...তার চেয়েও বিস্ময়কর, জীবনের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে মৃত্যু--কেন আসে, কোথা থেকে আসে, কি তার কারণ? আদিম মানুষের মনে বিস্ময় জাগে, কার্যকারণ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দিশে পায় না। একটা ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড শক্তির লীলা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।—এই অজ্ঞাত শক্তির অনুভূতিই তাকে ভীত করে তোলে কোনো এক অজানা দৈবশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে—এবং এই সচেতনার মধ্যেই রয়েছে সব জাতির ধর্ম প্রেরণার মূল কথা। এই ভয়াবহ দুর্জ্ঞেয় শক্তির পরিচয় নিতে একদল চিন্তাশীল মানুষ চিরকালই তার বুদ্ধি-বিবেচনামত চেষ্টা করে এসেছে। এমনি করে উৎপত্তি ঘটেছে ধর্মের ও ধর্মগুরুর।

সর্বশক্তিমান যাদুকর মানুষ:

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এদের উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন রকমে। দেশে দেশে কালে কালে এ রূপ হয়েছে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মনের উপব এদের প্রভাব অসামান্য।

আদিম মানবসমাজে এই সব মানুষ সর্বশক্তিসম্পন্ন সর্বরহস্যবিদ বলে শ্রদ্ধা ও ভয় অর্জন করেছে। সমস্ত সমাজের বিবেক ছিল এই কয়েকটি রহস্যসন্ধানী মানুষের হাতের মুঠোয়। আদিম সমাজের এরাই হল একাধারে চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং শিক্ষক। ইংরাজিতে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিকম্যান (magic man) বা যাদুকর।

আগেই বলেছি—মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পূর্বে বিকেন্দ্রীভূত জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল একান্তই আকস্মিকভাবে অনুকরণের মাধ্যমে। তার পর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে গোষ্ঠী, সমাজ। মানুষের অভিজ্ঞতাও ক্রমশ প্রসারিত হতে লাগল। জাদুকর মানুষদের সম্পর্কে এখানে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগপীড়িত আদিম মানুষ তার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে ধর্মের অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে। এ-ধর্ম বলতে কোন আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ নয়, কতকগুলি বিধিনিষেধ দিয়ে ঘেরা সংস্কারের প্রথা অনুবর্তন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় অস্পষ্ট ধর্মবোধ ক্রমশ বিচিত্র ধরণের বিধিনিষেধ, পূজা-পদ্ধতির রূপ গ্রহণ করতে লাগল। এই পদ্ধতি এমন জটিলতর হয়ে উঠল, যে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হল। সুতরাং ধর্মকেন্দ্রগুলির সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে।—এর সব প্রথা মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে চেয়েছে। সুতরাং সেইগুলিই হল তখনকার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। তথাকথিত জ্ঞানী মানুষেরা তাদের প্রথানুবর্তনের সংস্কার দিয়ে পরবর্তী যুগের জ্ঞানী মানুষ তৈরী করে যেতেন। এক কথায়, তখনকার শিক্ষক গুরু পুরোহিতেরা তৈরী করে যেতেন তাঁদের উত্তরসাধক, ভাবীকালের গুরু পুরোহিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু পুরোহিত ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে এইভাবে গুরু পুরোহিতের আধিপত্য শুধু সভ্যতার গোড়ার দিকের ইতিহাসেই দেখা গিয়েছিল তাই নয়, সর্ব দেশে সুদীর্ঘকাল ধরেই এই আধিপত্য চলে এসেছে অব্যাহত গতিতে। অবশ্য দেশে দেশে কালে কালে তার রূপ হয়েছে বিচিত্র। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা কেবলমাত্র প্রথানুবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শও অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় আধিপত্যের

ন্যূনতা ঘটেনি কোথাও। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রেরণাই একমাত্র প্রেরণা। হিন্দু যুগের বর্ণাশ্রমী সমাজে শিক্ষালয় হল গুরুগৃহ, শিক্ষণীয় বিষয় হল আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনার প্রস্তুতি।

এরপর বৌদ্ধ-যুগ—সেখানেও ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। বৌদ্ধধর্মে বর্ণাশ্রম সংস্কার না থাকায় শিক্ষার ক্ষেত্রটা অনেকখানি গণতান্ত্রিক হল বটে, কিন্তু ধর্মীয় নিগড়েব সঙ্গে তার বন্ধন এতটুকু শিথিল হল না। শিক্ষাক্ষেত্র হল মঠ, বিহার সাংঘারাম, আর শিক্ষক হলেন ভিক্ষু, শ্রমণ, আচার্য প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ। মুসলমান যুগে তো মক্তব, মাদ্রাসা আর মসজিদ একার্থবাচক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষাগুরুও মৌলবী, ধর্মগুরুও মৌলবী।

সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসেও দেখা যায় চার্চেব অখণ্ড প্রতাপ। বাইবেল পড়ানর এবং ধর্ম শেখানর উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানেই প্রথম শিক্ষালয় গড়ে উঠেছিল। শুধু ইংলণ্ডই বা বলি কেন, সমগ্র ইউরোপেব শিক্ষাব ইতিহাস ধর্ম-প্রচারেব ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মোট কথা, শিক্ষালয়ের উৎপত্তিব ইতিহাসে বিকেন্দ্রীভূত আদিম অবস্থায় পর থেকে **শিক্ষালয় যখনই কোন একটা কেন্দ্রীভুত উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠবার চেষ্টা করেছে তখন থেকেই তার উদ্দেশ্যের মূল প্রেরণায় দেখা দিয়েছে ধর্মবোধ।**

শিক্ষালয় ও সমাজ

(School and Society)

—এসব ত হল পুরোনো দিনের কথা। বর্তমানের কথা হল, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ। সুতরাং শিক্ষালয়গুলিও এখন আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, পুরোপুরি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ধর্মবোধ বনাম সমাজবোধ

ইতিহাসে দেখতে পাই—রাজতন্ত্রের অত্যাচারে জজরিত মানুষ বিপ্লবের পিচ্ছিল পথে গণতন্ত্রকে আহ্বান করে এনেছে, প্রত্যেকটি মানুষের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছে। এই স্বীকৃতির মধ্যে শিক্ষাধারারও একটা বিরাট পরিবর্তন শুরু হল। জাঁ জাকুই রুশোর চিন্তাধারার প্লাবনে একদিকে যেমন ফরাসী ব্যাষ্টিলের পতন ঘটল অন্য দিকে চিরাচরিত শিক্ষাধারার কারাগারগুলিরও অবসান ঘটল। কর্তৃপক্ষের (তা সে পুরোহিত হোক আর রাজাই হোক) ইচ্ছা ও প্রয়োজনের ছাঁচে প্রত্যেকটি মানুষকে ঢালাই করে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেবার কারখানা হিসাবে গড়ে উঠেছিল শিক্ষালয়গুলি। নূতন যুগের ভোরে শিক্ষালয়ের সেই সর্বজনীন ছাঁচ ভেঙ্গে দিয়ে ব্যক্তিগত রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হল। ল্যাটিন শেখবার ষ্টিমবোলারের তলায় নিষ্পেষিত 'জন' শিক্ষাবিদদের কানে নূতন বাণী বহন করে আনল। শিক্ষালয়গুলির লক্ষ্য ও আদর্শ গেল বদলে।

বর্তমান যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই শিক্ষালয়গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একে একেবারে একটা নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি বললেন, সমাজের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই শিক্ষালয়ের স্থান বললেও ঠিক বলা হল না, শিক্ষালয়ই হল স্বরূপতঃ একটা সম্পূর্ণ সমাজ।—মানব সমাজের একেবারে নিখুঁত বাস্তব প্রতিরূপ। কথাটা বিশ্লেষণ করা দরকার।

শিক্ষালয়—স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজঃ

সমাজ কাকে বলে? কতকগুলি মানুষ একজায়গায় একই পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হলেই কি তার মধ্যে সমাজ গড়ে ওঠে? সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ

ছিল একক আত্মকেন্দ্রিক। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল পরিবার, দল, গোষ্ঠি, সমাজ। এই সমাজ গড়ার পেছনে শুধুমাত্র জীবন ধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নই ছিল না, ছিল জীবন প্রয়াসের মূল প্রশ্ন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের আকর্ষণেই সে সমাজ গড়েছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাকে স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করেও। মানুষের মূল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে অনেকগুলিই যে সমাজ গঠনের জন্য দায়ী যে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

যূথবদ্ধতা, আত্মপ্রচার, রণলিপ্সা আত্মবিলোপ, অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তিগুলির কোনটিই একক জীবনের পরিপোষক নয়, যৌথ জীবনেই তাদের সার্থকতা বিদ্যালয় গঠনের মূলেও দেখা যায় এই সব সহজাত প্রবৃত্তিরই কাজ।

যৌথ জীবনের আনন্দ, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রসারের সুযোগ, খেলার বা পড়ার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোধন প্রবৃত্তির তৃপ্তি এই সবাই ঘটে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে।

প্রবৃত্তির ক্রিয়া ছাড়াও সমাজ-জীবনের আরো কয়েকটি বন্ধন আছে, যথা ধারাবাহিকতা, ঐতিহ্যের গৌরববোধ, অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং অগ্রগতির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের জীবনেও এগুলি সমভাবেই কার্যকরী।

—বিষয়গুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানব সমাজ একটা আকস্মিক বস্তু নয়। হঠাৎ বহু লোক একত্র মিলিত হইলেই সমাজ গড়ে ওঠে না। সমাজের ধারাবাহিকতা আছে ;—শিক্ষালয়েরও আছে এই ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা। যে বিদ্যালয় যত প্রাচীন, যে বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস যত বিচিত্র ঘটনাবহুল ও গৌরবপূর্ণ, সেই বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন ততই সার্থক।

তারপর প্রত্যেক মানব সমাজের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে ; একটা আর একটার নির্জীব প্রতিরূপ নয়। মানুষে মানুষে যত মিলই থাক ; খানিকটা অংশে প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র, এবং এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তার নিজস্ব অভিব্যক্তিটি ধরা পড়ে। বিদ্যালয়ের বেলাতেও তাই। সব বিদ্যালয়ই এক ছাঁচে ঢালা—তার মধ্যে থেকেও যে বিদ্যালয় তার একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারে, ছাত্রের মনে সে তত বেশী সমাজ-জীবনবোধ জাগ্রত করে দিতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন, কোন একটি বিশেষ প্রার্থনা সংগীত

একটি বিশেষ পোষাক, কোন একটি বিশেষ নিয়ম ছাত্রের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ জাগ্রত করে দেয়।

এর পর তিরস্কার-পুরস্কারের কথা—সমাজ থাকলেই তার একটা শৃঙ্খলা থাকবে এবং নিয়ম পালনকারীর বা ভঙ্গকারীর পুরস্কার বা তিরস্কার করবার ক্ষমতাও থাকবে সমাজের হাতে। বিচার ও শাসন করবার অধিকার যদি সমাজের না থাকে তবে সেই সমাজের বন্ধন কেউ মানবে না—সামাজিক সংহতি যাবে নষ্ট হয়ে। বিদ্যালয়ের বেলাতেও তাই। ভাল কাজের পুরস্কার ও অন্যায় কাজের তিরস্কার বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে, তার ফলে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন হয় শক্তিশালী।

প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর বা সমাজের অগ্রগতির একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিধি নিষেধ গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়েরও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। বিদ্যার্জন, আত্মিক বিকাশ, দেহ ও মনের সুষম গঠন প্রভৃতি লক্ষ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালিত হয়।

এ ছাড়া আছে প্রভাবনের লীলা—সাহেব এই লীলার একটি বিশেষ প্রকাশের নাম দিয়েছেন "মাইমেসিস" (mimesis)। এর প্রকাশ শরীর মন ও বুদ্ধি, মানুষের এই তিনটি বিভিন্ন স্তরে তিন ভাবে ঘটে থাকে। যথা অনুকরণ, সমানুভূতি ও অনুভাবন! এই তিনটি ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। তবু এইটুকু বলা যায় যে অনেকগুলি মানুষ যখন সমাজে একসঙ্গে বসবাস করে তখন স্বভাবতই এমন মানুষ দেখা যায় যে অপর মানুষের উপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের আমরা নামকরণ করতে পারি **সামাজিক প্রভাবন**, নান্ সাহেব এরই নাম দিয়েছেন **মাইমেসিস্** (mimesis)-এই প্রভাব মানবজীবনে তিনটি বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হতে দেখা যায়—অনুভবের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বলাই বাহুল্য এই প্রভাবন হল যূথবদ্ধতা বৃত্তিরই (gregariousness) একটি অনিবার্য পরিণতি।

[Under mimesis we include all forms imitation—of feeling, of thought and of action. Sympathy, suggestion, and imitation, indeed, are manifestations of gregarious instinct in feeling, thought and action respectively—J. S. Ross.]

আমরা যখন অপরের অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হই তখন তাকে বলি সহানুভূতি (Sympathy)। চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হলে বলি অনুভাবন (Suggestion) এবং ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত হলে বলি অনুকরণ (imitation)।

মনের এই সাধারণ বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় সমাজের মধ্যে, বিদ্যালয়ের মধ্যেও। এই ভাবে একই উদ্দেশ্যে একই শৃঙ্খলায় এবং একই নীতিবোধের দ্বারায় যে-গণচেতনায় উদ্ভব হয়, তাকেই আমরা সমাজ-চেতনা বলতে পারি এবং এই হিসাবে বিদ্যালয় হল সমাজেরই অনুকল্প।

জন ডিউই এই মতটিকেই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষ সামাজিক জীব, অর্থাৎ সমাজ-জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ ঘটে থাকে, এইটেই হল শিক্ষার মূল কথা।

তাই ডিউইর মতে ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে যাওয়াটা শিক্ষা নয়, বর্তমান জীবন-ক্রিয়াই হল শিক্ষা (Educaton is a process of living, not a preparation for future living—J. Dewey)। শিক্ষার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালয়ের সংজ্ঞাও স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। শিক্ষালয় বলতে আর সমাজ কর্তৃক গঠিত জ্ঞান বিতরণের একটা কারখানা মাত্র নয়। শিক্ষালয় সমাজেরই অনুকল্প। সেখান থেকে ছেলেরা পুস্তক নিবদ্ধ বিষয়গুলির জ্ঞান ছাড়াও সামাজিক জীবন যাপনের সুপরিণত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইখানেই হল শিক্ষালয়ের প্রকৃত মূল্য।

শিক্ষালয় স্বাভাবিক সমাজ ও কৃত্রিম সমাজ

শিক্ষালয়ের এই নূতন গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করতে গিয়ে ডিউই আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিখ্যাত সংজ্ঞাটি (democracy is rule of the people, by the people and for the people) ঈষৎ পরিবর্তন করে বলেছেন—শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। (Education is of, by and for expeience)। সুতরাং বিদ্যালয়গুলি হল স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। এইদিক দিয়ে দেখলে একে কৃত্রিম সমাজ বা সমাজের একটি আদর্শ প্রতিরূপ বলেও ধরতে পারা যায়। আগেই বলেছি স্বাভাবিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই শিক্ষালয়ের মধ্যে

বিরাজমান। সেই দিক থেকে শিক্ষালয়গুলিকে স্বাভাবিক সমাজও বলা যায় কিন্তু বাস্তব সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়ের আবার অনেক পার্থক্যও আছে। শিক্ষালয়-সমাজ হল বাস্তব সমাজেরই একটা প্রতিরূপ বটে, তবে তা শুদ্ধ সংস্কৃত ও মার্জিত প্রতিরূপ (School is a simplified, purified and better balanced society—J. Dewey.)

সুনির্বাচিত এই তিনটি বিশেষণের (সরল, ও সুমার্জিত ও সুষম) দ্বারা জন ডিউই বাস্তব সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয় সমাজের পার্থক্যটি কিভাবে নির্দিষ্ট করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য—

বর্তমান সমাজ-জীবন অত্যন্ত জটিল এবং বহু বিচিত্র স্বার্থের সংঘর্ষে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আজ আবর্ত-সঙ্কুল। সরল শিশু এই জটিল আবর্তের মধ্যে থেকে তার নিজস্ব পথটি নির্বাচন করে নিতে পারে না। তাই শিক্ষালয়-সমাজ জীবনের পরিবেশ হবে সহজ ও সরল (simplified)।

তারপর, মানুষের সমাজে কত কলুষতা, আবিলতা ও পাপ। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই যে অল্পবিস্তর পশুপ্রবৃত্তি আছে, তারই যৌথ প্রকাশ সময়ে সময়ে সমাজ-জীবনের আবহাওয়া বিষাক্ত করে দেয়। বিদ্যালয়ের সমাজে এই কলুষতা থাকবে না—বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন হবে বিশুদ্ধ ও পবিত্র (purified)।

এইবার সুষমতার কথা। বাস্তব সমাজে ধন, জন, মন, জাতি, বর্ণ হিসাবে কত বিভেদ। এই বিভেদ অনুসারে পদে পদে মানুষের সত্যকার মূল্যবোধ ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে থাকবে না এই কৃত্রিম বিভেদ, থাকবে না কোন প্রকার অসমতা। ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সেখানে একই সঙ্গে একই মর্যাদায় মানুষ হবে; বিদ্যালয়-সমাজ জীবন হবে তাই সুন্দর ও সুষম (better balanced)।

এই হল আধুনিক কালে সমাজধর্মী মানুষের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে শিক্ষালয়ের নূতন মূল্যায়ন।

শিক্ষালয়ের শ্রেণীকরণ

(Types of school)

সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে কি ভাবে শিক্ষালয় গড়ে চলেছে শিক্ষালয়ের বিবর্তনের ইতিহাসে তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

বর্তমানকালে মানুষের প্রয়োজন হয়েছে অতি ব্যাপক, তাই শিক্ষালয়ের কার্যপরিধি হযেছে প্রসারিত। যেদিন থেকে শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেইদিন থেকেই বহু-বিস্তৃত শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়েছে সমাজকে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতিও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষা আজ শুধু সবল সুস্থ মানবের জন্যেই নয়, শিশু বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র পঙ্গু অন্ধ বধির জডধী প্রভৃতি সকল বয়সের সকল অবস্থার সকল শ্রেণীর জন্যই স্বীকৃত। তাছাড়া সভ্য মানবসমাজের জটিল জীবনযাত্রার সর্ববিধ কার্য সহায়ক হিসাবেই শিক্ষাকে রূপায়িত করবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। শিক্ষা আজ আর কেবলমাত্র ভাগ্যবন্তদের বিলাসভোগ্য নয়, সকল মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন সাধনের অপরিহার্য উপাদান। তাই আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও এই বহুমুখী প্রয়োজন সাধনের কেন্দ্র হিসাবে বহু প্রকারের।

আজকের দিনের সভ্য সমাজ তার এই গুরু দায়িত্ব পালনে কি পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছে জানতে হলে এই সব বহু বিচিত্র বিদ্যালয়গুলির স্বরূপ ও কার্যপ্রণালী জানা আবশ্যক।

শিক্ষাবিদ ফিণ্ডলে (Findlay) আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে শ্রেণীকরণ করেছেন—

(১) বিদ্যালয়ে মালিকানা (ownership) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক অসামর্থ্য (physical disabilities) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স ও যোগ্যতা (age and attainments) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৪) বিদ্যালয়ের পাঠক্রম (curriculam) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৫) শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের (range of responsibility) পরিমাণ হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৬) শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদা (social upbringing) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৭) শিক্ষার্থীর লিঙ্গ (sex) হিসাবে শ্রেণীকরণ।

অতঃপব এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষালয়গুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক—

(১) প্রথমেই **মালিকানা হিসাবে** শ্রেণীকরণের কথা। এ সম্বন্ধে ফিণ্ডলে ইংলণ্ডের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং সেই দিক থেকে তিনি ৭।৮ ধরণেব বিদ্যালয়ের তালিকা দিয়েছেন,—যথা—গৃহশিক্ষালয় (Home school), কোচিং ক্লাস এবং ডাক মারফৎ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান (Coaching class and Corsesponding school).

ব্যক্তিগত মালিকানার বিদ্যালয় (Proprietory school) ন্যাসী বিদ্যালয় (Endowed schools), সোসাইটি স্কুল, ন্যাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ন্যাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি।

আমাদের দেশে অবশ্য এত প্রকারের বিদ্যালয় না থাকলেও মোটামুটীভাবে বলা যায় পুরা সরকারী, আধা সরকারী, বা সরকারী সাহায্য পুষ্ট, পুরা বেসরকারী, ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত এবং কিছু কিছু ন্যাসী (Endowed) বিদ্যালয় আছে। কোচিং ক্লাস (Coaching class) জাতীয় একপ্রকার বিদ্যালয় ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আজকাল অনেক গড়ে উঠেছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ **শারীরিক অসামর্থ্যের** (Physical disabilities) **ভিত্তিতে** গড়া বিদ্যালয় পূর্বে আমাদের দেশে বেশী ছিল না। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় বিকৃতাঙ্গ ও দুর্বলমেধা হতভাগ্যদের জন্য বহুপ্রকার বিদ্যালয় রয়েছে বহুকাল থেকে। আমাদের দেশেও এই জাতীয় মূক-বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয়, জড়ধী ও চরিত্র-সংশোধনী বিদ্যালয় বর্তমানে কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

শারীরিক মানসিক ও নৈতিক—এই তিন স্তরের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনর বর্তমান সংজ্ঞানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং এগুলির বিকৃতি সংশোধনেই দায়িত্বও নিতে হয়েছে শিক্ষালয়গুলিকে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীর **বয়স ও মানসিক যোগ্যতা অনুসারে** শ্রেণীকরণ সব দেশেই আছে। সাধারণতঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক ক্ষমতা বাড়ে এবং শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা বাড়তে থাকে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুবিদ্যালয় (Nursery school), প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় (Junior high school) উচ্চমাধ্যমিক (High school) ও উচ্চতর মাধ্যমিক (Higher secondary school) বিদ্যালয়, তারপর মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি নানাপ্রকার শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) চতুর্থতঃ **পাঠক্রম** (curricula) অনুসারে বিদ্যালায়ের শ্রেণীকরণ একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে সকল্ দেশে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা করে থাকে সমাজ। বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য বিভিন্ন, পাঠক্রমও বিভিন্ন। ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলের মূল পাঠক্রম ছিল ল্যাটিন, —যেমন আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠিগুলি প্রাধান্য দিয়েছে সংস্কৃত শিক্ষাকে। তেমনি চিকিৎসা বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, পূর্তবিদ্যালয় বাণিজ্যিক বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক প্রকার বিশেষ বিদ্যার পঠন-পাঠনার বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সমাজে।

(৫) পঞ্চমতঃ **দায়িত্বগ্রহণ**। দায়িত্ব গ্রহণের শ্রেণীকরণ নির্ভর করে শিক্ষার্থী কতক্ষণ শিক্ষালয়ের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে তারই উপরে। আবাসিক বিদ্যালয়, ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়, দিবা-বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৬) ষষ্ঠতঃ **শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদা**। এই অনুযায়ী বিদ্যালয় সব দেশেই কিছু কিছু আছে। সমাজ-ব্যবস্থায় নানা প্রকার উচ্চ নীচ স্তরভেদের বিরুদ্ধে আজকাল নানা দেশে নানা প্রকার আন্দোলন চলেছে, কোথাও বা কিছু কিছু সফলতাও ঘটেছে, কিন্তু যুগ-সঞ্চিত আভিজাত্যবোধের মনোভাব এখনো বহুদেশে নানা অছিলায় রয়ে গিয়েছে। বিলাতের পাবলিক স্কুলগুলির আভিজাত্য সর্বজন বিদিত। ভারতবর্ষেও দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের জন্য বিলাতি পাবলিক স্কুল ধরণের কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল! স্বাধীনতা লাভের পর রাজন্যবর্গের বিলোপ সাধনেও এই অভিজাত বিদ্যালয়গুলি বিলুপ্ত হয়নি। দুন স্কুল, সিন্ধিয়া স্কুল প্রভৃতি ১৪টি অনুমোদিত পাবলিক স্কুল আজও ব্যয়বহুল বিলাতি পাবলিক স্কুলের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করছে।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এই জাতীয় অভিজাতশ্রেণীর স্কুলগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন—"If public schools are properly organised and training is given on right lines they can help to develop correct attitudes and behaviour and enable their students to become useful citizen…etc…"।

(৭) সপ্তমতঃ **লিঙ্গ অনুসারে** শ্রেণীকরণ—এই শ্রেণীকরণ সব দেশেই স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে। বালক-বালিকাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক জীবনধারাও বিভিন্ন হওয়া কর্তব্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বালক-বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই বিভাগটি অন্যগুলির মত একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয়। কারণ পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির অধিকাংশই আবার স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিভক্ত।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে দেখেছি আত্মোপলব্ধি বা পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ সব সময়েই নিজেকে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছে। মানুষে মানুষে কত পার্থক্য, রুচি, সামর্থ্য, বুদ্ধি প্রভৃতি দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকটি মানুষ অনন্যসাধারণ। তাই তাদের প্রত্যেকের বিকাশের ধারাও অনন্যসাধারণ। আবার অপর দিক দিয়ে দেখলে মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকলেও সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে তার কতকগুলি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত রুচির স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক কর্তব্যের দাবী উভয়ের সমন্বয় করতে হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

আমাদের দেশে এই কর্তব্য সম্পাদন করবার জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এই প্রসঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিশু-বিদ্যালয় বা নার্শারী স্কুল :

সাধারণতঃ ২ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্যই এই জাতীয় বিদ্যালয়। এই বয়সের শিশুরা স্বাভাবিকভাবে পিতামাতার কাছে গৃহ-পরিবেশেই মানুষ হয়ে থাকে। তাই এই বিদ্যালয়গুলিকেও গৃহ-পরিবেশের যথাসাধ্য অনুরূপ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে শিক্ষার কোন গতানুগতিক ধারা অনুসরণ

করে চলা সম্ভব নয়, এবং শিক্ষা বলতে যে প্রচলিত অর্থ আছে তাও এখানে প্রযোজ্য নয়। নার্শারী স্কুল এদেশে পূর্বে বড় একটা ছিল না—কিন্তু ইউরোপ অঞ্চলে বহুদিন থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। শিল্পনির্ভর সভ্যতায় মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের সংসারে পিতামাতা উভয়েই জীবিকা অর্জনের জন্য দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে কাটাতে বাধ্য হন—তাই সেই সব পরিবারের শিশুদের দেখাশুনা করবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ওসব দেশে গড়ে উঠেছে এই জাতীয় শিশুবিদ্যালয়। খেলাধূলা ও আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে সেখানে শিশুর আনন্দময় গৃহপরিবেশের অনুকল্প রচনা করবার চেষ্টা হয়। তা ছাড়া নাগরিক সভ্যতার চাপে মানুষের বাসস্থানও ক্রমশ এত ছোট এত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে যে শিশুদের ইচ্ছামত খেলাধূলা চলাফেরা করে বেড়াবার একান্ত স্থানাভাব। নার্শারী স্কুলের খোলামেলা জায়গায় শিশুদের হৃদয় মন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এদেশেও ক্রমশ শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নার্শারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। শিশুরা খেলতে চায়, নিজের হাতে গড়তে চায়, শিশুদের সঙ্গ চায়, এ সবই তারা পায় নার্শারী স্কুলে। নানাবিধ খেলনার সহাযতায় শিশুদের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকে এই সব স্কুলে। শিক্ষক এখানে বন্ধু ও খেলার সাথী। অত্যন্ত ভালবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষক শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার সার্থক উদ্গতির ব্যবস্থা করতে পারেন।

তাছাড়া নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিবিধ জিনিসপত্রের যথাসাধ্য ব্যবহার শিক্ষা, মলমূত্র পরিত্যাগ, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস প্রভৃতিও এই নার্শারী স্কুলের প্রধান কর্মাঙ্গ।

নার্শারী স্কুলে নিয়মিত আহার নিদ্রা ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকে। নাচ গান আবৃত্তি অভিনয় খেলাধূলা, আঁকা, পুতুলগড়া রং করা প্রভৃতি বিবিধ আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুমনের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ-সাধন ঘটে।

মোটকথা, শিশুদের স্ফুটনোন্মুখ দেহমনকে সৌন্দর্যময় পরিবেশের মধ্যে নিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হল এই নার্শারী স্কুলের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাইমারী ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ঃ

এখান থেকেই শিশুদের বিধিবদ্ধ শিক্ষা অর্থাৎ লেখাপড়ার সূচনা

থেকে ১১ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত এই স্কুলের সীমানা। এই বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিশুমনের অসামাজিক বৃত্তিগুলিকে সামাজিক বৃত্তিতে পরিণত করা। এখানেই শিশু ক্রমশ সামাজিক জীব হিসাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে শেখে। আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এই সময় থেকেই সর্বপ্রথম লিখন পঠন ও কিছু অঙ্ক (3 R) শেখাবার ব্যবস্থা। তবে পূর্বকালে শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে লিখন পঠনাদি ছাড়া আব কিছু থাকত না। কিন্তু বর্তমানে নানাপ্রকার হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুর সৃজনশক্তির বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ছন্দ তাল-যুক্ত সঙ্গীত—নৃত্যাদি সহযোগে শরীর সঞ্চালন ও ব্যায়ামের খেলাও হয়ে থাকে।

এই বয়সেই ছেলেদের মস্তিষ্ক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পেশী সঞ্চালন শেখাতে হয়।

তাছাড়া, অনুবন্ধ-প্রণালীতে (Correlation of Studies) বিবিধ জ্ঞান-মূলক শিক্ষার ঐক্যসাধনের পদ্ধতিটিও এই বয়সের উপযুক্ত। সেইজন্য কার্য-সমস্যা-মূলক পদ্ধতি (Project Method) এই বয়সের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাই হল এই স্তরের সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে আজকাল ব্যাপকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষালয় স্থাপনের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ করবার পর ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ ১১+থেকে ১৬+বৎসর পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষণ কাল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ছয় বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। উচ্চতর শিক্ষা বা বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ভূমিকা স্বরূপ এই স্তরের শিক্ষার মূল্য যে সমধিক তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া মুকুলিত শিশুমনকে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ বিকশিত করে তোলার কাজেও এই স্তরের শিক্ষার মূল্য অপরিসীম।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতে মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদানের জন্য মাত্র ছটি বৎসর যথেষ্ট নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে

ছাত্রেরা যখন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় প্রবেশ করে তখন তারা যথোপযুক্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে আসে না। তার ফলে শিক্ষার অব্যাহত ধারায় ভাল করে জোড় লাগে না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য দশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে আরো দুটো বৎসর যোগ দিয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করবার পরামর্শ দিয়েছেন অনেক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ।

মুদালিয়র কমিশন দুই বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসর যোগ দিয়ে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেছেন।—(It is now generally recognised that the period of Secondary Education covers the age group of about 11 to 17 years···The various arguments that have been adduced in favour of this view have led us to the conclusion that it would be best to increase the Secondary stage of education by one year and to plan the courses for a period of four years, after the middle of Senior Basic Stage.)

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে বর্তমানে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) **নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়:**

১৪+বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সীমা। শিক্ষা-জীবনের এই অংশটি পূর্ববর্তী উচ্চ প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ধরা যায়। এই অংশের পাঠ্য-তালিকাও (Curricula) পূর্ববর্তী অংশের ধারা অব্যাহত রেখেই প্রস্তুত করতে হবে।

জীবনের এই প্রথম আট বছরের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করার সময়ে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, এটি যেন কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষার ভূমিকামাত্র না হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়েছে। অবিলম্বেই হয়ত এই অভিপ্রায় কার্যকরী করবার চেষ্টা করা হবে। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা করে এই অংশের পাঠ্যতালিকা ও পঠনপদ্ধতি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(খ) **উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ**

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দুই বছর এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে তিন বৎসর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ডিগ্রী কলেজীয় ৪ বছরের শিক্ষাকালের প্রথম বছরটি মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সের কলেজের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কলেজীয় শিক্ষার একটা বছর লাভ করে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব করেছেন মুদালিয়র কমিশন।

এই স্তরের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করবার সময়ে যুগপৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও সামাজিক দাবীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়—তাই এখানে কতকগুলি অবশ্য-পঠনীয় কেন্দ্রীয় বিষয় (Core Subject) এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত রুচি-নির্ভর ঐচ্ছিক বিষয় (Priferry Subject) সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উচ্চতর বিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলিতে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য, চারুশিল্প ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এই গুলিকে বলা হবে সর্বার্থসাধক বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose School)।

কোন কোন উচ্চতর বিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে একটি ধারার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

(ঙ) **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঃ**

এরপরে স্নাতক শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে।

কৃষি, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা, নানাবিধ কারুশিল্প চারুশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিক্ষাদানের পরোক্ষ-প্রতিষ্ঠান

(Educational Agencies other than School)

শিক্ষালয়ের প্রকারভেদ ঃ

শিক্ষালয়ের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য ভাবেই সংযুক্ত। জীবন সংগ্রাম যত জটিল হয়ে এসেছে সেই সংগ্রামের উপযুক্ত হাতিহার সংগ্রহ করবার প্রয়োজনীয়তাও তত বেড়েছে। তাই জীবনের পথে চলবার বিচিত্র ধরনের কৌশল শিক্ষা দেবার কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে উঠেছে শিক্ষালয়গুলি। কিন্তু শিক্ষালয় বলতে আমরা আজ যেসব বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান বুঝি সেগুলি পুঁথিগত বিদ্যা বিতরণের ও বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের সাময়িক কেন্দ্র মাত্র। এই প্রতিষ্ঠান ও মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবে স্পর্শ করে নেই। তাই এখানকার শিক্ষা-রসধাবা মানুষেব সমগ্র জীবনকে রসসিক্ত করে রাখতে পারে না।

আধুনিক সংজ্ঞা অনুসাবে শিক্ষা তো জীবনের একটি খণ্ডাংশের অনুশীলিত বস্তু নয়, শিক্ষার কাজ চলে সারা জীবন ব্যাপী। জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মানুষ যে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে সে সবই তার শিক্ষার অঙ্গীভূত। পারিপার্শ্বিকের মাধ্যমে, নানা প্রতিষ্ঠানেব মাধ্যমে, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমশ ভরে উঠছে, মানুষ শিক্ষা লাভ করে চলেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান উৎসব আনন্দ উপলক্ষ্য কবে মানুষের চিত্ত প্রসারিত হয়, সংযোগ ঘটে এক মনের সঙ্গে বহু মনের। এমনি ভাবে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে, শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে মানুষের আর কতটুকু সময় থাকে? তার চেয়ে অনেক বেশি সময় তার কাটে সমাজের পরিবেশে। শিক্ষালয়ের বাঁধা-ধরা পঠন-পাঠনার বাইরে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এই সামাজিক পরিবেশ।

সুতরাং তথাকথিত শিক্ষালয় ছাড়াও শিক্ষাদানের পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান সমাজে ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, নানা বেশে, নানা রূপে। শিক্ষাদানের কাজ সেখানে নিরন্তর চলেছে অজ্ঞাতসারে।

পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

এমন ধরনের কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি এখানে উল্লেখ করি—

গৃহ :

(১) প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মানুষের গৃহ।—পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গৃহের স্থান সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাচীনতমও বটে। জন্মের পর থেকেই ত শিশু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করে। সুতরাং শিক্ষাও সেই সময় থেকেই শুরু হয়। বিশেষতঃ এই শিশুকালে যে অভ্যাস দানা বেঁধে ওঠে, যে মানসিক গঠনটি শিশু গড়ে তোলে পরবর্তী জীবনে তা আর সহজে পরিবর্তন করা যায় না। মোট কথা শিশুশিক্ষার ভিত্তির উপরেই পরবর্তী জীবনের শিক্ষার সৌধ গঠিত হয়। একমাত্র গৃহপরিবেশেই শিশুহৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়। উদারতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিবিধ সদগুণের সঙ্গে দরদ-ভরা মনের কোমল স্পর্শ শিশুর মনে অঙ্কুরিত হয় একমাত্র তার আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত শান্তির নীড় গৃহ পরিবেশে ; একথা স্বদেশের ও বিদেশের বহু মনীষী স্বীকার করেছেন—

শিক্ষাবিদ রেমণ্ট বলেছেন—The home is the soil in which spring up those virtues of which sympathy is the common characteristic. It is there that the warmest and most intimate affections flourish. It is there the child learns the difference between generosity and meanness, considerateness and selfishness, justice and injustice truth and falsehood industry and idleness :—

জীবনের এই প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক হলেন জননী। তাই শিশুর ভাবী জীবনে জননীর প্রভাব অপরিসীম। জর্জ হাবার্ট বলেছেন, একশটি শিক্ষকের কাজ করেন একটি মাত্র ভাল জননী [One good mother is worth a hundred school master—George Herbart] 'যে হাত দোলনা ঠেলে সেই হাতই রাজ্য পরিচালনা করে'—এই বিখ্যাত ইংরাজী প্রবচনটির তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মনীষীর জীবনেই আমরা তাঁদের মহিয়সী জননীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাব।

কমিনিয়াস থেকে শুরু করে রুশো, ফ্রয়েবল, পেষ্টালজি প্রমুখ সকল শিক্ষা-বিদেরাই শিশুশিক্ষায় মাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান স্বীকার করেছেন। গৃহ বা পরিবার ত সমাজেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, সুতরাং শিশুকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার মৌল কর্তব্যটি পালন করেন প্রধানতঃ তার পরিবার।

মোট কথা, এই গৃহ পরিবেশের শিক্ষাতেই আত্মকেন্দ্রিক শিশু ক্রমশ গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এবং এইখানেই শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রচার ঘটে। ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত পরিবারের বৃহত্তর সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে শেখে।

তাছাড়া গৃহশিক্ষার মাধ্যমেই অনেক সময় শিশু তার জাতিগত বৃত্তি-শিক্ষা শুরু করে, পিতার বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তার জন্য তাকে অন্য কোথাও যেতে হয় না। পিতার বা ঐ বৃত্তিধারী অভিভাবকের কাছ থেকে শিশু ভাবী কর্মজীবনের শিক্ষানবিশী শুরু করে।

কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র গৃহ-পরিবেশের প্রভাব ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। জীবন সংগ্রামের জটিলতায় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষ আজ বেরিয়ে পড়েছে পথে, শান্ত গৃহকোণের পবিত্র পরশ থেকে আজ অধিকাংশ শিশুই বঞ্চিত থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে ; এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে গড়ে উঠেছে নার্শারী স্কুল। পূর্বেই এগুলির কথা উল্লেখ করেছি।

(২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :

পরোক্ষ শিক্ষাদানের কেন্দ্রগুলির মধ্যে গৃহের পরেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থান।

সকল দেশে সকল যুগেই দেখা গিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অসামান্য প্রভাব। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষাদান কার্যটিই এককালে শুরু হয়েছিল ধর্মপ্রচারের আনুষঙ্গিক হিসাবে। মঠ, মন্দির, সংঘ, মসজিদ, চার্চ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু করেছিল।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় চার্চের প্রভাব যে এককালে কত বেশী ছিল তা সে

দেশের শিক্ষাধারার ইতিহাস খুললেই দেখা যাবে। শুধু ইংলণ্ডেই নয়, সারা ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অসামান্য!

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বৈদিকযুগে বা বৌদ্ধযুগে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্যটি মঠমন্দির মাধ্যমেই পরিচালিত হত। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল মসজিদকে কেন্দ্র করেই।

বর্তমানকালে অবশ্য মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বিচার একাধিপত্য আজ-কাল আর আশা করতে পারা যায় না।

তাই শিক্ষার প্রত্যক্ষ কেন্দ্র হিসাবে এই সব ধর্মায়তনগুলির স্থান আজ আর তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু মানুষের মন থেকে ধর্মীয় প্রভাব আজ ক্ষীণতর হয়েছে মাত্র একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই শিক্ষার কেন্দ্রে ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব আজো বড় কম নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন আজও যথেষ্ট সক্রিয়। তাই সামাজিক জীব মানুষের উপর তার প্রচণ্ড প্রভাব নানাদিকে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বিশেষত নীতিবাদও ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যদিও বর্তমান যুগে নীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় তবু প্রত্যেক ধর্মানুশাসনের মূল কথাই হল নীতি শিক্ষা। তাই বর্তমানের যুক্তিবাদী মানুষের মনও নীতি-শিক্ষার ছদ্মবেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবকে মেনে চলতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া, ধর্মানুষ্ঠানগুলি আজকাল সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমানের বিবিধ পূজানুষ্ঠানগুলি ধর্মানুশীলন অপেক্ষা সামাজিক আনন্দ উৎসবের উপলক্ষ্য হিসাবেই পালিত হচ্ছে।

উপরন্তু যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, পাঁচালী প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের মূল অনুষ্ঠান-গুলি আজ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন।

সুতরাং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আজও মানুষের মনকে নিত্য নব-অভিজ্ঞতার অনুশাসনে পরিচালিত করে চলেছে।

শিক্ষার পরোক্ষ কেন্দ্র হিসাবে অতঃপর নানাবিধ সংঘ-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক সংগঠনের নাম করতে হয়।

সংঘ সমিতি ও সামাজিক সংগঠন :

আগেই বলেছি, শিক্ষা বলতে শুধু পুস্তক-নিবন্ধ জ্ঞান বোঝায় না, এর

অর্থ আরো ব্যাপক। নানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশায় ভাবের বিচিত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার লাভ ঘটে।—সেই অভিজ্ঞতাই হল শিক্ষা। সুতরাং নানাজাতীয় সংঘ সমিতির শিক্ষাদান কার্যটিও একেবারে নগণ্য নয়।

নানা উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে দল গড়ে। খেলাধূলা, আনন্দ উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ, প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষ্য বিভিন্ন সংগঠনের। এগুলি সাধারণতঃ স্বল্পকালস্থায়ী সংগঠন। সুদূরপ্রসাবী লক্ষ্য নিয়েও মানুষ অনেক সময় দল গঠন করে। সেগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দল। বিভিন্ন রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য শিল্পকলা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে যে দল গড়া হয় সেগুলির প্রভাবও মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী। এই সব সংঘ সমিতির মাধ্যমে মানব-চরিত্রের এক-একটা দিক পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) যুব-আন্দোলন ঃ

আজকাল সব দেশেই যুব-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যুব-আন্দোলনের সার্থকতা প্রচুর। যুব-সমাজের পরোক্ষ শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে এই যুব-আন্দোলনের প্রভাবও অপরিসীম। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা সাধাবণতঃ ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে, জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করে এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং অমিত যুবশক্তির নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে যুব-সংঘগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নিজ নিজ স্বার্থে নিজেদের দলগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় স্বরূপে যুব-সংঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য, এ হল শক্তির অপব্যবহার। সমাজসেবা, দুর্গতসেবা, ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধন এইগুলিই যুব সংঘগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৪) মুদ্রাযন্ত্র ও বক্তৃতামঞ্চ ঃ

বর্তমান যুগে জনসাধারণের উপর এই দুইটির প্রভাব অসাধারণ। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করে জনমত গঠনকার্যে মুদ্রাযন্ত্র, তথা সংবাদ-পত্রের জুড়ি নেই। বিভিন্ন দলের ও মতের বিভিন্ন সংবাদপত্র নিজ নিজ মতের সমর্থনে নানাপ্রকার তথ্য সন্নিবেশপূর্বক প্রচারকার্য পরিচালনা করেন।

পরিবেশনশৈলীর গুণে জনসাধারণের মনে এর ফলে গভীর রেখাপাত করে।—ফলে সংবাদপত্রগুলিই জনমত গঠনকার্যে আজকাল বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

বক্তৃতামঞ্চের মাধ্যমেও সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মতামত জনগণের মনে প্রচার করে থাকেন, এবং তার ফলে সমাজের উপরে তাঁদের প্রভাবও সংক্রামিত হয়। বর্তমানে অবশ্য সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কার্যেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। তবে সমাজ জীবনের নানা দিকে, বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক দিকে এই দুই শক্তিশালী মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার অধিকতর কাম্য।

(৫) চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিসন :

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিসনের প্রভাব বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটির মধ্যে আবার চলচ্চিত্রের প্রভাব বোধহয় সর্বাধিক। চক্ষু ও কর্ণ উভয়েরই যুগপৎ ব্যবহারের সুযোগ থাকার ফলে মানুষের মনে এর আবেদন হয় গভীর। শিক্ষাদানকার্যে এই শক্তিশালী মাধ্যমটির সুষ্ঠু ব্যবহার পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল বিশেষভাবেই করা হচ্ছে—কিন্তু এদেশে এখনো এর তেমন প্রয়োগ দেখা যায়নি।

বেতারকেও আজকাল কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য করে না রেখে শিক্ষাদানের কার্যে ব্যবহার করলে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। পাশ্চত্য দেশে শিক্ষাদানকার্যে চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিসন আজকাল ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র স্থাপন করে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণের শিক্ষাদান-কৌশল প্রত্যেক ছেলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

টেলিভিসন অবশ্য এদেশে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ব্যবহারের হয়ত এখনো বিলম্ব আছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি শক্তিশালী মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

(৬) রাষ্ট্র :

শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়গুলির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রভাব ত আছেই, তাছাড়া, শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবেও রাষ্ট্রের স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অতীতকালে মানবগোষ্ঠীর উপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব যত বেশী ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তত বেশী ছিল না। ক্রমশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব কমতে থাকে এবং সেই স্থানে সমাজ-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়ে। রাষ্ট্র তার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে, আইন-কানুন রচনা করে অধীনস্থ মানব-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

নানাপ্রকার সমাজ-উন্নয়নমূলক জনহিতকর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র। সেই দায়িত্বে জনগণকে অবহিত করে তুলবার জন্যে সরকার থেকে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, বুলেটিন, রিপোর্ট, পরিসংখ্যান তথ্য প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে থাকে। শিক্ষা-উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকার সভা-সমিতি সংঘ স্থাপন করে, গবেষণাকার্যে বৃত্তি দিয়েও সরকার পরোক্ষভাবে শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী প্রচার-বিভাগ নানাভাবে মূল্যবান তথ্য প্রচার করেও জনসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে থাকেন।

শিক্ষালয়—শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান

(School as Direct Educational Agency)

এতক্ষণ যে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা কবা গেল, বলাই বাহুল্য, শিক্ষাদান করা সেগুলির কোনটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানাজাতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শিক্ষাদান কার্য গৌণভাবে নির্বাহ হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু মানুষ একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কেবলমাত্র শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়েই—সেই প্রতিষ্ঠানের নাম বিদ্যালয় (School)। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদান করা, এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের পথে চলতে গিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে কি কি কাজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অতঃপর সংক্ষেপে সেই কার্যগুলির পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করা যাক।

(১) অনুপূরণ কার্য (Supplimentary function)

শিশুর শিক্ষা শুরু হয়েছে গৃহ পরিবেশ থেকেই। তারপর নানাপ্রকাব পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরন্তর শিক্ষার কাজ চলছে।—কিন্তু এইসব শিক্ষা ত কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে চলে না। লব্ধজ্ঞানের মধ্যে থেকে যায় অনেক ফাঁক, অনেক শূন্যস্থান। জ্ঞানের সেই সব শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে দেয় বিদ্যালয়। বিভিন্ন স্থান থেকে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ সাধন করে দেয়। লব্ধজ্ঞানের অনুপূরক হিসাবে জ্ঞানকে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) সংশোধন কার্য (Corrective function):

শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেগুলির নাম করা হল সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, সে কথা আগেই বলেছি। অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষার কাজটা ঘটে উপজাত হিসাবে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রভাব সব সময়েই যে মঙ্গলজনক হবে এমন কোন কথা নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী প্রভাবটাই প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়। বিদ্যালয়ের

কাজ হল সব ক্ষেত্রে ঐ সব ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে মঙ্গলজনক প্রভাবটুকু বেছে নিতে সাহায্য করা।

দৃষ্টান্ত হিসাবে সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক। এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গলজনক প্রভাব অপেক্ষা রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাবে ছাত্রদের মন বিষিয়ে দেবার সম্ভাবনাই অধিক। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় ছাত্রকে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে যেতে না দিয়ে সংবাদপত্রের যেটুকু গ্রহণযোগ্য, সেইটুকুই মাত্র বেছে নিতে সাহায্য করবে।

(৩) প্রতিরোধন কার্য (Preventive function):

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'সংশোধন অপেক্ষা প্রতিরোধন কার্যকরী' (Prevention is better than cure.) এই সত্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইতিপূর্বে পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজবিরোধী ও নীতিবিরোধী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব প্রভাবের সংশোধন অপেক্ষা প্রতিরোধনের চেষ্টা করা আরো বেশী যুক্তিযুক্ত। সেই দায়িত্বও বহন করতে হবে বিদ্যালয়কে।

(৪) সমন্বয় কার্য (Integrative function):

পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি মারফত প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়। বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন মত, বিভিন্ন বক্তৃতার বিভিন্ন নির্দেশ, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থের বিভিন্ন উপদেশ শিক্ষার্থীর মনে বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। বিদ্যালয় এই সব স্ববিরোধী মতগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে একটি কল্যাণকর নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

(৫) সংরক্ষণীয় কার্য (Custodial function):

বর্তমানের এই সদাপরিবর্তনশীল জগতে আদর্শের পরিবর্তন ঘটছে, মতের ও পথের নব নব দিশা উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কিন্তু এই নিয়ম পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও একটা অপরিবর্তনীয় সত্যের সন্ধান মিলবে প্রত্যেক জাতির চিন্তাভাবনার মধ্যে। এই অপরিবর্তনীয় সত্যটিই হল জাতির ঐতিহ্য।

বিদ্যালয় হবে জাতির এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কিশোর মন যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিদ্যালয়ই এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে থেকে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারা

সংরক্ষণ করে শিক্ষার্থীকে জাতির ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে চলতে সাহায্য করে।

(৬) উদ্দীপন কার্য (Stimulative function):

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের ভাবধারার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থী কখনও উৎসাহিত হয়ে ওঠে, কখনও অবসাদগ্রস্থ হয়। বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীর মনে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনার প্রেরণা জুগিয়ে তার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

(৭) মূল্যায়ন কার্য (Evaluative function):

শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, এবং এক অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে অন্য অভিজ্ঞতার বিচিত্র সম্পদ সে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করে চলে। তবে এই সংগ্রহকার্য সকলের দ্বারা সমান ভাবে হয় না। ব্যক্তিগত রুচি সামর্থ্য ও পরিবেশগত সুযোগ অনুসারে সঞ্চয়নের কাজও নানাজনের নানা-রকম। কিন্তু এই সঞ্চয় কার কতটা হল তা পরিমাপ করবার দরকার এবং সে ভারও রয়েছে বিদ্যালয়ের উপর। বিদ্যালয় শিক্ষাদান করে, নানা অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান সংগ্রহ করে এনে ছাত্রকে পরিবেশন করে। কিন্তু এই পরিবেশিত জ্ঞান ছাত্র কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে সেটাও ধরা পড়ে বিদ্যালয়ে নানা-প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এই হিসাবে ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানের মূল্য নির্ণয় করাও বিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ।

বিদ্যালয় সমাজের প্রাণকেন্দ্র

(School as a Community Centre)

শিক্ষার্থীরা বাস করে নিজ নিজ গৃহ-পরিবেশের মধ্যে, বিদ্যালাভ করতে যায় শিক্ষালয়ে। সুতরাং শিক্ষালয় ও গৃহ এই দুইটাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তবেই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ তত্ত্বটির সন্ধান পাওয়া যায়। এর কোন একটি অংশ বাদ দিলেই শিক্ষা হবে খণ্ডিত।

তাই বর্তমানে শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা অনুসারে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবন ও সামাজিক-জীবন একই সূত্রে গ্রথিত করতে হবে, শিক্ষালয়ের ছাত্রজীবন ও সমাজের বাস্তবজীবন ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে হবে। এ'ছাড়া শিক্ষালয়গুলির আরো একটা গুরুতর কর্তব্য-পালনে তৎপর হবার প্রয়োজন আজকাল। আধুনিক কালের শিক্ষালয় কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা বিতরণের কেন্দ্র হয়েই থাকবে না, সমাজ-জীবনেরও সার্থক অভিব্যক্তি প্রকাশের কেন্দ্র হতে হবে তাকে। গ্রামীন্ সমাজ-জীবনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্খা আনন্দ-উৎসব শিক্ষালয়গুলিকে আশ্রয় করেই রূপান্তরিত করে তুলতে হবে। স্বাধীন দেশের শিক্ষালয়ের উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের গোড়ার কথাই হল জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এবং শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সংযোগ সাধন।

—এখন সমস্যা, কি করে এই দায়িত্ব পালন করা যায়। কেবল কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন এবং অবাস্তব তত্ত্বের চর্চা করেই বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হবে না। এখানে ছেলেমেয়েরা বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে, তবে শিক্ষা হবে সুসম্পূর্ণ এবং সার্থক।

অপরের সহযোগিতায় শিখবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে, সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির স্বার্থ বলি দিতে, আচারে আচরণে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিতে। তিরস্কার পুরস্কারের চাপে বাইরের থেকে চাপান শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার প্রেরণায় বিদ্যালয়ের বিবিধ অনুষ্ঠান যেন ভালভাবে নির্বাহ করতে পারে ছেলেমেয়েরা—সেই দিকে শিক্ষক মহাশয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

একটা জিনিস আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবো যে ছেলেমেয়েরা

নিজের থেকে যখন বিদ্যালয়ের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের বা নাটক-অভিনয়াদির ব্যবস্থা করে তখন শৃঙ্খলারক্ষার জন্য ত বাইরে থেকে কোন চেষ্টাই করতে হয় না। সুতরাং বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের দায়িত্বের উপরেই ছেড়ে দিতে হয়। ঐ প্রসঙ্গে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বটাই ছেড়ে দিতে হবে ছাত্রগোষ্ঠীর উপর। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কোন কর্মসূচী তৈরী করে ছাত্রদলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে বাইবে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলার আর কোন প্রয়োজনই হবে না।

আগেই বলেছি, বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজেরই ছোট সংস্করণ—অর্থাৎ বৃহৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র-সমাজ। এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-সমাজ দুইটির মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে যে সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে তারই উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সাফল্য ও সার্থকতা। গৃহে এবং সমাজ-জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত কতরকম সমস্যার সম্মুখীন হই, কতরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তারই উপর ভিত্তি করে যদি শিক্ষাদান করা যায় তবে সেই শিক্ষাই হবে বাস্তবধর্মী প্রকৃত শিক্ষা, পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ে ছেলেরা যে শিক্ষা পাবে প্রাত্যহিক জীবনকে তা যেন প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোন স্থান যদি আবর্জনাময় নোংরা অস্বাস্থ্যকর হয় তবে সেই বিদ্যালয়েব ছাত্র ও শিক্ষক সমবেত প্রচেষ্টায় তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলবেন এবং তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাসীদেরও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবহিত কবে তুলবেন। মোট কথা, বিদ্যালয়ের প্রভাব পড়বে সমাজের উপর এবং সমাজের প্রভাবও যে বিদ্যালয়ের উপর পড়বে সেকথা ত বলাই বাহুল্য। সমাজের মধ্যে অনেক সময়ে এমন লোক থাকেন যাঁদের নানা বিষয়ে নানা-প্রকার অভিজ্ঞতা আছে, নানাপ্রকার জ্ঞান আছে, সেই সব অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকেদেব মাঝে মাঝে বিদ্যলয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, জ্ঞানের কথা ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করতে বলা যেতে পারে। এই ভাবে বৃহত্তর মানব-সমাজে ও ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা উচিত।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের 'অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (Parent-Teacher Association) গঠন করা ভাল। এই সমিতির কাজের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে। কোন বিশেষ দিনে বা বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে ছাত্রের অভিভাবকবৃন্দকে বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে

এসে মেলামেশা আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে একটা হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা যায়। বিদ্যালয় তথা শিক্ষকদের উপর সমাজ যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে সেটা কিভাবে কতটুকু পালিত হচ্ছে বা পালিত না হবার কি কি প্রতিবন্ধক আছে সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষই অবহিত হবেন।

বিদ্যালয়কে আমরা সমাজবৃক্ষের ফুল বলে মনে করতে পারি। সমাজ থেকেই প্রাণরস সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে ফুটেছে সংস্কৃতির পুষ্প। এই যোগাযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সংস্কৃতির পুষ্পও যাবে শুকিয়ে, সমাজবৃক্ষও কুশ্রীতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সুতরাং শিক্ষার নূতন ভাবধারায় বিদ্যালয় হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের প্রাণকেন্দ্র। বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই সমাজের সংস্কৃতিমূলক চিন্তাধারা রূপ গ্রহণ করবে।

এই বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়দেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। শিক্ষকতা-বৃত্তিকে কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে না দেখে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকর্মের উপায় হিসাবে দেখলে শিক্ষালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে। শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁরা সমাজে একটি অতি প্রয়োজনীয় মঙ্গলকর কর্তব্যকর্ম সুসম্পাদন করছেন এই মনোভাব নিয়েই নূতন যুগের শিক্ষকদের কাজ করতে হবে।

কর্মের পথে কোন সমস্যা দেখা দিলে সকল শিক্ষক প্রধান শিক্ষক মিলে, এমন কি বিদ্যোৎসাহী অভিভাবকবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাব সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদ্যালয়ের সকল কাজ ত বটেই, এমন কি অনেক সামাজিক কল্যাণকর্মেও তাঁদের নেতৃত্ব করতে হবে। শিক্ষকবৃন্দের চারিত্রিক প্রভাব ছাত্রদের সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেবে।

আজকের ছাত্ররাই ত ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই শিক্ষালয়ের মধ্যে দিয়ে তারা শুধুমাত্র পুঁথিনিবদ্ধ জ্ঞান সংগ্রহ না করে চরিত্রবান সুনাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করতে শিখবে।

মোট কথা, নূতন যুগের অভ্যুদয়ে শিক্ষালয় সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা আজ একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষালয় আজ একটা সহজ সরল সুষম সমাজ। ছাত্রেরা এখানে দলবদ্ধভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় কাজ করতে শিখবে, এবং সেই কাজের মাধ্যমেই তাদের ভাবী জীবনের পথ রচিত হবে।

সমাজোন্নয়নে বিদ্যালয়ের দান

(The School as Contributor to Social Well-being)

সমাজের প্রয়োজনে সমাজ থেকেই কি ভাবে বিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটেছে ইতঃপূর্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সমাজোন্নয়নেও বিদ্যালয়ের দান অপরিসীম। সমাজ যেমন বিদ্যালয় গড়েছে, বিদ্যালয়ও তেমনি সমাজ গঠনে, রক্ষণে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সমাজ বলতে কি বুঝি? কতকগুলি মানুষ একসঙ্গে থাকলেই তাকে সমাজ বলে না। সমাজ ব্যষ্টিক গাণিতিক যোগফল মাত্র নয়। বহুমানবের একীভূত সত্তাই হচ্ছে মানব-জীবন, এবং একীভূত সত্তার মূল কথাই হল সামাজিকতাবোধ। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ত সমাজ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যদি এই সামাজিকতাবোধটি জাগ্রত না হয়, তাহলে কখনই সমাজ গড়ে ওঠে না।

কিন্তু সামাজিকতাবোধ কি করে জাগান যায় মানুষের মধ্যে? শিশুকাল থেকেই যদি মানুষের মাঝে তা জাগান না যায়, তবে সে মানুষ হবে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী ও অসামাজিক—সামাজিক অগ্রগতির পথে সে হবে বাধাস্বরূপ। ভেঙ্গে পড়বে সমাজ বন্ধন, ব্যাহত হবে সভ্যতার অগ্রগতি। —তাই বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব শিশুমনে সামাজিক বোধ জাগ্রত করে দেওয়া, আত্মকেন্দ্রিক শিশুকে সমাজ-কেন্দ্রিক মানুষে রূপান্তরিত করা।

বিদ্যালয় সমাজেরই সৃষ্টি একটা কৃত্রিম সমাজ। বিদ্যালয়ের কাজও প্রধানতঃ বিদ্যাদান হলেও পরোক্ষভাবে সমাজবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরী করা। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে সব অপূর্ণ ক্ষমতা, সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে বিদ্যালয় সেগুলি সযত্নে পরিস্ফুট কবে তুলবে, এবং তাদেব প্রতিভাব আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সমাজ।

আজকের দিনে যে সব শিশু বিদ্যালয়ের বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে দিয়ে ছোট্ট শেলেটটিতে অঙ্ক কষছে, হৈ হল্লা করছে, খেলা করছে, দুষ্টুমি করছে, আগামী দিনে তারাই হবে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদেরি হাতে তখন থাকবে সমাজ পরিচালনার ভার। আজ যাঁরা সমাজে নেতৃত্বের পতাকা হাতে

সামনের সারিতে এগিয়ে চলেছেন, সেই পতাকা তাঁরা আগামী দিনে দিয়ে যাবেন সমাজের যোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে। কিন্তু তার সংযোগ ঘটাবে কে? একমাত্র বিদ্যালয়ের মারফতই তাঁরা এই সংযোগটি ঘটাতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ই কেবলমাত্র অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগ ঘটিয়ে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—মানুষে মানুষে পার্থক্যের অন্ত নেই। বিদ্যা বুদ্ধি রুচি শক্তি সামর্থ্য চিন্তা—সব দিক দিয়েই ত প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন। এই সব বিচ্ছিন্ন একক পরস্পরবিরোধী-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সংহতিতে ত সমাজ গড়ে ওঠে না। তাই আপাতঃবিরোধী গুণাবলীর মধ্যে থেকে তার সাঙ্গীকরণ ও সাধারণীকৃতি আবিষ্কার করা প্রয়োজন। মানুষে মানুষে এত পার্থক্য, এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এই সাধারণীকৃতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে সমাজ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ হল এই সব সাধারণীকৃতি আবিষ্কার! বিভেদের মধ্যেও একটা মিলনের সূত্র খুঁজে বার করা, যে সূত্র দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে জড়িয়ে বাঁধা যায়।

বিদ্যালয় তার প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মনে খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে তুলব সংঘচেতনা (espirit-de-corps) বা যৌথ মনোবৃত্তি। এই হিসাবে সামাজিক সংশক্তি রক্ষাকল্পে বিদ্যালয়ের দান অপরিসীম।

তৃতীয় কথা—সমাজের নেতৃত্ব আজ যাঁদের হাতে রয়েছে, তাঁরাই ত চিরকাল থাকবেন না। তাঁদের হাত থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা দরকার। বিদ্যালয় তার বিবিধ পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করতে সচেষ্ট হয়, তার আত্মিক মানসিক শারীরিক বৌদ্ধিক প্রভৃতি সমস্ত দিকের উন্নতি করাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। আদর্শ গণতান্ত্রিক মানুষ গঠন করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। যার যেটুকু ক্ষমতা লুকিয়ে আছে সেটুকু আবিষ্কার করা ও সুমার্জিত করে প্রকাশ করা—এই হল আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথা।

সেই হিসাবে জীবনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার মত যোগ্য ব্যক্তি সরবরাহ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিদ্যালয়।

সুতরাং বিদ্যালয় যেমন সমাজগঠনে সাহায্য করে তেমনি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের ধারাও অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ—মানুষে মানুষে আজ নিরন্তর হানাহানি। ঈর্ষা বিদ্বেষের হলাহলে পরিপূর্ণ হয়েছে মানুষের সমাজ। জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার আদিম প্রেরণায় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ; শ্রেণীসংগ্রাম, বর্ণবিদ্বেষ, অত্যাচার অবিচার আজ চারিদিকে ব্যাপকভাবে জাল বিস্তার করেছে। এর ফলে সামাজিক সংশক্তি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এর হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে গেলে শিশুকাল থেকেই সামাজিকতাবোধ শিক্ষা দেবার প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন।—একমাত্র বিদ্যালয়ের দ্বারাই এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার কথা আগেই উল্লেখ করেছি—এই প্রসঙ্গে জন ডিউইর বক্তব্যটি উল্লেখ করি—

"—Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained. It involves many intellectual, social and moral qualities which cannot be expected to grow of their own accord."

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ :

শিক্ষালয়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের স্বারূপ্যও আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষালয়ের সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়-সমাজের যেমন নানাদিকে মিল, তেমনি আবার গরমিলও আছে বিভিন্ন দিকে। বলা হয়েছে, শিক্ষালয়-সমাজ হল মানব-সমাজের একটা সুসংস্কৃত উন্নত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ। অর্থাৎ যে সব সামাজিক গুণ ও আবেগের বন্ধনে সমাজ তার লোকগুলিকে একত্রীভূত করে একটি বৃহৎ আদর্শের দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে চলে, শিক্ষালয়-সমাজে সে সব ত আছেই উপরন্তু সমাজের যে সব বর্জনীয় দোষ-ত্রুটি মালিন্য কলুষ পঙ্কিলতা আছে সেগুলি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও আছে শিক্ষালয়ে। সুতরাং শিক্ষালয়-সমাজ বাইরের সমাজের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, একটা উন্নততর মার্জিততর প্রতিচ্ছবি! সেই হিসাবে শিক্ষালয় সমাজকে আমরা 'কৃত্রিম সমাজ বলতে পারি!

তাহলে এখন প্রশ্ন—বাস্তব-সমাজের সঙ্গে এই কৃত্রিম-সমাজের সম্বন্ধটি কি

হবে? বাইরের সমাজের কলুষতা থেকে শিক্ষালয়-সমাজকে রক্ষা করে চলতে গেলে এ'কে একটা কৃত্রিম পরিবেশের আবেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়। শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করে চলতে হয় এবং বাস্তব-সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে শিক্ষালয়-সমাজগুলি বিশেষভাবেই বাঁচিয়ে চলতে হয়। শিক্ষালয় সমাজকে নিষ্কলুষ (purified) করতে হয় বা সরল ও সুষম (simplified and better balanced) করে তুলতে চাই, তাহলে বাইরে সমাজের কলুষতা জটিলতা ও বিষমতার প্রভাব থেকে তাকে ত সরিয়ে রাখতে হবে। তাই আদর্শ বিদ্যালয়গুলি সবই প্রায় লোকসমাজ থেকে দূরে এবং আশ্রমিক ব্যবস্থায় (residential) গঠিত হয়েছে। আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সেখানে নিষিদ্ধ, এমনকি পারিবারিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত। লোকসমাজের মধ্যেই যেন সেগুলি এক-একটা স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যনিরপেক্ষ শিক্ষালয়-সমাজ।

ব্যাপারটা এইবার অন্যদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখা যাক। শিক্ষালয়গুলি সমাজেরই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমাজ কর্তৃক গঠিত। অথচ সেই উদ্দেশ্য-সাধনের পথে সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। আগেই বলেছি, বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জ্ঞানী মানুষ তৈরী করা নয়, সামাজিক মানুষ তৈরী করা। শিক্ষালয়কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চারিদিকে নিয়ন্ত্রণের পাঁচিল তুলে দিয়ে রাখলে অচলায়তনই গঠিত হবে, গণতান্ত্রিক দেশেব সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে না।

তাছাড়া শিক্ষালয়-সমাজের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠলে তার মধ্যে যত সদগুণেরই আভাস দেখা দিক বাস্তবের রূঢ় আঘাতের সম্মুখীন হলে সে ত আত্মরক্ষা রকতে পারবে না।

শিক্ষার্থী তার শিক্ষালয়-সমাজের যে পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত, বাইবের জগতের পরিবেশ তা থেকে একেবারেই ভিন্ন। সুতরাং অকস্মাৎ নূতন পরিবেশে এসে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ নয় না। সমাজে দোষত্রুটি ক্লেদমালিন্য আছে কিন্তু তাকে অস্বীকার করে ত তার হাত থেকে অব্যাহিত পাওয়া যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কৃত্রিম পরিবেশে টবের ফুল তৈরী করা নয়। কঠিন মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে চারাগাছ যাতে উত্তরকালে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠতে পারে তারি ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শিক্ষার্থীর এমন চারিত্রিক বল ও মানসিক

গঠন নিয়ে আসবে যে বৃহত্তর সমাজের কলুষতা তাকে স্পর্শ করতে ত পারবেই না, উপরন্তু সেই কলুষতা মার্জনা করবার ক্ষমতাও সে অর্জন করে আসবে। সমাজজীবনে প্রবেশ করবার সময়ে সমাজের গ্লানি স্বীকার করে নিয়ে সেই গ্লানি দূর করবার ক্ষমতাও সে নিয়ে আসবে বিদ্যালয় থেকে। এইখানেই ত বিদ্যালয়ের সার্থকতা। দ্বিতীয় কথা, কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পঠনপাঠনা করতে হয় বলেই শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাও অবাস্তব এবং কৃত্রিম হয়ে পড়তে বাধ্য। আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিতে বলা হয়েছে সমস্ত শিক্ষাই বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দিতে হবে তবেই সে শিক্ষা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারা যাবে। প্রয়োগসিদ্ধিই হল শিক্ষার সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি। সেই হিসাবে, কৃত্রিম পরিবেশে যে শিক্ষার আদানপ্রদান, জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগসিদ্ধি কিছুই নেই, সুতরাং সে শিক্ষা ব্যর্থ।

তারপর, স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে শৃঙ্খলাচর্চার কথা বলেন আধুনিক শিক্ষাবিদেরা।

সেই শৃঙ্খলাবোধ স্বতঃস্ফূর্ত। কৃত্রিম পরিবেশে এই স্বতঃস্ফূর্তি ত জাগে না। তাই সেখানে দেখা যায় শাসননির্ভর শৃঙ্খলা। অকস্মাৎ বাইরের শাসন বন্ধন কোন কারণে অপসারিত হয়ে গেলে, দেখা যায় মনের গহন থেকে বেরিয়ে পড়েছে শাসনভাঙ্গা বিশৃঙ্খল ব্যবহার।

সুতরাং বিদ্যালয়গুলিকে বাস্তব জগতের সংস্পর্শহীন কল্পিত স্বর্গরাজ্য হিসাবে গড়ে তুললে বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যটিই হয় ব্যর্থ কারণ সেই সব কল্পিত স্বর্গরাজ্য থেকে শিক্ষার্থী যেদিন এই ধুলির ধরণীতে পা দেবে সেদিন ত সে মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন না। কৃত্রিম সমাজের আদর্শ-শিক্ষার্থী সেদিন বাস্তব সমাজের অযোগ্য নাগরিকে পরিণত হবে।

তাহলে বাইরের সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়-সমাজের সম্বন্ধটা কি হবে? বাইরের সমাজের যে সব সহযোগিতামূলক সমাজধর্মী গুণ আছে বিদ্যালয়ে সেগুলি থাকবে অথচ বর্জনীয় মন্দ অংশটুকু তার মধ্যে থাকবে না—এ ব্যবস্থা কি করে করা যায়? বাইরের সমাজের দুর্নীতি অন্যায় ও কলুষ পঙ্কিলতা বিদ্যালয়-সমাজে যাতে অনুপ্রবেশ না করে তা ত দেখতেই হবে কিন্তু সেই সঙ্গে বাইরের সমাজের সর্ববিধ দোষত্রুটি ছেলেদের কাছে গোপন করে রেখেও কিছু লাভ হবে না। আগেই বলেছি সমাজকে অস্বীকার করে কল্পিত স্বর্গরাজ্যের কৃত্রিম পরিবেশে ছেলেদের মানুষ করলে তার ফল ভাল হয় না। তাদের

ভাল এবং মন্দ দুটোর সঙ্গেই পরিচিত করতে হবে এবং এমনভাবে তাদের মানসিক গঠন তৈরী করে দিতে হবে যাতে তারা নিজেরাই ভাল-মন্দ চিনতে শিখবে এবং মন্দটা বর্জন করে ভালটি বেছে নিতে পারবে।

জীবনে ত ভাল-মন্দ দুই-ই আসবে কিন্তু তার মধ্যে থেকে মন্দকে পরিহার করে ভালকে চিনে দেওয়ার মত শিক্ষা দেওয়াই হল বিদ্যালয়ের কাজ। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক (Curricular) ও সহপাঠক্রমিক (Co-curricular) কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে সৎপথের পথিক করতে হবে, সমাজবিরোধী কার্যাবলীর প্রতি ঘৃণা ও সুমার্জিত সামাজিক বৃত্তির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে, তবেই বিদ্যালয় তার সামাজিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছে বলে মনে করা হবে।

বিদ্যালয় ও সমাজ দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলেও একটি অপরটির পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু কিভাবে করবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাভাবিক যোগসূত্রটি কি তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়।

বিদ্যালয় ও সমাজ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। বিদ্যালয় ত সমাজ কর্তৃক গঠিত এবং সমাজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই নিয়োজিত। সেই হিসাবে বিদ্যালয়ও সর্বতোভাবেই সমাজের উপর নির্ভরশীল।

বিদ্যালয়-নির্ভর সমাজ :

(১) আগেই বলেছি, সমাজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের ভাবী উত্তরাধিকারীদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তী পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া।

মানুষ তার জ্ঞানকর্ম চিন্তাভাবনা প্রভৃতি সবকিছু অভিজ্ঞতাই দিয়ে যায় উত্তর-পুরুষের হাতে এবং এইভাবে সমাজ তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের কাজ প্রধানতঃ ঘটে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। সুতরাং সমাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের উপরে।

(২) বিদ্যালয় যে সমাজের অস্তিত্বটুকুই শুধু বজায় রেখে চলেছে তাই নয় তার বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যও সে বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রগতিশীল জগতে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সমাজেরও পরিবর্তন হচ্ছে সেই

সঙ্গে। পরিবর্তনশীলতাই সমাজের ধর্ম। নব নব চিন্তা ও ভাবধারা সমাজ-জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করে। বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করে চলাই হল জীবনের লক্ষণ। সমাজ যতদিন প্রাণশক্তিতে উচ্ছল থাকে ততদিনই সে নব নব ভাবধারা আত্মস্থ করতে করতে এগিয়ে চলে।

এই অগ্রগতির প্রেরণাও আসে বিদ্যালয় থেকে। অর্থাৎ বিদ্যালয় শুধু প্রাচীন অভিজ্ঞতাগুলিই সংরক্ষণ করে রাখে না, নব নব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা সন্ধান করে সমাজে গতিশীলতা প্রদান করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞানার্জন করে তার মধ্যে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের সংগৃহীত সমুদয় অভিজ্ঞতারই সার্থক সমাবেশ ঘটে। তার ফলে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে সমাজ এগিয়ে চলতে পারে।

(৩) বিদ্যালয়ের কাজ শুধু সমাজের রক্ষণ ও উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনবোধে, তাকে সংস্কার করবার ভারও বিদ্যালয়ের হাতে। একদিন সমাজে যা পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল আজ তা হয়ত কুসংস্কার বলে বর্জন করা হচ্ছে। কত নূতন সামাজিক বিধি-বিধান সংগৃহীত হচ্ছে এবং পুরাতন পরিত্যক্ত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজের দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তারা অবহিত এবং কালক্রমে সেগুলিকে মার্জিত ও সুসংস্কৃত করে সমাজকে কলুষমুক্ত করে তোলে।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে একদিন সমাজ সব বিধি-বিধান রচনা করে, প্রয়োজন ফুরালেও তা সহজে পরিহার করা সহজ হয় না। সাময়িক বিধি তখন স্থায়ী সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়, আচারের মিথ্যাবালু-রাশী বিচারের স্রোতপথ গ্রাস করে ফেলে। তখন সেই শুষ্ক বালুকান্তর অতিক্রম করে সমাজ-জীবনের স্রোতধারা পুনরায় প্রবাহিত করে দেবার কাজে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ই তাদের শিক্ষার্থীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতি-শীল বিষয়বুদ্ধি জাগ্রত করে কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করবার পথ প্রস্তুত করে।

(৪) সমাজ ক্রমশই সবল থেকে জটিল হয়ে উঠেছে। নিত্যনূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে। সেই সমস্যা-সমাধানের সুষ্ঠু পথটির নির্দেশ পাওয়া যাবে বিদ্যালয়ে।

(৫) বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশকালের বাধা ক্রমশই দূর হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব যেন তার যাবতীয় সমস্যা নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে

আমাদের শান্তশীতল পল্লীজীবনের মধ্যে। আগেকার দিনে যখন 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ' ছিল তখন সমাজজীবনে সমস্যাগুলি ছিল একান্তই ঘরোয়া, এবং তা সমাধানের পথও ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু ব্যতিক্রম ঘটছে সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের সমাজ-জীবনকে চঞ্চল করে তুলছে। এর সমাধানের জন্য চাই বিস্তৃততর অভিজ্ঞতা এবং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে ভাবী সমাজ-নায়কগণ এখানে প্রস্তুত হচ্ছেন।

(৬) বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনা শেষ করে শিক্ষার্থীরা গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করে। এবং বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করে মানুষ তখন পুরোপুরি সামাজিক জীবন শুরু করে দেয়।

আগেই বলেছি সুশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সার্থক সামাজিক জীবরূপে গড়ে তোলা, অর্থাৎ তার আচার-আচরণ সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে চলবে এবং জীবিকা অর্জনের বিচিত্র পন্থার মধ্যে তার যোগতা প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত পন্থাটি নির্বাচন করে নিতে পারবে। বৃত্তি-নির্বাচনে মানুষ যদি উপযুক্ত পন্থাটি খুঁজে পায় তাহলে সে নিজের জীবনকেও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করে তুলতে পারবে। অথচ পথ ভুল হলে মানুষের জীবনই যে শুধু বিপর্যস্ত হয়ে যাবে তাই নয়, সমাজেরও প্রভূত অপচয় ঘটবে। সমাজের উন্নতির কারণ হিসাবে যে গড়ে উঠতে পারত সে হয়ে উঠবে সমাজের ক্ষতিকারক। মনে করা যাক, যার ব্যবসায়ের প্রবণতা বা সামার্থ্য নেই সে যদি ব্যবসা ফেঁদে বসে তাহলে তার নিজের সর্বনাশ ত ঘটবেই, সেই সঙ্গে সমাজের ও ক্ষতি হবে বড় কম নয়। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচন করা। কাজটি সহজ নয়। বর্তমানের জটিল জীবনসংগ্রামে অসংখ্য প্রকারের বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছে। কে কোন কাজের উপযুক্ত সেটি আগে থেকে স্থির করে নিতে পারলে সামাজিক উন্নতির পথটি সুনির্দিষ্ট হয়। বর্তমানে এই নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিদ্যালয়। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য রুচি প্রবণতা বুদ্ধির প্রাচুর্য ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে তার বৃত্তি নির্বাচনে (Vocational guidance) সাহায্য করে বিদ্যালয়।

এই দিক দিয়ে বিদ্যালয় সমাজের একটি গুরুতর দায়িত্ব পালনের ভার নিয়েছে।

৭। আজকের দিনে সমাজ-সংগঠন ও সমাজ পরিচালনার পেছনে একটা সুচিন্তিত নীতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে। মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র এবং দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতি, এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই গড়ে উঠেছে সেই সব নীতি ও পদ্ধতি। সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন আসছে তারও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, নিয়ম আছে। বিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রকে সে সবই অনুশীলন করতে হয়, জানতে হয় এবং তাদের জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ভবিষ্যত-সমাজের রীতিনীতিগুলি।

এই সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে বিদ্যালয়কে সমাজদেহের একটি অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলেই মনে করতে হয়। বিদ্যালয় সমাজকর্তৃক সৃষ্টি হলেও সমাজ তার সৃষ্টি ও পুষ্টির জন্য বিদ্যালয়ের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল।

সমাজ-নির্ভর বিদ্যালয়ঃ

১। পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ও যে সমাজের উপর নির্ভরশীল সে ত বলাই বাহুল্য। কারণ—বিদ্যালয় ত সমাজই সৃষ্টি করেছে তার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সুতরাং সৃষ্টি ত স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হবেই। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। বিদ্যালয়ের উৎপত্তি আর ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই বেড়ে উঠেছে। সভ্যতার আদিযুগে মানবসমাজ যখন কোন নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে ওঠেনি বিদ্যালয়েরও তখন কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই।

তারপর ধীরে ধীরে মানবসমাজ গড়ে উঠল, গড়ে উঠল নানা জাতীয় বিদ্যালয় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী। সুতরাং বিদ্যালয় তার সৃষ্টি ও পুষ্টি উভয় দিকেই সমাজের উপর নির্ভরশীল।

(২) বিদ্যালয়ের গঠন কেমন হবে এবং পাঠক্রম কি হবে সেটা ত নির্ধারণ করবে সমাজ। এক কথায় সমাজের চাহিদা পূরণ করবে বিদ্যালয়। এই চাহিদা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন প্রকার। দেশ এবং কাল অনুসারে সমাজের আদর্শ বদলেছে, চাহিদাও বদলেছে। সুতরাং বিদ্যালয়গুলিকেও সেই অনুসারে কার্যক্রম ও পদ্ধতি বদলাতে হয়েছে। স্বৈরাচার-শাসিত সমাজের সঙ্গে গণতান্ত্রিক দেশের সমাজের পার্থক্য আছে। অতএব উভয় দেশের বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও গঠন-কৌশলের মধ্যেও পার্থক্য থাকবে।

(৩) শিক্ষা মূলতঃ সামাজিক প্রক্রিয়া, এবং বিদ্যালয় হচ্ছে সেই সামাজিক প্রক্রিয়া অনুশীলনের স্থান। এখানে এসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হয়। এই হিসাবে বিদ্যালয় একদিকে যেমন সমাজ গড়ছে আবার অন্যদিকে সমাজও বিদ্যালয় গড়েছে। দুইটি প্রতিষ্ঠানই অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কেউ কাউকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

সুতরাং বিদ্যালয়-পরিচালনায় সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগ ছিন্ন করে দেবার তো উপায় নেই বরং আরো ঘনিষ্ঠ করে তুললে উভয়েরই কার্য সুনির্বাহ হবে।

বিদ্যালয়—গৃহ—সমাজ:

শিশু জন্মগ্রহণ করে গৃহে, কর্ম গ্রহণ করে সমাজে। অর্থাৎ গৃহ-পরিবেশে যার সূচনা, সমাজ-পবিবেশে তার ব্যাপ্তি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনকে কেন্দ্র করে শিশু চিত্তের সম্প্রসারণ ঘটাতে শুরু হয়। পরে বৃহত্তর মানব-সমাজে গিয়ে তা পরিণতি লাভ করে। আত্মকেন্দ্রিক শিশু ক্রমশ সমাজকেন্দ্রিক মানুষে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ঘটবার কাজে বিদ্যালয়েব ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের একদিকে যেন গৃহ, অপরদিকে সমাজ। এই দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানার কাজ বিদ্যালযেব। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষা কাজ-কর্মের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বরূপের সমাজীকরণ ঘটে। অর্থাৎ বিদ্যালয় একদিকে যেমন প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করে তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে পাবে, অপর দিকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সমাজের উপযোগী করে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে আদৌ সমাজ-সচেতন থাকে না বরং আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতাই তার প্রধান মানসিক বৃত্তি হিসাবে দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ে পড়তে এসেই ধীরে ধীরে তার স্বভাবে সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হয়।

সব শিশুই যে বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে গৃহ থেকে সমাজে এসে উপনীত হচ্ছে এমন কথা অবশ্য নেই। যারা বিদ্যালয়ে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেনি তারা জীবন-সংগ্রামের বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই সামাজিক জীবন-

যাপনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। তবে বিদ্যালয়ে সে অভিজ্ঞতাগুলি আরো মার্জিত, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত অবস্থায় শিশুর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। প্রত্যেককেই যদি তার জীবনের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ জীবনযাপনের প্রণালী থেকে লাভ করতে হয় তাহলে ত মানবসভ্যতা আবার পেছিয়ে যাবে ইতিহাসপূর্ব যুগে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ঘটেছে। সুতরাং বিদ্যালয়কে আশ্রয় করে মানবসমাজ এবং মানবসমাজকে আশ্রয় করে বিদ্যালয় ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহ ও সমাজের সম্বন্ধটি আরেক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কোন কোন শিক্ষাবিদ। বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে দুটি ছোট বড় এককেন্দ্রিক বৃত্ত (Concentric Circles) কল্পনা করা যায়। ছোট বৃত্তটি গৃহ এবং বড় বৃত্তটি সমাজ। প্রথমে বিদ্যালয় তার প্রভাব বিস্তার করবে গৃহের উপর। গৃহ ও বিদ্যালয়ের সংযোগ হবে ঘনিষ্ঠতর। অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্কে গড়ে উঠবে এবং শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে উভয়ের সহযোগিতা সমভাবে কার্যকরী হবে। তারপর গৃহ ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে মানব-সমাজের উপরে। প্রত্যেকটি পিতামাতা তাঁদের নিজের সন্তানটিকে যেভাবে গড়তে চান সমাজও তার প্রত্যেকটি সভ্যকে তেমনি ভাবেই গড়ে তুলতে চায় এবং এই গড়ার কাজের প্রধান কারখানা হল বিদ্যালয়।

("What the best and the wisest parent wants for his own child, that must community want for all its children. Any other ideal for our schools is narrow and unlovely; acted upon, it destroys our democracy"—John Dewey).

জ্ঞানী পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের মানুষ করে তুলতে যতখানি আগ্রহ অনুরাগ এবং দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হবেন সমাজকেও ঠিক সেই ভাবেই অগ্রসর হতে হবে এবং এই অনুসারেই বিদ্যালয়ের আদর্শ নির্ধারিত হবে।

সুতরাং বিদ্যালয় বলতে কেবল কতকগুলি পুঁথিগত জ্ঞানানুশীলনের স্থান বলে মনে করলে ভুল হবে। দেশে দেশে কালে কালে মানুষের ইতিহাসে যত কিছু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে উঠেছে বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই তার আদান-প্রদান ঘটবে, সে কথা সত্য। তবে কেবলমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা-ই ত আধুনিক বিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ম নয়। আজকের সমাজ তাঁর বিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছে জ্ঞানচর্চা তার একটি ভগ্নাংশমাত্র (Schools are

not knowledge shops, and teachers are not information mongers"—John Adams).

আজকের দিনের বিদ্যালয়কে সমাজের প্রাণকেন্দ্র (Community Centre) হিসাবে দেখা হচ্ছে। সামাজিক মানুষের সর্ববিধ প্রস্তুতির ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয়, কারণ তার সব রকমের প্রয়োজন সরবরাহ করবে বিদ্যালয়। সুতরাং আধুনিক বিদ্যালয়ের কাছে সমাজের চাহিদা অনেক বেশী।

সামাজিক চাহিদার অর্থ সমাজভুক্ত নরনারীর চাহিদা। অবশ্য আজকের দিনে সেই চাহিদা এত জটিল ও পরস্পর-বিরোধী, মানুষে মানুষে এত ঈর্ষা সন্দেহ ভুল বোঝাবুঝি যে তার ভিতর থেকে সামাজিক চাহিদার একটি সুসম্পূর্ণ রূপ আবিষ্কার করা বড় সহজ নয়। ভারতবর্ষীয় সমাজের কথাই ধরা যাক। ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে এখনকার সমাজগুলি আজ বিভক্ত এবং সেই সব বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার পরস্পর-বিরোধী মনোভাব জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কিন্তু বিরোধ বিদূরণের ব্যবস্থা ত আমাদের বিদ্যালয় নামধেয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেই। বরং এই বিরোধকে জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টার পরিচয় কিছু কিছু হয়ত মিলতে পারে। এটা যে কতবড় ক্ষতিকর সে কথা অধিক বলা বাহুল্য।

তাই আধুনিক বিদ্যালয়গুলিকে সামাজিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্যক্তি ও সমাজ:

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় একথা বারবার বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, রুচি প্রবণতা ও সামর্থ্যের · বিভিন্নতা আছে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে এই বিভিন্নতার যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশুকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তোলাই হল আধুনিক শিক্ষার মূল কথা। 'আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে পরিস্ফুট করে তুলবার জন্য কত রকম শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রধান কাজই হচ্ছে ছাত্রদের এই স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করে তোলা, প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করা।

আধুনিক যুগে শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশুর মনের পরিচয় নিয়ে সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা করার কথা। সুতরাং সকলের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রত্যেকের মানসিক প্রবণতা ও রুচি এবং শারীরিক শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ সযত্নে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং সেই অনুসারে পাঠ্য নির্বাচন ও পদ্ধতি নিরূপণ করে এমন ভাবে তাকে পাঠ দিতে হয় যাতে তার সেই অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতাগুলি জীবনের পথে চলতে চলতে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু মানুষের এই বিকাশকে অন্য আর একদিক দিয়ে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের এত মূল্য আমরা দিচ্ছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং সামাজিক শিক্ষাও তার আত্মবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন সে একান্তই একা। মাত্র কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি সম্বল করে সে তার জীবনযাত্রা শুরু করে। কিন্তু তার এই যাত্রাপথ ত মানবসমাজের মধ্য দিয়েই। অর্থাৎ পৃথিবীতে আসার পর থেকে সামাজিক পরিবেশের আবেষ্টনীতে সে সব সময়েই জড়িয়ে থাকে।

আজকে আমরা মানুষের যে ব্যক্তিগত রুচি-প্রবণতার আলোচনা করছি বিশ্লেষণ করে দেখলে সেখানেও অনেকখানি সমাজের দান আছে।

সমাজের পটভূমিতেই মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে ফুটিয়ে তোলে। তাই ব্যক্তি-মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করলেও সেখানে সামাজিক মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে, সামাজিক ভাব-ধারার বৈশিষ্ট্যেই তার মনের অধিকাংশ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, দেখা যাবে।

প্রত্যেক মানুষের মত প্রত্যেকটি সমাজেরও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্য রূপায়িত হয় সমাজের অধিবাসীদের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে এবং ওই সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সূত্র অনুসরণ করেই মানুষ তার চিন্তায় ও কর্মে সংস্কৃতিবান হিসাবে পরিচিত হয়।

মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুযায়ী আজ আমরা প্রত্যেক মানুষের মানসিক গঠন ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি, কিন্তু মানবমনের যে মানসিক বিকাশ

অবলম্বন করে এই মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাও সামাজিক পট-ভূমিকাতেই বিকশিত হয়েছে।

সুতরাং যে মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র অবলম্বন করে আজ আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করতে বসেছি তার মধ্যেও সমাজ-কেন্দ্রিক মনের পরিচয় আছে। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মনোবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানেরই একটা অংশ হিসাবে ধরতে হয়।

তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবদানও কিছু কম নয়। পূর্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে না পারলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদ্যালয়কে সমাজের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে দেখা হচ্ছে আজকাল। বিদ্যালয়-জীবন থেকেই শিক্ষার্থীকে ভাবী সামাজিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলবার চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীর মনে সামাজিকতাকে ন্যায়নীতিবোধ শিল্পসৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি নানা প্রকার সমাজ-কল্যাণকরবোধের সঞ্চার করবার চেষ্টা চলেছে। মোট কথা বিদ্যালয়ের একটা প্রধান কাজ হল আত্মকেন্দ্রিক একক শিশুকে ক্রমশ পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা।

তাহলে বিদ্যালয়ের কাজ হল দ্বিমুখ—একদিকে সে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, শিক্ষার মাধ্যমে তার মানসিক খাদ্য পরিবেশন করতে গিয়ে প্রত্যেকের রুচি ও ক্ষুধার সন্ধান নিচ্ছে। এককথায় শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে।

অন্যদিকে আবার শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছে, তার ব্যক্তিসত্ত্বাকে সমাজসত্বার মধ্যে বিলীন করে দিয়ে তাকে সামাজিক মানুষ হিসাবে তৈরী করে নিচ্ছে। সমাজে বাস করতে হলে তার চিন্তায় ও কর্মে সামাজিকতা গুণের বিকাশ প্রয়োজন।

আগেই বলেছি শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে পরিপূর্ণভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তারপর ক্রমশ শিশু বড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন জনের সাথে মিলে-মিশে ভাবের আদান-প্রদান করে চলতে হয়। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ যত সম্প্রীতিমূলক হবে হবে ব্যক্তিও ততবেশী সাহায্য পাবে সমাজের

কাছ থেকে। ব্যক্তির প্রভাবে সমাজের সমৃদ্ধি আবার সমাজের সহযোগিতায় ব্যক্তির বিকাশ। আত্মকেন্দ্রিক শিশুকে সমাজকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত করবার কাজও বিত্যালয়ের। এই কাজের নাম দেওয়া যায় সমাজীকরণ (socialisation)। অবশ্য এই সমাজীকরণের কাজ প্রধানতঃ শুরু হয় গৃহপরিবেশ থেকেই। উৎসব, মেলা, পূজাপার্বণ খেলাধূলা ইত্যাদি নানা জাতীয় কাজের মাধ্যমেই শিশুচিত্তের সমাজীকরণ অজ্ঞাতসারে চলতে থাকে।

কিন্তু আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা এত জটিল এবং মানুষের জীবনও এমন কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অজ্ঞাতসারে এবং আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত-শিক্ষার উপর নির্ভর করে বসে থাকা চলে না। তাই বিত্যালয়কেই সর্বাঙ্গীণ সমাজীকরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠক্রমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার সহপাঠক্রমিক (co-curricular activity) কার্যাবলীর মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশু-চিত্তের সমাজীকরণ ঘটতে থাকে।

এইভাবে বিত্যালয় যে শিক্ষা-প্রদান করছে তাব দুইটি লক্ষ্য—**একদিকে সে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করে তুলছে, অপরদিকে তার সমাজীকরণ ঘটাচ্ছে**। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই কাজ দুটিকে পরস্পর-বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয় বরং একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়। কারণ আগেই বলেছি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সামাজিক পটভূমিতেই একমাত্র সম্ভব। যে পরিবেশ সমাজধর্মী নয় সেই পরিবেশে কখনই কেউ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কোন অসঙ্গতি বা অসামাজিক কার্যকলাপ সমাজধর্মী পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই হিসাবে বিত্যালয় একদিকে শিক্ষাকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পরিবেশন করবেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন। বিত্যালয়ের এই দ্বিবিধ কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক নান্ বলেছেন বিত্যালয়ের কাজ হল যুগপৎ শিক্ষার স্বতন্ত্রীকরণ ও শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ (individualise education and socialise the pupil —P. Nunn)

শিক্ষা ও সমাজ

(Education and Society)

আমরা দেখেছি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে বিদ্যালয়-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। হার্বার্ট স্পেনসারের যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা যেত 'ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুতি' অথবা 'সর্বাঙ্গীণ সুষম বিকাশ'। অথচ জন ডিউইর যুগে বলা হল 'শিক্ষাই জীবন' অথবা 'জীবন যাপনই শিক্ষা'। শিক্ষার মূল দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গেছে। সুতরাং বর্তমানে কতকগুলি পুঁথিগত জ্ঞানের কথা শিশুর মগজে পুরে দিলেই যে তাকে শিক্ষা দেওয়া হল, একথা মানা যাবে না।

জগৎ আজ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন যাচ্ছে বদলে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় গতানুগতিক ধারায় পুঁথিসর্বস্ব জ্ঞান শিক্ষার্থীর কতটুকু কাজে লাগবে তা চিন্তা করবার বিষয়।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা, একটু পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দিকে দিকে আজ অগ্রগতির প্রচেষ্টা—কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষার বিশাল পাথর বুকে চাপিয়ে কতটুকু অগ্রগতি সম্ভব হবে ?

লোভ স্বার্থপরতা হিংসা আত্মকেন্দ্রিকতা কুসংস্কার আলস্যপরতা—এই সব দোষগুলি আমাদের অস্থিমজ্জায় আজ ঢুকে পড়েছে। এইগুলি দূরীভূত করতে না পারলে কখনই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হবে না। এবং তা বিদূরিত করবার প্রধান উপায়ই হল শিক্ষাবিস্তার। বলাই বাহুল্য, এই শিক্ষা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার শিক্ষা, জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যা সমাধান করতে পারার মত শিক্ষা।

পুঁথিগত শিক্ষার ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দি'। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বাস করে পল্লীগ্রামে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা দীক্ষা বা চিন্তাধারা সবই নাগরিক-জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃতি ত পল্লীগ্রামে ও নগরাঞ্চলে এক হতে পারে না, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আমরা এখনো অনুভব করতে পারিনি। তাই একই ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশের সকলের জন্য

বরাদ্দ করা হয়েছে। তার ফলে গ্রামের ছেলে এই শিক্ষা লাভ করে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগাযোগ হারিয়েছে। পৈতৃকবৃত্তিকে ঘৃণা করতে শিখেছে, শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের তুলনায় অফিসে কলম পেশা অধিকতর সম্মানের কাজ বলে মনে করেছে।

তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে, শিক্ষিত বেকারের দল-বৃদ্ধি ঘটছে এবং তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিত হয়েছে। যুগযুগান্ত থেকে শোষিত অবহেলিত গ্রাম্যসমাজ আজ একেবারে শোচনীয় অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। সেই গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত করতে না পারলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনই সম্ভব হতে পারে না।

এ-বিষয়ে শিক্ষালয়গুলির একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জন্য যে শিক্ষাধারা পরিকল্পিত হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তা হবে একান্তই ব্যর্থ, কারণ উভয় অঞ্চলের পরিবেশ বিভিন্ন, সমস্যাও বিভিন্ন।

গ্রামাঞ্চলের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হবে তা যেন গ্রামাজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হয়। শিক্ষালয় যেন হয় সমাজের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামবাসীরা যেন অনুভব করতে পারে যে এই শিক্ষালয়টি তাদের সমাজ-জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বিদ্যালয়ের কাজ কেবল পুস্তকপাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। নানাবিধ-সমাজোন্নয়ন-মূলক কাজ, শিক্ষা বিতরণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিল্পচর্চা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করবে। এমন কি, চাষ-বাস করবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবার দায়িত্বও বিদ্যালয় গ্রহণ করতে পারে।

মোটকথা বিদ্যালয় হবে সমাজ-জীবনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—এই প্রতিষ্ঠান থেকেই সমাজ যেন তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কাজে সহায়তা লাভ করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরাই যে একমাত্র বিদ্যালয় থেকে উপকৃত হবে তাই নয়, সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনে বিদ্যালয়ের প্রভাব পড়বে।

কথাটা অন্যভাবে বলা যায়—সমগ্র গ্রামবাসীর উপর যদি বিদ্যালয় তার কল্যাণকর প্রভাব কার্যকরী না করতে পারে তাহলে বিদ্যালয় তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয় পুঁথিগত জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে করা যাক, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখান হচ্ছে

অথচ সেই স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিদ্যা যদি শিক্ষার্থীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে মার্জিত না করতে পারে, কৃষিবিদ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কৃষকের কৃষিকার্যের যদি উন্নতি না ঘটে তা হলে শিক্ষার মূল্য কি ?

ইয়োরোপ আমেরিকার বিভিন্নস্থানে বিদ্যালয়ের এই সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজটি বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি—

ডেনমার্কের ফোক্ হাইস্কুল (Folk High School) সেই দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সব বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী গঠিত হয়েছে। এবং লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কৃষক-সন্তানদের উন্নততর বৃত্তি শিক্ষা সম্ভব হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের টস্কেগি ইন্সটিট্যুট্ (The Tuskegee Institute) নিগ্রোদের সন্তানদের জন্য নানাবিধ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আমেরিকার গ্যারি স্কুল (The Gary school) ত বিদ্যালয় ও সমাজ এই দুটিকে একাকার করে দিয়েছে। সেই স্কুলে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই শিক্ষালাভ করবে তাই নয়, সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী যাতে সেখানে প্রয়োজনমত শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। দিনের কয়েক ঘণ্টা যথারীতি স্কুলের কার্য চলবার পর বিদ্যালয় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য। সেখানে তারা অবসর সময়ে সাধ্যমত শিক্ষালাভ করতে পারে। বিদ্যালয় সেখানে সমস্ত পল্লীর প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, এবং বিদ্যালয় থেকেই তারা ভদ্র নাগরিক জীবন যাপন করতে শেখে।

এদেশেও এই জাতীয় সমাজকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তা বেশী বলা বাহুল্য। বিদ্যালয়গুলি পারিপার্শ্বিক জনজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অনুশীলন করে: সুতরাং সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগটি হয় একান্তই কৃত্রিম। এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটি এইভাবে ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে পারলে তবেই বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে। নচেৎ নয়।

আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে দেশবিদেশের খবর রাখবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা আমাদের গ্রামের পাড়ার কোন খবরই জানি না বা জানবার ঔৎসুক্যও নাই। গ্রামে কত লোক-সংখ্যা, কি তাদের শিক্ষাদীক্ষা, কেমন

তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, গ্রামে কোন ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বিবরণ আছে কিনা, ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মেলা উৎসবাদি নানাধরণের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ছেলেরা। এই ভাবে জীবিত সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে শিক্ষাকে সার্থক করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে ব্যক্তব্য শেষ করি। তিনি বলেছেন—"পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে, তাহাতে শুধু জানা নয়; কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোন ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন। ***সন্ধান ও সংগ্রহ কবিবার বিষয় এমন কত আছে তার সীমা নাই। ***বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।"

শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতি

১। ......যখন এমনতর প্রশ্ন শুনি—'আমরা কী শিখিব,' 'কেমন করিয়া শিখিব,' 'শিক্ষার কোন প্রণালী কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছে,' তখন আমার এই কথাই মনে হয় শিক্ষা জিনিসটা ত জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব, এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যতবড়; তাহার চেয়ে বেশী জল ধরে না। —রবীন্দ্রনাথ

২। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতাবই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা। —রবীন্দ্রনাথ

৩। Play is the agency employed to develop crude powers and prepare those powers for life's uses. —Karl Groos

৪। The real remedy for the evils of examination would appear to lie in a closer relation between teaching and the examining functions. —Raymont

৫। Spasmodic government is weak goverment.

—John Locke

৬। The curriculum is the child's introduction to life, as schooling is the preparation for it. —Monroe

৭। Learing without thinking is empty, thinking without learing is dangerous —Confucius

পাঠ্যক্রম নির্ধারণ

(Curriculum Construction)

পাঠ্যক্রম কি ? :

শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুবিধ মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন দেশে যখনই কোনও একটা লক্ষ্য নির্বাচন করে নিয়েছে তখনই সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। মানব-জীবনের যে কয়েকটা বছর তার শিক্ষার কাল বলে নির্ধারিত, সেই কয়েকটি বছরের নিরলস সাধনার ফলেই মানুষ তার অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে চলে। এই সাধনার পদ্ধতিটিও নির্ধারিত হয় অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। লক্ষ্যে উপনীত হবার এই সাধন-পদ্ধতিরই নাম হল পাঠ্যক্রম, অর্থাৎ শিক্ষার পথে গন্তব্য স্থানের নাম যদি শিক্ষার লক্ষ্য (aim), তবে সেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পথের নাম হল পাঠ্যক্রম (curriculum)।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি।

জ্ঞান অনন্ত। বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে এই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের কোন কোন অংশ শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করতে হবে সেইটেই প্রথমে স্থির করে নেবার দরকার। তারপর, শুধু বিষয় নির্বাচন করলেই হবে না, শিক্ষাকালের সমগ্র সময় জুড়ে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির শ্রেণীবিন্যাসও করতে হবে।—অর্থাৎ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি বিষয় পড়তে হবে এবং কোন কোন শ্রেণীতে কতটুকু করে পড়তে হবে, সে সবই পাঠ্যক্রম নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ্যক্রম নীতি—অতীতে ও বর্তমানে :

পাঠ্যক্রমের ইংরেজী প্রতিশব্দ কারিক্যুলম (curriculum)। এই শব্দটির অন্তর্নিহিত মূল অর্থের মধ্যেই পাঠ্যক্রম বলতে এককালে কি বোঝাত তার পরিচয়টি নিহিত রয়েছে। কারিক্যুলমের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঘোড়দৌড় মাঠের ঘোড়া দৌড়ানোর নির্দিষ্ট পথ (track)। ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া যেমন এই নির্দিষ্ট পথ (track) অনুসরণ করে চলতে বাধ্য হয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাবার পথ বেঁধে দেয় পাঠ্যক্রম (curriculum)। এই বাঁধা পথ ঘোড়ার পক্ষে যেমন

অপরিবর্তনীয় তেমনি কারিক্যুলমের বাঁধা পথ ধরেই শিক্ষার্থী একদিন উপনীত হবে শিক্ষার গন্তব্যস্থলে। —এই ছিল সেকালের বিশ্বাস।

বর্তমানে অবশ্য পাঠক্রম বা কারিক্যুলম সম্বন্ধে ধারণা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অনড় অপরিবর্তনীয় জড়ধর্মী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এককালে চলতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষার্থীরা, আজকাল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য ও সামাজিক পরিবেশ অনুসরণ করেই গঠিত হয় পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রমের এই পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগোচিত শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য অনুসরণ করেই। —কারণ সমাজের আদর্শ, সমাজের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী হবে শিক্ষার আদর্শ এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কৌশল পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে।

প্রয়োগবাদীদের মতে পাঠ্যক্রমকে ঘোড়দৌড়ের পথ না বলে শিকার খোঁজার পথ বললেই ঠিক হয়। (following the curriculum is a chase and not a race.)। অর্থাৎ ঘোড়া দৌড়াবার পথটি একেবারে সুনির্দিষ্ট, তার একটুও নড়চড় হবার উপায় নেই অথবা অন্য পথ দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছুবার নিয়ম নেই কিন্তু শিকারীর কাছে লক্ষ্যটিই একমাত্র নির্দিষ্ট। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য যে কোন পথই অনুসরণ করা চলে।

শিক্ষকের কাছেও তেমনি শিক্ষার লক্ষ্যটি যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তাহলে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজনমত যে কোন পথ অনুসরণ করে চলার স্বাধীনতা থাকবে শিক্ষকের।

এককালে কিছু জ্ঞান আহরণ করাই ছিল শিক্ষাব মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক। শিক্ষার লক্ষ্য আজ শুধু-মাত্র জ্ঞানী মানুষ তৈরী করা নয়, গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শ নাগরিক তৈরী করা, তাই শিক্ষার পাঠ্যক্রম বর্তমানে যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল। খেলাধুলা, ব্যায়াম, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি কার্যগুলি এককালে যা ছিল পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত বিষয়, আজ তাই সহপাঠ্যক্রম বা পাঠ্যক্রমভুক্ত (co-curricular) বলে গৃহীত।

অতীতের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিক্ষায়-মানসিক শৃঙ্খলা-তত্ত্বের (theory of formal discipline) উপরে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হত।

এই তত্ত্ব অনুসারে এমন কতকগুলি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছিল যেগুলির

অনুশীলন করলে নাকি বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ লাভ ঘটে। যেমন গণিতের চর্চা মনের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও জ্যামিতির চর্চা যুক্তি স্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও তার ব্যাকরণ মানসিক ধী-শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, কাব্য সাহিত্য মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে মার্জিত করে। —এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই ছাত্রের মানসিক শৃঙ্খলা সাধনের আশায় আপাত অপ্রয়োজনীয় দুরূহ বিষয় নিয়ে সেকালের পাঠ্যক্রমকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হত।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব-গবেষণায় উক্ত মানসিক শৃঙ্খলা-তত্ত্বের ধারণা একেবারে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল শিক্ষার সঞ্চরণশীল শক্তির (Transfer of training) কোন অস্তিত্ব আছে বলেও স্বীকার করা হচ্ছে না।

এই তত্ত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল যে মানুষেব মনের নাকি কতক-গুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে, যথা—স্মৃতি, কল্পনা, একাগ্রতা ইত্যাদি। যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করে ঐ মানসিক বৃত্তিগুলির কোন একটি যদি চর্চা করা যায় তাহলে ঐ বৃত্তিটি সাধারণভাবেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং পাঠ্যক্রম নির্ধারণের সময়ে মনের ঐসব বৃত্তিগুলিকে ধার দেবার জন্যই কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করা হত। এ ছাড়া বিষয়গুলির আর কোন সার্থকতা ছিল না। ইয়োরোপীয় বিদ্যালয়গুলিতে বহুদিন ধরে গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি কঠিন ক্লাসিক ভাষা ও তার ব্যাকরণের পঠন-পাঠনা চলেছিল এইসব মানসিক বৃত্তি তত্ত্বের খাতিরে।

কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানের কোন পরীক্ষাতেই মনের স্বতন্ত্র বৃত্তি-তত্ত্ব (Faculty theory) বা শিক্ষায় সঞ্চরণবাদ (Transfer of training) সমর্থিত হয়নি। সুতরাং আজকাল পাঠ্যক্রম নির্ধারণে মনের বৃত্তি-তত্ত্ব বা শিক্ষার সঞ্চরণবাদ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখার আর প্রয়োজন হচ্ছে না।

বর্তমানের সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিটি ফলিত মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাই পাঠ্যক্রম নির্ধারণেও সেই মনোবিজ্ঞানেরই অনুমোদন চাই।

একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য অপরদিকে সমাজের দাবী ও সামাজিক পটভূমি এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য এই তিনের সার্থক সমন্বয় হবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মধ্যে। আগেকার পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে শুধু একটি সমস্যাই ছিল—কি পড়বে, বর্তমানের সমস্যা কে পড়বে, কেন পড়বে এবং

কেমন করে পড়বে? এই তিনের জবাবের উপর নির্ভর করবে—কি পড়বে। এই দিক দিয়ে জাতীয় জীবনে পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব অনেক বেশী। পাঠ্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে জাতি কি চায়, কি তার আদর্শ।

এই সকল দিক বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করবার সময় কোন কোন নীতির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে এগোতে হবে, সেইটে আগে স্থির করে নিতে হয়।

শিক্ষার নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব :

নীতির কথা বলতে গেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতিগত মত-বৈচিত্র্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। আগেই বলেছি. পাঠ্যক্রম নির্ধাবণে যে নীতি অনুসরণ করে চলা হয়, তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের উপর, এবং সেই লক্ষ্যটি আবার নির্ভর করে জাতির জীবন-দর্শনের উপরে। অর্থাৎ যুগে যুগে দেশে দেশে জাতিগত জীবন-দর্শন অনুসারে নিরূপিত হয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে নির্ধারিত হয় পাঠ্যক্রম।

সুতরাং পাঠ্য নির্ধারণের নীতি (Principle of Curriculum Construction) আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মূলকথাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাববাদী (Idealist) **:**

ভাববাদী দাশনিকবৃন্দ এই জগতের কারণ কারণস্বরূপ একটি পরম সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেন। এই পরম সত্তাই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে মানুষের মধ্যে। সেই হিসাবে জাতিগত ঐতিহ্যের মূল্য তাঁদের কাছে অপরিসীম। যুগে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল চিন্তা ও ভাবধারা আমাদের জন্য সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন সেই হল আমাদের উত্তরাধিকারের মহামূল্য সম্পদ। আমাদের ভাবী বংশধরদের কি সেই সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি?

সুতরাং পাঠ্যক্রমের মধ্যে পূর্বপুরুষদের আহৃত এই সব শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারের পরিচয় থাকা চাই। এই ভাববাদীগণ পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিশুর চাহিদা অথবা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অপেক্ষা জাতিগত দাবী বড় করে দেখাচ্ছেন। বর্তমান অপেক্ষা অতীত সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতিবাদী (Naturalist) :

প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রকৃতিই হচ্ছে একাধারে মানবের শিক্ষাদাতা ও শিক্ষণীয় বিষয়। প্রকৃতির অকৃত্রিম সহজ সরল সংস্পর্শে এসে মানুষ একান্ত স্বাভাবিক ভাবে যে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানই হল সত্যকার জ্ঞান। সামাজিক জীবনের বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির স্থূল হস্তাবলেপে প্রকৃতির এই সকল স্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। প্রকৃতিবাদী রুশোর মতে প্রকৃতির হাত থেকে যা আসবে তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। মানুষের সংস্পর্শে এলেই তা নষ্ট হয়ে যাবে।—এই ধরণের প্রকৃতির অকুণ্ঠ স্তুতি ও মানবসমাজের প্রচণ্ড নিন্দা করেছেন রুশো।

সুতরাং শিশুর বর্তমান কালের অভিজ্ঞতার মূল্যই একমাত্র সত্য। অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতি কোন মোহময় আকর্ষণ নেই প্রকৃতিবাদীদের। তাঁর মতে প্রকৃতি থেকে যা স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, তাই শুধু পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কোন রকম পুঁথিগত কৃত্রিম জ্ঞানের বোঝা শিশুর মাথায় চাপালে চলবে না।

জড়বাদী (Materialist) :

জড়বাদীদের মতে শিক্ষার্থীর বর্তমান বাস্তব পরিবেশ মাত্র অবলম্বন করে পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। মৃত অতীত বা অজাত ভবিষ্যতের ব্যর্থ কল্পনার কোন স্থান নেই। শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জড়জগতের যাবতীয় সুখ-সুবিধা আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ লাভ করা। সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে যে সব জ্ঞান পৃথিবীর ইহলৌকিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির সহায়ক সেইগুলিমাত্র অনুশীলনযোগ্য, এবং সেইগুলিই জড়বাদীদের মতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রয়োগবাদী (Pragmatist)

এই মত একান্তই অর্বাচীন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই প্রকৃতপক্ষে এই নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রয়োগবাদীদের মূল কথা হল, কোন তথ্য বা তত্ত্ব সত্য হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্বে তা যাচাই করে দেখতে হবে জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা কতটুকু, সার্থকতা কি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর উপযোগিতা কি ?—

ডিউইর মতে শিক্ষা মানেই হল জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সমষ্টি। জীবন

এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে তুলতে। এই বিকাশই হল জীবন এবং এই এগিয়ে চলা জীবনই হল শিক্ষা।—সুতরাং সীমাবদ্ধ কোন নির্দিষ্ট স্থানকে শিক্ষার বিষয়বস্তু বলে মনে করা যায় না। তাই প্রয়োগবাদীদের মত কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনা করাও সম্ভব নয়।

সমগ্র জীবনের সংহত অভিজ্ঞতাই যদি শিক্ষার মূল কথা হয় তাহলে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিরাট পটভূমি বা কর্মক্ষেত্রকেই পাঠ্যক্রম বলে মনে করতে হয়।

প্রয়োগবাদীরা তাই শিক্ষার্থীর সদাপরিবর্তনশীল-পরিবেশ-লব্ধ নিত্যনব কর্মপ্রচেষ্টাকেই পাঠ্যক্রম বলে মনে করছেন। পুঁথিনিবদ্ধ কোন জ্ঞানকে তাঁরা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি।

সেইজন্য জন ডিউই তাঁর ল্যাবরেটারী স্কুলে প্রথমে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমেরই প্রবর্তন করেননি। অবশ্য পরে প্রয়োগবাদীরা পাঠ্যক্রমকে একেবারে লোপ না করে শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরিবর্তনশীল করে নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এইভাবে দেখা গেল—বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন। তাই তাঁদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণের প্রণালীও হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের।

মোটকথা, পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার লক্ষ্যটি নিরূপিত হয়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, দেশটাকে কিভাবে গড়তে চাই, তার ছাঁচটাই হচ্ছে পাঠ্যক্রম। তাই পাঠ্যক্রমের এত গুরুত্ব।

পরাধীন ভারতের কর্তৃপক্ষ আমাদের যেভাবে গড়তে চাইত তার পরিচয়টি রয়ে গিয়েছে সেই আমলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদের বিশাল রথখানাকে আইন শৃঙ্খলার রশি বেঁধে দেশের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার মজুর গড়তে চেয়েছিল তারা এদেশে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষগড়া নয় পরমুখাপেক্ষী চাকুরিজীবী গ্রন্থকীট গড়া। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে সেই লক্ষ্যের পরিচয় মিলবে।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটি ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যক্রম আমাদের দেশে এখন প্রচলিত আছে, মুদালিয়র কমিশন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে সাতটি বড় বড় ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন—যথা—

(১) দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যেন কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতিক্ষেত্র মাত্র। এ'ছাড়া তার আর কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই। পাঠ্যক্রমের চরম পরিণতি হল প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ অর্থাৎ কলেজে প্রবেশের একখানি ছাড়পত্র লাভ। এনট্রান্স (Entrance) বা ম্যাট্রিক্যুলেশন (Matriculation) শব্দ দুইটির মধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষার ঐ একমুখী লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে 'বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা' (School Final Examination) —এই ধরণের একটা নির্বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

(২) একান্ত পুঁথিগত :

কলেজের পাঠ্যক্রমের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে স্কুলের পাঠ্যক্রমের পুঁথির বোঝা বেড়ে গিয়েছে। তাই পাঠ্যক্রম হয়ে পড়েছে পুঁথিপ্রধান ও অবাস্তব। মাধ্যমিক স্তরের পর সব ছেলেই হয়ত উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে না, সংসারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। সেক্ষেত্রে এই পুঁথিগত বিদ্যা তাকে জীবনের পথে চলবার কোন পাথেয়ই দিতে পারবে না। কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে যে জ্ঞান লাভ হয় জীবনের ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে তা কোন কাজেই লাগবে না। তাছাড়া মানসিক শক্তিচর্চার যতটুকু ব্যবস্থা এতে রয়েছে, দৈনিক শক্তিচর্চার কোন ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন বাস্তবজ্ঞান-বিবর্জিত কতকগুলি গ্রন্থ-পণ্ডিত সৃষ্টি করা ছাড়া এর আর কোন সার্থকতা নেই।

(৩) অনাবশ্যক তথ্য ভারাক্রান্ত :

পাঠ্যক্রম খুবই বড় এবং অনাবশ্যক তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত, অথচ তার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নেই—এমন অনেক বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলি শিক্ষার্থীর কোনদিনই কোন কাজে বা প্রয়োজনে লাগবে না এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যেও তারা নেই।—অথচ শিক্ষার্থীর মানসিক গঠনের দিক থেকে অপরিহার্য এমন অনেক বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৪) ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগের অভাব :

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে হলে যে সকল বাস্তব কার্যাবলীর প্রবর্তন ও অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন, পাঠ্যক্রমে তার কোন স্থান নেই। শিশুর

সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য হাতে-কলমে নানাপ্রকার কাজ করবার দরকার এবং সেই কাজের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে।

তাছাড়া পুঁথিগত ভাবে যা কিছু তারা শিখবে সেই সম্বন্ধে যদি কাজ করবার সুযোগ তারা পায়, তবে সেই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, গ্রন্থপাঠের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পায়।

(৫) কৈশোরের প্রয়োজন অস্বীকার :

কৈশোরের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয়নি। কৈশোরে বালক-বালিকাদের নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রচলিত পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোন্ ছাত্র কি চায়, কোনদিকে তার আগ্রহ, কোন সন্ধানই তার নেওয়া হয়নি বর্তমান পাঠ্যক্রমে। বরং পিতামাতা কি চায়, কর্তৃপক্ষ কি চায়, সেইগুলোই একমাত্র বিবেচ্য হয়েছে পাঠ্যক্রমে।

মানুষে মানুষে যে রুচি আগ্রহ ও ক্ষমতার পার্থক্য আছে সেটাও আদৌ স্বীকার করা হয়নি।

(৬) পরীক্ষাশাসিত :

সমগ্র পাঠ্যক্রমটি একমাত্র পরীক্ষাপাশের প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই প্রভাবান্বিত। আগেই বলেছি মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হল কলেজীয়—শিক্ষায় প্রবেশের একখানি ছাড়পত্র সংগ্রহ। ছাড়পত্র সংগ্রহের অর্থ পরীক্ষা-পাশ। তাই গাদা গাদা নোট-বই মুখস্থ করে সাধু ও অসাধু যে কোন উপায়ে হোক পরীক্ষাবৈতরণী পার হতে হবে—পাঠ্যক্রমের নির্ধারণেও এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে, স্রেফ মুখস্থের জোরেই যেন মোটামুটিভাবে পাশ করা যায়। পরীক্ষায় সফলতালাভের দ্বারাই যেন পাঠ্যক্রমের সফলতা নির্ণয় করা হয়েছে।

(৭) কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব :

কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন স্থান নেই বর্তমান পাঠ্যক্রমে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে এখন দ্রুত শিল্প-প্রসার ঘটছে। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাবে এ প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কলা, বিজ্ঞান, চারু ও কারুশিল্প, খনিজ প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকে বিভিন্নস্তরের কর্মী তৈরী করা। কিন্তু কেবল মাত্র পুঁথিসর্বস্ব পাঠ্যক্রমে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

পাঠ্যক্রম রচনার বাস্তব নীতি :

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের এই সকল ত্রুটি অসম্পূর্ণতার জন্য আমাদের পুরা শিক্ষাব্যবস্থাই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষাবিদেরা অনেক দিন থেকেই অবহিত আছেন এবং পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারেব প্রস্তাব প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশন দেশের আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচনার বাস্তব নীতি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

শিক্ষার্থীদের রুচি ও শক্তিসামর্থ্য, দেশের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক পটভূমি এই তিনের সার্থক সমন্বয়ে একটি কার্যকরী ও বাস্তবধর্মী পাঠ্যক্রম রচনা করতে হলে যে মৌলনীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে এইবার সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করি।

(১) পাঠ্যক্রম একটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা :

প্রথমেই, শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা-অনুযায়ী পাঠ্যক্রম শব্দটির সংজ্ঞা ও তার সীমানা নির্দিষ্ট করে নেবার দরকার। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের কাজ কেবলমাত্র গ্রন্থনিবদ্ধ পাঠ্যবিষয়গুলির নির্বাচন ও শ্রেণীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তার কাজ। শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয়-জীবনে যা কিছু জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য আগ্রহ এবং মানসিক শারীরিক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করবে সেই সমস্তই হবে তার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। [The curriculum may be define as the totality of subject matter, activities and experiences which constitues a pupil's school life—19th Century Year Book] গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উপযুক্ত নাগরিকরূপে শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীণভাবে গড়ে তুলতে হলে যা যা তার জানা দরকার, বোঝা দরকার এবং করা দরকার সমস্তই থাকবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে নয়, ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, গবেষণাগারে, অবসর-বিনোদনের স্থানে, মেলামেশা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে নিরন্তর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, মনে রাখতে হবে তার কোনটাই পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত নয়। মনরোর ভাষায় বলতে গেলে পাঠ্যক্রম হচ্ছে শিক্ষার্থীর জাতিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। [The curriculum is but eptomized repesentation to the child of the cultural inheritance of the race.—Monroe]

(২) কর্মকেন্দ্রিকতা :

লিখনপঠন-সর্বস্ব পুঁথিগতবিদ্যা কতখানি অবাস্তব ও নিরর্থক সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। সুতরাং পাঠ্যক্রম কেবলমাত্র পুঁথিগত বিমূর্ত চিন্তার আধার হবে না। হাতে-কলমে কাজ করবার ব্যবস্থাও থাকবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। কারণ কেবলমাত্র মস্তিষ্ক-পরিচালনায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ হয় না। যথোপযুক্ত পেশী সঞ্চালনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

[The curriculum should be thought of in terms of activity and experience rather than of knowledge to be acquired and facts to be stored—Spens' Report.]

(৩) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য :

—শিক্ষা কখনও দেশকাল নিরপেক্ষ হয় না। এই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এখানকার সামাজিক পটভূমিকে বিস্মৃত হলে সে শিক্ষা হবে অবাস্তব। তাছাড়া ভাবী নাগরিকবৃন্দকে দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক করে তুলতে হলে তারও গৌরবময় পরিচিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকা চাই।

(৪) স্বয়ংসম্পূর্ণতা :

বর্তমান পাঠ্যক্রম ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী অভিযান চলেছে কলেজীয় শিক্ষার দিকে। কিন্তু অনেক ছেলেই ত কলেজ পর্যন্ত যেতে পারবে না, মধ্যপথ থেকে যারা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে তাদের সেই স্বল্পার্জিত বিদ্যাটাও কোন কাজেই লাগবে না। এত অর্থ সামর্থ্য ও সময়ের অপচয় ছাত্রের জীবনেও ক্ষতিকর।

তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে বিদ্যালয় জীবনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূমিকামাত্র না হয়ে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রচিত হয়। জুনিয়র হাই স্কুলের পাঠ্যক্রমেও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করে চলতে হবে। এই শ্রেণী পর্যন্তই আমাদের দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা। সুতরাং এর পাঠ্যক্রমও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রচনা না করলে মাঝপথে থেমে-যাওয়া অগণিত ছাত্রের অপরিমিত অপচয় ঘটবে।

(৫) ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্য :

বর্তমান যুগের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথাই হল শিশুকে শিক্ষার

উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা না করে শিক্ষাকেই শিশুর উপযোগী করতে হবে। অর্থাৎ, বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের ব্যক্তি-বৈষম্য (individual difference) অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের স্বাধীনতা পায়।

কিশোরকালের পরের থেকেই ব্যক্তিগত রুচি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। তাই পাঠ্যক্রমের ৮ম শ্রেণীর পর এমন কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন, যার ভিতর থেকে শিক্ষার্থী তার রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বিষয়-নির্বাচন করে নিতে পারে।

কিন্তু সমস্ত বিষয়ই ত শিক্ষার্থীর পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকেও এমন কতকগুলি বিষয় থাকবে, যেগুলি অবশ্য-পাঠ্য।

পাঠ্যক্রমে তাই শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন উভয়েরই সমন্বয় করা হবে দুই জাতীয় বিষয় সন্নিবেশ করে। তাতে থাকবে অল্প করে কয়েকটি অবশ্য-পাঠ্য কেন্দ্রীয় বিষয় (core subject) এবং অনেকগুলি বৃত্তস্থ নির্বাচন-যোগ্য ঐচ্ছিক বিষয় (periphery subjects)।

(৬) বাস্তব মূল্যায়ন ঃ

পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেগুলির নিজস্ব বাস্তব মূল্য বিচার করেই তা করা হবে। মানসিক শৃঙ্খলাসাধনের তত্ত্ব (disciplinary value) অথবা শিক্ষায় সঞ্চরণ-তত্ত্বের (Transfer of Training) দিকে লক্ষ্য রেখে কোন বিষয় গ্রহণ করা হবে না।

জীবনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে, সেইগুলিই মাত্র গ্রহণ করা হবে, অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বাহুল্যে পাঠ্যক্রমকে অযথা ভারাক্রান্ত করা চলবে না।

(৭) পরিবেশ ঃ

পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে যে সমাজে ও যে পরিবেশে তা প্রচলিত হবে তার কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামাঞ্চলে যে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন, শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে তার প্রয়োজন তা থেকে স্বতন্ত্র। পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের সময় এই পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তা ও

দাবীকে উপেক্ষা করে চললে সে পাঠ্যক্রম হবে একান্ত অবাস্তব। সেইজন্য পাঠ্যক্রম হবে যথোচিত নমনীয় (flexible), পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য। এককথায়, সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সার্থক সমন্বয় ঘটবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে।

(৮) অনুবন্ধ প্রণালী :

বর্তমানে পাঠ্যবিষয়ের আধিক্যে পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। Compartmentation of subjects অর্থাৎ পরস্পর-সম্বন্ধহীন বিষয়-বাহুল্য ছাত্রের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে।

বিভিন্ন বিষয় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধহীনভাবে ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় বলেই পাঠ্যক্রমকে এত গুরুভার মনে হয়। অথচ অনুবন্ধ-প্রণালীতে শিক্ষা দিলে সমজাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিষয়-বিভাজন নীতির শিক্ষার চাপ (teaching load) অনেক কমে যায়।

মুদালিয়র কমিশন পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত সমজাতীয় কতকগুলি বিষয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করবার কথা বলেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিক বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে না পড়িয়ে সমাজ পরিচিতি (Social studies) নামে একটি বিষয় হিসাবে গণ্য করলে পড়ার চাপ অনেক কমে যায়। কারণ এই সব বিষয়গুলিই মানব-সমাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণ-বিজ্ঞান (general science) নামে একশ্রেণীভুক্ত করা যায়।

(৯) অবসর বিনোদন :

মানবজীবনে কাজের যেমন প্রয়োজন আছে, বিশ্রামেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। অবসর কাজের বিপরীত নয়, কাজের পরিপূরক। ভাল ভাবে কাজ করতে যেমন শিখতে হয়, তেমনি ভাল ভাবে অবসর-বিনোদন করতে জানাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা ভবিষ্যতে যেন সুরুচিসঙ্গতভাবে অবসর-বিনোদন করার শিক্ষা বিদ্যালয় থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের কর্মবহুল জীবনচক্রে আবর্তিত হতে হতে মানুষের জীবন তার সমস্ত মাধুর্য হারিয়ে ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তাই

কর্মজীবনের মধ্যে যখন অবসর আসে তখন কর্মহীনতার শূন্যতা জীবনকে লক্ষ্যহীন করে তোলে। এরই হাত থেকে অব্যহতি পেতে হলে চাই সুসঙ্গত অবসর-যাপনের সার্থক শিক্ষা। খেলাধূলা, গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন বা ঐ জাতীয় কোন ললিতকলার চর্চা, বাগান-তৈরী ইত্যাদি কোন একটা আনন্দময় কাজের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা খেয়াল (hobby) অবসর-সময়ে ছুটির আনন্দ এনে দিতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেব মধ্যে এদের স্থান থাকা একান্ত আবশ্যক, যাতে বাল্যকাল থেকেই মানুষ তার রুচি-অনুসারে কোন একটা সুন্দব খেয়াল (hobby) অভ্যাস করে নিতে পারে।

(১০) মনস্তত্ত্বনির্ভর :

সবশেষের কথা এবং চরম কথা হল পাঠ্যক্রম নিছক যুক্তিতত্ত্বের (logic) উপর ভিত্তি করে না গড়ে মনস্তত্ত্বের (Psychology) উপর নির্ভর করে গড়তে হবে। শিশুমন ও কিশোরমনকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গড়ে উঠেছে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। সুতরাং পাঠ্যক্রমের মূলনীতিগুলি যদি সেই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে পাঠ্যক্রম-রচনাটা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(১১) বৃত্তি-পরিচিতি :

সাধারণ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে অবশ্য বৃত্তিশিক্ষার কোন নিগূঢ় সম্পর্ক নেই তবু পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিল্প সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-দানের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

একে ঠিক বৃত্তিশিক্ষা বলা না। ছাত্রের নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পেব কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু পরিচয় থাকাতে ভবিষ্যতে বৃত্তি-নির্বাচন করবার হয়ত সুবিধা হতে পারে।

(১২) অবিভাজ্যতা :

আগেই আমরা বলেছি শিক্ষার উদ্দেশ্য গ্রন্থ-পণ্ডিত তৈরী করা নয়, পুরাপুরি মানুষ (whole man) তৈরী করা। এই দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বিষয়গুলি খণ্ডিত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিবেশিত হলেও তার একটা সামগ্রিক রূপ যেন কখনও নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ একশ্রেণীর পাঠ্যক্রমের পরে পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্যক্রম যেন একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক

ভাবেই আসে এবং এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অভিজ্ঞতার একটা ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।

অবশ্য জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন বিষয়ের ছাপ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায় না। অভিজ্ঞতা অখণ্ড, তাকে খণ্ডিত করে দেখলে সে দেখা হয় কৃত্রিম। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য তাকে খণ্ডিত ভাবে দেখলেও সেগুলি যে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, পাঠদানের সময়ে সেটি সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

(১৩) পরিবর্তনশীলতা :

প্রথমেই বলেছি, পাঠ্যক্রম বলতে আজকাল ঘোড়দৌড়ের পথ না বলে শিকার খোঁজার পথ বলে মনে করা হয়। এ'কথার তাৎপর্যও আগে ব্যাখ্যা করেছি। লক্ষ্যটি স্থির-নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার রাস্তা প্রয়োজনানুসারে বারবার পরিবর্তন করা চলতে পারে। পাঠ্যক্রম ত শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথ মাত্র। প্রয়োজন-অনুযায়ী সেই পথের পরিবর্তন অবশ্যই করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিগত রুচি সামর্থ্যের পার্থক্য রয়েছে, প্রত্যেকটি শিক্ষকেরও পাঠদান-পদ্ধতির বৈচিত্র্য আছে এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েও পরিবেশঘটিত বিভিন্নতা আছে, সেই ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম যদি অনড়, অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে তা একান্ত কৃত্রিম ও জড়ধর্মী হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

সুতরাং পাঠ্যক্রম এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ছাত্র, শিক্ষক ও পরিবেশ এই তিনের প্রয়োজন-অনুসারে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা যেতে পারে।

(১৪) অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক :

পাঠ্যক্রম-নির্মাণ অর্থে কেবলমাত্র গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞানের শ্রেণীকরণ নয়, অথবা বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের তালিকা-প্রণয়ন করাও নয়। বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যে নানাবিধ খেলাধূলা কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র যতপ্রকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেগুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। পুস্তকপাঠের মধ্যে দিয়েও ছাত্রেরা অবশ্য নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কিন্তু কর্মের মধ্যে দিয়ে যে-সব বাস্তব অভিজ্ঞতা তারা সংগ্রহ করে তার মূল্য সমধিক। তাই পাঠ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের বা গ্রন্থ নিবদ্ধ বিষয়ের তালিকা সন্নিবেশিত না করে বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার কাজকর্ম বা সহপাঠক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করা দরকার।

পরিশেষে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জেমস্ এবং ল্যাং পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মূলনীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে অল্প একটি কথায় পাঠ্যক্রমের যে একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সেটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁরা বলেন, মানুষকে যুগপৎ সংস্কৃতিপরায়ণ ও সামাজিক দায়িত্বশীল নাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে সে সব বিষয়, অবস্থা, পরিবেশ ও কর্মকৌশলের প্রয়োজন, তারি সার্থক নির্বাচন হচ্ছে পাঠ্যক্রম। এই ছোট সংজ্ঞাটির মধ্যেই পাঠ্যক্রমের মূলনীতিটি বলা হয়ে গেল।

[The fundamental principle of an educational curriculum is the selection of materials along with the planning of situation, activities, and sequences, so that from the learner's reactions to these organised experiences will accrrue significant information useful habits, and such emotionalised outcomes as are considered essential to personal culture and social participation. —James and Lang.]

পরীক্ষা

(Examination)

পরীক্ষা কেন ?

বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষাদান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে তাদের বয়স রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু এই শিক্ষাদানকার্য কতটা সফল হল, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত শিক্ষা কি পরিমাণ গ্রহণ করতে পারল তারও একটা পরিমাপ করা প্রয়োজন। এই পরিমাপ কার্যই হল পরীক্ষাগ্রহণ। এই হিসাবে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ এই দুটি কার্যই অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। প্রথম কার্যটির সফলতা-বিফলতার বিচার হবে দ্বিতীয় কার্যটির দ্বারা। এই বিচারের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে দেখতে পারি—

প্রথমতঃ **বিদ্যালয়ের দিক**। বিদ্যালয় তার শিক্ষাদান কার্যে কি পরিমাণ সার্থক হল, কোন ছাত্রটির শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু, কে কোন্ বিষয়ে কতটা পেছিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিদ্যালয় তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবে না। পরীক্ষার মানদণ্ডে বিচার করে তবেই বিদ্যালয় তার সামগ্রিক উন্নতি-অবনতির হিসাব করাত পারবে। এই হিসাবে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ **ছাত্রের দিক**। ছাত্রের পাঠোন্নতির পরিচয় বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের জানা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছাত্রের নিজের জানার। ছাত্র পড়াশুনা করে, নানাবিধ জ্ঞানের কথা আহরণ করে, কিন্তু সেই পড়াশুনা কতটুকু তার কাজে লাগছে, সেই জ্ঞান কতটুকু তার আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে, তার খবর পাওয়া যাবে একমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে।

তৃতীয়তঃ **অভিভাবকের দিক**। অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিদ্যালয়ে দিয়েছেন, বিদ্যালয় সেই কাজ কতটা করতে

পারছে এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণে কতটা উপকৃত হচ্ছে তারও পরিচয় মিলবে পরীক্ষার ফলে।

চতুর্থতঃ **সরকার বা কর্তৃপক্ষের দিক**।—সরকার তাঁর প্রজাবৃন্দের শিক্ষোন্নতির জন্য অর্থব্যয় করেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, কিন্তু সেই অর্থব্যয় কতটা সার্থক হচ্ছে তার খবর কর্তৃপক্ষের জানা দরকার। পরীক্ষার ফলের সাহায্যেই সেই খবর পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ **সমাজের দিক**। বিদ্যালয় একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজের একটা গুরুদায়িত্ব পালনের ভার বিদ্যালয়ের উপর। সেই দায়িত্ব কি পরিমাণে পালিত হচ্ছে, সেকথা জানবার অধিকার আছে সমাজের। বলাই বাহুল্য, পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যেই সমাজ সেই কথাটি জানতে পারে।

পরীক্ষাপ্রথার ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

যতদিন থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু শিক্ষা দেবার প্রথা শুরু হয়েছে পরীক্ষাপ্রথাও ততদিন থেকেই চলে আসছে, মনে করা যেতে পারে। তিন চার হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে ব্যাপকভাবে পরীক্ষাপ্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তারো আগে কোথায় কি ছিল তার কোন ইতিহাস নেই। প্রাচীন ভারতে, গ্রীসে, রোমে, বা অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে গুরু শিষ্যের আলাপ-আলাচনার, উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে অতীত বিদ্যার যাচাই হত। মধ্যযুগে ইয়োরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই পরীক্ষা সাধারণতঃ গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করে বা মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হত। এখনবার মত লিখিত পরীক্ষার প্রথা খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে এই প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় এবং তারপর থেকেই সমগ্র দেশে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। আমাদের দেশে গত শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে এই প্রথা সম্ভবতঃ শুরু হইয়াছিল। সেই থেকে আজ অবধি একই ভাবে চলে আসছে এই প্রথা। স্কুল-কলেজে প্রশ্নের লিখিত উত্তরের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে নিম্নশ্রেণীতে লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে প্রায় সবদেশেই।

পরীক্ষা-গ্রহণের সার্থকতা ঃ

পরীক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তার

সার্থকতা কী ? পরীক্ষার দ্বারা আমরা কি জানতে পারি, কতটুকু জানতে পারি এ সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পরীক্ষা-প্রথার সবচেয়ে **প্রধান উদ্দেশ্য** হল অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের কতটুকু জ্ঞান শিক্ষার্থীর আয়ত্তে এসেছে পরীক্ষার দ্বারা তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। স্কেল ফেলে যেমন বিভিন্ন জিনিসের ওজন বা দৈর্ঘ্য মাপা যায়, পরীক্ষা-প্রথার স্কেলেও তেমনি অর্জিত জ্ঞানের মাপ ঠিক করা হয়। একই শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যেও একটা তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় পরীক্ষার সাহায্যে।

পরীক্ষা প্রথার **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য** হল উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা যাচাই করা। এক বৎসর পঠন-পাঠনার পরে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করবার সময়ে ছাত্রদের মানসিক সামর্থ্যের পরিমাপ করা প্রয়োজন। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে কিনা তা বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখে যাচাই করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনান্তে কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ততা কি পরিমাণে অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করবার জন্য আমাদের দেশে ম্যাট্রিক্যুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা। ম্যাট্রিক্যুলেশন বা এণ্ট্রান্স কথাটির অর্থই হল প্রবেশিকা, অর্থাৎ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের প্রবেশপত্র। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সেখানে কেবলমাত্র অতীত উন্নতির পরিমাপ নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিচার। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পরীক্ষা শিক্ষার নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে প্রবেশের মুখে অযোগ্যপ্রার্থী ছাঁটাই করতে কাজে লাগে।

পরীক্ষার **তৃতীয় উদ্দেশ্য,** দেশের কাজে যোগ্যতার কর্মী নির্বাচনে সহায়তা করা। দেশের কার্য পরিচালনায় সরকারী বা বেসরকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানে যখন কর্মী নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন একমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই নিরপেক্ষভাবে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ্য প্রার্থীদের গুণানুসারে তালিকা প্রণয়ন করাও হয়ে থাকে।

পরীক্ষার **চতুর্থ উদ্দেশ্য,** শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার। ছাত্রের যোগ্যতা বিচারের কথা ত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা কেবল যে ছাত্রের যোগ্যতাই নিরূপিত হয় তাই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষকের যোগ্যতাও নিরূপিত হয়ে থাকে।

শিক্ষক কিভাবে শিক্ষাদানের কর্তব্য পালন করেছেন তার পরিচয় পাওয়া

যাবে ছাত্রদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ দ্বারা। সুতরাং ছাত্রের পরীক্ষার সুফল শিক্ষকের শিক্ষকতার কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই হিসাবে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে এককালে ছাত্রের পরীক্ষার ফলদৃষ্টে শিক্ষকদের বেতন দেবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশে টোলে অদ্যাবধি এই জাতীয় প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। তাছাড়া অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা না থাকলেও বিদ্যালয়ের যোগ্যতা নিরূপিত হয় পরীক্ষার ফলের নিরিখ ধরেই। এবং সেই নিরিখ-অনুযায়ী বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন লাভ করে। পর পর কয়েক বছর কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়ে গেলে সরকার সেই বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারেন।

পরীক্ষার **পঞ্চম উদ্দেশ্য,** ছাত্রের রুচি ও প্রবণতা বিচার। বিদ্যালয়ে বহু বিষয়ে পঠন-পাঠনা হয়—কার কোনটা ভাল লাগবে জ্ঞানের কোন পথে গেলে কোন শিক্ষার্থী উন্নতি করতে পারবে, এই সমস্ত বিষয়ের পথপ্রদর্শক হচ্ছে পরীক্ষার ফল। যে ছেলে অঙ্ক বা বিজ্ঞান বিষয়ে ভাল করতে পারে না, অথচ সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষার ফল দেখায়, সেই ছেলেকে জোর করে ইঞ্জিনিয়াব করতে চাইলে ভুল হবে। এই দিক দিয়ে পরীক্ষা প্রথা শুধু অতীত জ্ঞানের খবরই রাখে না, ভবিষ্যৎ জ্ঞানেরও পথ দেখায়—

ষষ্ঠ উদ্দেশ্য, হিসাবে বলা যায় পরীক্ষার মাধ্যমে অতীত বিদ্যার পরিচয় ছাড়াও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুততা, চিন্তাশীলতা, সংযম প্রভৃতি গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তম উদ্দেশ্য, অতীত বিদ্যা বার বার অনুশীলন দ্বাবা মার্জনা করা। সাধারণতঃ দেখা যায় ছেলেরা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠনার সময়ে তেমন আগ্রহশীল নয়। পরীক্ষার সময়েই তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়ে, পুরানো পাঠের জোর অনুশীলন চলে।

অষ্টম উদ্দেশ্য, পাঠ্যগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে পাঠাতিরিক্ত বহুবিষয়ে পঠন-পাঠনা করবার উৎসাহ দান। পরীক্ষায় ভাল করিবার জন্য সাধারণতঃ উৎসাহী ছেলেমেয়েরা নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করতে উৎসাহিত হয়।

পরীক্ষার কুফল ও তার প্রতিকার ঃ

এতক্ষণ ধরে পরীক্ষা-গ্রহণের যে সব বিভিন্ন প্রকার সুফলের কথা আলোচনা করা হল, কার্যক্ষেত্রে আমাদের দেশে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। বরং অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই প্রায়

বানচাল হয়ে যাবার অবস্থা ঘটেছে। আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটি আজ পরীক্ষা-প্রথা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং সেই পরীক্ষা-প্রথাটি আবার প্রশ্নপত্র বাছাই করে মুখস্থ করবার অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা-সংস্কারকেরা যত পরিকল্পনাই করুন পরীক্ষা-প্রথার প্রভাবে পড়ে তা সবই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আজ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যতগুলি কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা-ব্যবস্থার অবাঞ্ছিত প্রভাব দেখে শঙ্কিত হয়েছেন। এবং বারবার তার সংশোধনের কথা বলে গিয়েছেন—তবু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি।

স্যাডলার কমিশন বলেছেন—'বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই হল চাকরি সংগ্রহের প্রধান উপকরণ। তাই এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির ছাড়পত্রসংগ্রহ। সুতরাং শিক্ষাসংস্কারের জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হল পরীক্ষা সংস্কারের।

পরীক্ষার কুফল দেখে কোন কোন সংস্কারক পরীক্ষা-প্রথাটাই একেবারে উঠিয়ে দেবার কথা বলেছেন। কেউ কেউ বহিস্থ পরীক্ষার পরিবর্তে অন্তস্থ পরীক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন। মোটকথা, বর্তমান পরীক্ষা-প্রথার আমূল সংস্কারের কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন—রাধাকৃষ্ণ-কমিশন বলেছেন—শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র সংস্কার করতে হয় তাহলে সেটি হবে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার। পরীক্ষা-প্রথা একেবারে উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব না হলেও অবিলম্বে তার যথোচিত সংস্কার প্রয়োজন।

[···If we are to suggest one single reform in university education it should be that of examinations···dissatisfaction with examinations, has been so keen that eminent educationists and important educational organizations have been advocated the abolition of examination. We do not share the extreme view and feel that examinations rightly designed and intelligently used can be a useful factor in the educational process. If examinations are necessary, a thorough reform of these is still more necessary.—The report of the Univ. Edu. Com. (1948-49)].

মুদালিয়র কমিশনও পরীক্ষার গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করবার কথা সুপারিশ করেছেন। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতির ত্রুটি হিসাবে উল্লেখ করা যায়—

(১) সারা বছর ধরে যে জ্ঞান-অর্জন করা গেল বৎসরের শেষে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তার বিচার করবার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না।

পাঠগ্রহণের পরিবেশ ও পরীক্ষাদানের পরিবেশ একেবারেই বিভিন্ন, সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষার্থীর মন কখনই স্বাভাবিক ভাবে উত্তরদানে উন্মুখ থাকতে পারে না।

(২) শেষ পরীক্ষার ঘণ্টা তিনেক প্রচেষ্টার উপর সারা বৎসরের মূল্যায়ন হয় বলে পরীক্ষা কক্ষে নানাবিধ অসাধু উপায়ের উদ্ভব ঘটে। যেমন তেমন করে গোটা তিন চার প্রশ্নের উত্তর-ব্যবস্থা করতে পারলেই যেখানে অনিবার্য সফলতা, সেখানে জ্ঞানার্জনের অবিচ্ছিন্ন সাধনা একান্ত বাহুল্য বলে মনে করা স্বাভাবিক। পরীক্ষার দিনকয়েক আগে প্রশ্ন বাছাই করে রাত জেগে নোট মুখস্থ করে নকল করে যেন-তেন-প্রকারে পরীক্ষার বেড়াটা টপকে যাবার সাধনায় মেতে ওঠে ছেলেরা।

(৩) সবচেয়ে দুঃখের কথা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারাটা একান্ত ভাবেই পরীক্ষা-শাসিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচার হয় আজকাল পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট সংগ্রহের দ্বারা। তাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে পুরাতন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ওয়েষ্ট সাহেব তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেন পেনিলোপির জাল। একদিক দিয়ে শিক্ষা সংস্কারকেরা তা গড়ে তুলতে চাচ্ছেন, অন্য দিক দিয়ে পরীক্ষকেরা তা দিচ্ছেন ভেঙ্গে। (Education is like the webs of Penelope—what teachers do ; the examiners undo.) সুতরাং শিক্ষা-সংস্কারের মূল কথাটাই হল পরীক্ষা-সংস্কার। তা নইলে কোন সংস্কারই কার্যকরী হবে না। এ বিষয়ের শ্রী হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"—অমোদের শিক্ষাপদ্ধতিতে পরীক্ষার মর্যাদা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়েছে। ছাত্র উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করেছে কিনা তার বিভিন্ন বৃত্তির

যথোপযুক্ত বিকাশ হয়েছে কিনা তা জানবার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষাই ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ……ফলে ছাত্রছাত্রীরা সারা বৎসর লেখাপড়ায় অবহেলা করে এবং পরীক্ষার ঠিক আগে কয়েক সপ্তাহ দিনরাত খেটে পরীক্ষা সাগর পাড়ি দিতে চায়। পরীক্ষায় যে-সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার বাইরে জ্ঞানজগতের দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতে চায় না। ফলে কোন বিষয় ঠিক ভাবে আয়ত্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।…"

মোটকথা, ছাত্রের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি-অবনতির কোন সন্ধান না নিয়ে গুটিকতক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের ক্ষমতাই যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তা হলে কোন প্রকারে পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের ব্যবস্থা করার দিকেই পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ হবে বেশী। তার ফলেই আসবে 'না বুঝে মুখস্থ করার' বদঅভ্যাস—বাছাই করে পড়ার বদঅভ্যাস, এমন কি পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনের বদঅভ্যাস।

পরীক্ষায় যা আসবে না, জানার দিক দিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই ছাত্রদের কাছে। শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় ঢেলে দিয়ে আসতে পারলেই বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে সে পাবে সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ সার্থক ভাবেই বলেছেন—"পরীক্ষার ঘরে যে ছেলে চাদরের মধ্যে লুকাইয়া বই লইয়া যায় সে পায় শাস্তি, আর যে ছেলে তার চেয়ে খারাপ, মগজের মধ্যে লুকাইয়া বই লইয়া যায়, সে পায় পুরস্কার—"

মোটকথা পরীক্ষা-শাসিত পড়ায় পরীক্ষার জন্যই পড়া, পড়ার জন্য পরীক্ষা নয়। (Work is to meet the examination and not examination to test the work—Wren)—এই দোষ দূর করবার জন্য রেন সাহেব প্রস্তাব করেছেন প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে নিজস্ব কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকলে সম্পূর্ণ উত্তর করা যাবে না। পরীক্ষার হলে পাঠ্য-পুস্তক ব্যবহারে অনুমতি দিলে এবং তা থেকে নিজস্ব মন্তব্য দেবার কথা জিজ্ঞাসা করলে নির্বোধ মুখস্থের স্থান থাকবে না।

কুইক্ সাহেব ত প্রস্তাব করেছেন অঙ্ক, অনুবাদ, রচনা এই সব স্বাধীন চিন্তার বিষয়গুলি প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা হোক আর আর ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি ঘটনামূলক বিষয়গুলি শেষ-পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করাই ভাল।

মুদালিয়র কমিশনও কতকগুলি বিষয় পড়ার জন্য সুপারিশ করেছেন কিন্তু পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে বারণ করেছেন।

পরীক্ষার প্রকার ভেদ ঃ

এতক্ষণ ধরে পরীক্ষাপ্রথার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা গেল। আগেই বলেছি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গই হল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা-কার্যটি আমাদের দেশে কিভাবে পরিচালিত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করলে তবেই পরীক্ষাপদ্ধতির সার্থকতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

পরীক্ষা সাধারণতঃ পরিচালিত হয়ে থাকে দুইভাবে—(১) **লিখিত ভাবে ও মৌখিক ভাবে**।

আজকাল অধিকাংশ পরীক্ষাই লিখিত ভাবে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসে যে সব উত্তর দিয়ে থাকে, পরীক্ষক অবসর সময়ে তা পড়ে তা থেকে যোগ্যতা নিরূপণ করেন।

মৌখিক পরীক্ষায় বিচার সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণতঃ শিশু শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কারণ তখনও তারা ভাল করে লিখতে শেখেনি বা লেখা প্রশ্ন পড়ে মানে বুঝতে শেখেনি। বড়দের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাতেও মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে। কারণ লিখিত উত্তরের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যেই। তাই প্রতিযোগিতামূলক চাকরির ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার (viva voce) মূল্য এত বেশী! তারপর পরীক্ষা-পরিচালনার দিক থেকেও একে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) **অন্তস্থ** (internal) **পরীক্ষা**, (খ) **বহিস্থ** (external) **পরীক্ষা**।

(ক) বিদ্যালয় যখন নিজস্ব পরিচালনায় পরীক্ষা ক'রে তার ছাত্রদের উন্নতি-অবনতির পরিমাপ করে তখন সেই পরীক্ষাকে অন্তস্থ পরীক্ষা বলা হয়। বার্ষিক ক্রমোন্নতির বিচার সাধারণতঃ অন্তস্থ পরীক্ষার সাহায্যেই গৃহীত হয়ে থাকে। তাছাড়া সাপ্তাহিক ত্রৈমাসিক পরীক্ষার দ্বারাতেও বিদ্যালয় তার ছাত্রদের ক্রমোন্নতির ধারা সম্বন্ধে অবহিত থাকে।

(খ) বহিস্থ পরীক্ষা পরিচালিত হয় বিদ্যালয়ের বাইরের কোন একটি

স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। একই প্রশ্নপত্রের দ্বারা একই মাপ অনুযায়ী বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উন্নতির পরিমাপ করাই হল বহিস্থ পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

অন্তস্থ পরীক্ষার দ্বারা বিদ্যালয় তার নিজের ছেলেমেয়েদের মান নির্ণয় করে। এই মান বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পক্ষে বিভিন্ন হতে বাধ্য—সুতরাং এর দ্বারা দেশের সমগ্র পরীক্ষার্থীর তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় না। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, জেলা স্কুল বোর্ড বা ঐ জাতীয় সরকার-অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা দ্বারা বহু বিদ্যালয়েব ছাত্রদের মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার চলে। এবং কোন একটা নির্দিষ্ট মান-অনুসারে সকল ছাত্রের পাঠোন্নতির পরিমাপ করা চলে। এই পরীক্ষায় অনেকগুলি বিদ্যালয়েব ছাত্রছাত্রী যোগ দিতে পারে বলে একে সার্বিক পরীক্ষাও (Public examination) বলা হয়।

বহিস্থ পরীক্ষারই আর একটি প্রকার ভেদ হল **প্রতিযোগিতামূলক** (Competitive) **পরীক্ষা**। নির্দিষ্ট চাকুরিতে লোকনিয়োগের জন্য সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।—এই জাতীয় পরীক্ষায় কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হওয়াই বড় কথা নয়, প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হওয়াই হল উদ্দেশ্য।

সরকার থেকে নানা রকম বৃত্তিমূলক কাজে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় বুদ্ধিমান ছেলেদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়—এবং জ্ঞানচর্চারও প্রসার ঘটে।

প্রশ্নপত্রের মাননির্ণয় ঃ

পরীক্ষার মূল কথাই হল প্রশ্নপত্র নির্মাণ।

কোন কিছু পরিমাপ করতে গেলে প্রথমেই দরকার একটা নির্দিষ্ট মাপক। মাপকাঠি যতই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য হয়, মাপকের গণনা ততই নির্ভুল হবার সম্ভাবনা। পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র হচ্ছে সেই মাপক দণ্ড, যার সাহায্যে আমরা অর্জিত বিদ্যার পরিমাপ করি। সুতরাং প্রশ্নপত্রকে নির্ভুল মাপক হিসাবে তৈরী করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability)—যে মাপকাঠি দিয়ে মাপা হচ্ছে সেটা অবশ্য নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। একটা নির্দিষ্ট কাপড়ের টুকরো গজ-

কাঠি দিয়ে মাপতে গেলে যদি দেখা যায় একবার সেটা তিন গজ হচ্ছে, আর একবার হচ্ছে দুই গজ তাহলে বুঝতে হবে গজ-কাঠিটা নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য নয়। পরীক্ষার একই খাতা একজনের কাছে ৫০ আর একজনের কাছে ৪০ পেলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-রূপ মাপকাঠিটাকে আদৌ নির্ভরযোগ্য বলা চলবে না।

(২) **সত্যতা** (Validity): যে জিনিসটা মাপতে চাচ্ছি সেটি ছাড়া অন্যকিছু মেপে বসলে মাপটা সত্য মাপ হল না। চাল মাপতে গিয়ে সেই সঙ্গে চালের বস্তার ওজনটাও যদি ধরে নি তাহলে চালের সত্য মাপ পেলাম না। ইতিহাস-জ্ঞানের পরীক্ষা করতে গিয়ে ভাষার বাহাদুরি, বর্ণনার কৌশল, হস্তাক্ষর ইত্যাদির দ্বারা যদি ইতিহাস-জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রভাবিত হয় তাহলে তার সত্য বিচার হল না।

(৩) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity): মাপকাঠিটা এমন হওয়া দরকার যাতে রাম শ্যাম যদু যে যখনই মাপুক মাপটা যেন এক থাকে। রামের কাছে যেটা তিন সের শ্যামের কাছে সেটা দুই সের হলে মাপকাঠিটা ভুল আছে, বুঝতে হবে। রামবাবু বড় ভাল লোক, যে খাতায় তিনি ৬০ নম্বর দিলেন কড়ালোক শ্যামবাবু তাতেই ৩০ নম্বরের বেশী দিতে চাইলেন না। পরীক্ষার মাঝে ব্যক্তিগত মন মেজাজ মর্জির প্রভাব পড়লে সত্যকার মূল্যায়ন ঠিক হবে না।

আদর্শ মাপকাঠির এই সব গুণগুলির কথা স্মরণ রেখে বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি যে ভাবে চলেছে তার আলোচনা করা যেতে পারে। পরীক্ষাপদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

যথা—(১) পুরাতন পদ্ধতি (old type) বা ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (subjective type) বা রচনাধর্মী পদ্ধতি (essay type)

(২) নূতন পদ্ধতি (new type) বা বস্তুমুখী পদ্ধতি (objective type)

(৩) প্রয়োগসিদ্ধ বা আদর্শীকৃত মানের পদ্ধতি (standardised type)

বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি ও তার সমালোচনা:

(১) এদের মধ্যে পুরাতন বা রচনাধর্মী পদ্ধতিই আজকাল বহুল প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নের যে সব উত্তর চাওয়া হয় তা রীতিমত রচনার ঢঙ্গে লিখতে হয়। পরীক্ষক পরে সেই রচনা পাঠ করে তা থেকে

পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমানের এই রচনা-নির্ভর পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই একেবারে ব্যর্থ হচ্ছে বলে সকল শিক্ষাবিদ একমত। কারণ এই জাতীয় পরীক্ষার বিচার আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

পরীক্ষাপদ্ধতি দুটো অংশে বিভক্ত—প্রথমতঃ পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র রচনা ও দ্বিতীয়তঃ উত্তরপত্র পরীক্ষা। এই দুইটি অংশেই প্রচুর ত্রুটি, প্রচুর গলদ রয়েছে। আদর্শ মাপকাটির যে তিনটি অপরিহার্য গুণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দেখা যাবে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে তার কোনটাই নেই।

প্রথমেই বলি **প্রশ্নপত্র** রচনার কথা।

(১) প্রথমতঃ, রচনাধর্মী পরীক্ষার এক-একটি প্রশ্নের উত্তরে অনেকখানি করে লিখতে হয় বলে অধীত বিষয়ের অতি সামান্য অংশই পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা যায়। ১০০ নম্বরের জন্য হয়ত দুই-তিনটি পাঠ্যপুস্তক থাকে এবং তা থেকে পাঁচ-ছয়টি মাত্র প্রশ্ন দেওয়া চলে। যে ছেলেটি খুব অল্প পড়েছে অথচ ভাগ্যক্রমে তার পড়ার মধ্যে থেকে বেশী প্রশ্ন পেয়ে গেল সেই ভাল ছেলে বলে গণ্য হল। আর যে ছেলেটি অনেক পড়েও ঠিক প্রশ্নটি লাগাতে পারল না সে ফেল করে বসল। সুতরাং পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ লটারি খেলার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাই এই জাতীয় পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের নির্বাচন পরীক্ষার্থীদেব একটা প্রধান করণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের এই দুর্বলতার ও পরীক্ষার এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে দেশে শত শত নোট, প্রশ্নোত্তরিকা, সিয়োর সাকসেস্ জাতীয় বাজে বইয়ে বাজার ছেয়ে গেল। পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কার না করলে এর হাতে থেকে নিষ্কৃতি নেই।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি সংস্কার পছন্দ অপছন্দের ছাপ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নপত্রের উপর পড়ে। সুতরাং কে প্রশ্ন করেছেন জানলেই কি ধরণের প্রশ্ন হবে সে সম্বন্ধে বেশ আন্দাজ করা যায়। এই সুবিধে অন্তস্থ পরীক্ষায় যতটা আছে, বহিস্থ পরীক্ষায় ততটা নেই। তাই অনেক অন্তস্থ পরীক্ষার ভাল ছেলে বহিস্থ পরীক্ষায় তেমন সুবিধা করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রশ্নপত্র-রচয়িতার যদি পরীক্ষার্থীদের মান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না

থাকে তবে প্রশ্নপত্র প্রায়ই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন বা পাঠ্যবহির্ভূত বলে পরীক্ষার্থীরা হৈ-চৈ লাগায়।

চতুর্থতঃ, পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট কিন্তু প্রশ্নপত্র রচনার সময়ে সেদিকে বিশেষভাবে অবহিত না থাকলে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে অতি দ্রুত লিখতে পারে সে অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তর লেখে, বেশি নম্বর পায়। সুতরাং এই জাতীয় পরীক্ষায় জ্ঞানের পবিমাণ যতটুকু হয় তার চেয়ে ঢের বেশী হয় দ্রুততার পরিমাপ।

পঞ্চমতঃ, বহিস্থ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-নির্মাতা সাধারণতঃ এমন সব ব্যক্তি হন যাঁদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কোনই সংযোগ নেই। তাদের পাঠ্য ও পঠনের মান সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তাই ছাপান পাঠ্যসূচী বা পূর্ববর্তী বৎসরের প্রশ্ন দেখে তাঁরা প্রশ্নপত্র রচনা করতে বাধ্য হন। ফলে-প্রশ্নপত্র হয়ত অযথা কঠিন বা অযথা সহজ হয়ে পড়ে। কখন কখন পাঠ্য-বহির্ভূত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ষষ্ঠতঃ প্রশ্নকর্তা কি চান, অনেক সময় প্রশ্নের ভাষা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। প্রশ্নপত্রের ভাষা প্রায়ই অস্পষ্ট ও জটিল হওযায় ছাত্রদের বিভ্রান্তি ঘটে।

ভারত-সরকারের পরীক্ষাসংস্কার-কার্যের পরামর্শদাতা আমেবিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ব্লুম এখানকার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রগুলি বিচাব-বিশ্লেষণ করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করার কথা তার কোনটিই সাধিত হয় না এই জাতীয় প্রশ্নপত্রে। তিনি বলেছেন, এই জাতীয় প্রশ্নপত্রগুলি কেবলমাত্র মুখস্থ-শক্তির পরীক্ষা করে। বিভিন্ন বৎসরের প্রশ্ন আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রায় একই ধরণের প্রশ্ন বার বার আসে। হয়ত কতকগুলি প্রশ্ন প্রশ্নকর্তার বিশেষ প্রিয় তাই সামান্য ভাষার পরিবর্তন করে একই প্রশ্ন বারবার দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রশ্নপত্র-নির্মাণে চিন্তাশীলতারও কিছু মাত্র পরিচয় নেই। যেন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানর আগের দিন বসে তাড়াতাড়ি করে তা রচনা করা হয়েছে, তার পিছনে কোন যুক্তি বা পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। মনে হয় কোন রকমে বাহ্যিক নিয়মকানুন বজায় রেখে গতানুগতিক প্রথায় যান্ত্রিক উপায়ে তা রচিত হয়েছে।

[The question I found in these examination required

little more than rote memorization of some details presumably learned in the class-room. Inspection and comparision of examinations in different years revealed something of the pattern of these questions; favourite questions are repeated; slight changes are made in the wording of questions in successive years. Most of the questions appeared to be a short that might be thought on the last day or a short time before the examination-meterial was due. Rarely did I encounter questions which suggested that the paper-setter had given careful thought to the matter over an extended period of time. In short, the questions were routine and steriotyped—as though every one quite weary with the system and was mainly going through the formalities required by it—]

বলাই বাহুল্য অভিযোগগুলি গুরুতর; এবং এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচনার ফলে পরীক্ষাগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়।

এইবার **উত্তর-পত্র পরীক্ষায় ত্রুটি** সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি—

(১) এই জাতীয় পরীক্ষার মূল্যায়ন পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সংস্কার এবং মন মেজাজ মর্জির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলে তার যাথার্থ্য আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। একই উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মর্যাদা পায়। কারণ প্রত্যেকের বিচারের মন আলাদা, এমন কি একই পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্য নির্দেশিত হতে দেখা যায়। স্যাণ্ডিফোর্ড রসিকতা করে বলেছেন—এই নম্বর ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় [It (pass mark) alters from hour to hour, and does not mean the same thing before lunch as after lunch.]

এ বিষয়ে বহুদিন ধরে পরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফল সব সময়েই দেখা গিয়েছে বড় কৌতুকপ্রদ।

এজওয়ার্থ একবার একটি ল্যাটিন গদ্য রচনা ২৮ জন পরীক্ষককে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। তাতে নম্বরের পার্থক্য ৪৫ হইতে ১০০ পর্যন্ত হয়েছিল। স্টার্চ একবার একটি জ্যামিতি সমস্যার উত্তর নিয়ে ১৪৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরীক্ষা কার্য বিচার করেছিলেন, তাতে শতকরা ২০ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত তফাৎ হয়েছিল। অর্থাৎ যে উত্তরে একজন পরীক্ষক ৯০ নম্বর দিলেন

অপর জন তাতেই দিলেন ২০। জ্যামিতির মত এমন গাণিতিক সত্যের বিষয় নিয়েও যখন এত পার্থক্য তখন সাহিত্যাদি বিষয়ে যে পার্থক্য আরো মারাত্মক হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

তাছাড়া ব্যালার্ড, উড্, হার্টগ্ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আরো গবেষণা চালিয়ে প্রচুর চমকপ্রদ ফল পেয়েছেন। একই উত্তর বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম নম্বর ত পেয়েইছে, এমন কি একজনের কাছেই বিভিন্ন সময়ে নম্বরের যে পার্থক্য ঘটেছে তাও বড কম কৌতুকপ্রদ নয়। ব্যালার্ড দেখেছেন একটি উত্তর কোন পরীক্ষকের কাছে যে নম্বর পেল, কয়েক বৎসর বাদে সেই পরীক্ষকের কাছেই তা অত্যন্ত কম হয়ে গেল। দেখা যায়, কোন কারণে পরীক্ষকের মেজাজ যদি বেশ খুশি থাকে তাহলে অল্পেই খুশি হয়ে তিনি অনেক নম্বর দিয়ে দিলেন। আবার অন্য কারণে মেজাজ বিগড়ালে সেদিন ভাল লিখেও বেশী নম্বর তোলা যায় না।

সুতরাং এই জাতীয় পরীক্ষায় আদর্শ মাপকের নির্ভরশীলতা (reliability) ও নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) কোনটাই নেই।

২। খারাপ হস্তাক্ষর, বানান ভুল বা ভাষা গঠনের ভুল অনেক সময়ে পরীক্ষকের বিষয়জ্ঞান পরিমাপে গোলমাল ঘটায়। ইতিহাসের প্রশ্নে ছাত্রের ইতিহাসঘটিত জ্ঞান পরিমাপ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরোক্ত দোষ-ত্রুটির জন্য পরীক্ষকের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুতরাং ইতিহাস পরীক্ষার যে মূল্যায়ন হয় তা কেবলমাত্র ইতিহাস জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নয়। সুতরাং মাপকের সত্যতা (validity) গুণটিও নেই।

নূতন পদ্ধতি বা বস্তুমুখী পরীক্ষা-পদ্ধতি ও তার সমালোচনা

রচনাধর্মী পরীক্ষার এই সব দোষ-ত্রুটিগুলি যথাসাধ্য দূর করবার জন্য এক-প্রকার নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি (New type test) বা বস্তুমুখী (Objective) পরীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নে কোন রচনাধর্মী উত্তর লিখতে হয় না। অল্প কয়েকটি দীর্ঘ বর্ণনাশ্রয়ী প্রশ্নের পরিবর্তে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন দেওয়া থাকে। প্রশ্নগুলির উত্তরে 'সত্যমিথ্যা' 'হ্যাঁ না' বা টিক (✓) কাটা (×) চিহ্ন দিয়ে বা শূন্যস্থান পূরণ করে প্রার্থিত উত্তরটি দিতে হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং তার মূল্য নির্দিষ্ট করা থাকে। এক কথায় উত্তর হবে এবং

উত্তরটি হয় ঠিক হবে, নয় ভুল হবে, মাঝামাঝি কিছু হবে না। নম্বরও হবে পূর্ণ অথবা শূন্য। তাই পরীক্ষকের খেয়াল খুশি বা ভাল লাগা মন্দ লাগার উপর মূল্যায়নের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, স্থতরাং পরীক্ষাটা হবে একেবারেই পরীক্ষক-নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক (objective)।

তবে এই জাতীয় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময়ে পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হতে হবে। মনে করা যাক ইতিহাসের প্রশ্নপত্র রচনা করা হচ্ছে, সেখানে ইতিহাস-ঘটিত জ্ঞানকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যথা, (ক) ইতিহাসের ঘটনাবলীর জ্ঞান, (খ) বিভিন্ন ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বা পারম্পর্যের জ্ঞান, (গ) ঐতিহাসিক ঘটনাব সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের সম্বন্ধ-সূচক জ্ঞান, (ঘ) ঘটনাগুলির কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, (ঙ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান ও (চ) ঐতিহাসিক ঘটনার উপাদান ও ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়ের জ্ঞান।……এই সব বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করলে ইতিহাস-ঘটিত সকল প্রকার জ্ঞানেরই পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

নূতন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা একটি সৃজনাত্মক কাজ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশ্নকর্তা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে নূতন নূতন ধরণের প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পুস্তক, পাঠ্যসূচী ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে একথা ত বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন নানা ধরণের হয়। যথা—(i) সত্যাসত্য বিচার (True false test) (ii) শূন্যস্থান পূরণ (Completion test), (ii) সামঞ্জস্য সন্ধান (Similerity test), (iv) সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন (Multiple choice test) ইত্যাদি।

এই জাতীয় প্রশ্নে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি—

(ক) **সত্যমিথ্যা বিচার** (True False Test):

এই জাতীয় প্রশ্নে কতকগুলি তথ্যমূলক বাক্য দেওয়া থাকে, তাদের মধ্যে যেটি সত্য, সেখানে টিক চিহ্ন (✓) আর যেটি মিথ্যা সেটাতে কাটা চিহ্ন (×) দেবার নির্দেশ থাকে ; তাছাড়া যেগুলি জানা নেই সেগুলিতে (০) চিহ্ন দিতে বলা হয়।

যথা (i) গ্রীষ্মকালে আমরা পশমের জামা ব্যবহার করি—

(ii) আমরা যত উপরে উঠি ততই ঠাণ্ডাবোধ করি—

এখানে আন্দাজ করবার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত, কারণ প্রত্যেকটি উত্তর হয় সত্য,

না হয় মিথ্যা। স্থতরাং অজানা বাক্যগুলিতে আন্দাজে দাগ দিলেও শতকরা ৫০ ভাগ নির্ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই জাতীয় বিচারে যতগুলি ঠিক দাগ দিয়েছে তার সংখ্যা থেকে ভুল দাগের সংখ্যা বিয়োগ করে নম্বর দিতে হয়: এই রীতির প্রশ্ন তৈরী করাও খুব সহজ, অথচ তা থেকে জ্ঞানের পরিচয়ও সঠিক ভাবে পাওয়া যায়। স্থতবাং এই জাতীয় প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

(খ) **শূন্যস্থান পূরণ** (Completion Test):

এই জাতীয় প্রশ্নে বাক্যের কোন একটি বা দুটি শব্দ উহ্য থাকে। যথাযোগ্য শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করতে হয়। বাক্যের মধ্যে এমন শব্দ বসাতে দিতে হয় যার দ্বাবা ছাত্রদের বিষয়বস্তু-ঘটিত জ্ঞানের পরীক্ষা হয়।

(i) ফুটন্ত জলের তাপ—ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

(ii) হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া রাজধানী—স্থানান্তরিত করেন।

(খ) **সামঞ্জস্যের সন্ধান** (Similerity Tesc):

অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দের মধ্যে একটি বিজাতীয় শব্দ বসিয়ে সেটিকে চিহ্নিত করে দিতে বলা হয়—

(i) গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, দামোদর, হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র—

(ii) ম্যাগেলান, মণ্টেজুমা, কোর্টেজ, পিজারো—

(ঘ) **সম্ভাব উত্তর নির্বাচন** (Multiple Choice Test):

প্রত্যেকটি প্রশ্নের অনেকগুলি করে উত্তর লিখে দেওয়া থাকে। তার মধ্যে থেকে যে উত্তরটি ঠিক সেটিতে টিক চিহ্নিত (✓) করতে হয়—

যথা—আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়, কারণ—

(i) আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়।

(ii) আফ্রিকার ভিতরের পরিচয় বহুকাল পর্যন্ত সভ্যজগতের অজানা ছিল।

(iii) আফ্রিকায় ঘনবনের শূন্য দেশের মধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করে না।

কোন কিছু বিচারমূলক যুক্তি প্রয়োগেব ক্ষেত্রে এই জাতীয় অভীক্ষার সার্থকতা আছে।

অবশ্য এই ধরণের আর এক প্রকার অভীক্ষা তৈরী করা হয়। তাকে বলে **শ্রেষ্ঠ উত্তর** (Best Answer) নির্বাচন। তাতেও অনেকগুলি সম্ভাব্য

উত্তর লিখে দেওয়া থাকে। তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ উত্তরটি চিহ্নিত করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে এই দুটি অভীক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

প্রথমটিতে থাকবে একটি মাত্র সঠিক উত্তর আর বাকীগুলো ভুল। আর দ্বিতীয়টিতে ভুল উত্তর কোনটাই নয়, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটি ভাল বা যুক্তিসঙ্গত, সেইটে বাছাই করতে হয়। এই জাতীয় অভীক্ষায় চিন্তাশীলতা ও যুক্তিস্থাপনার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যথা—প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি হলে কি করা উচিত?

(i) সেই বাড়িতে দেখতে যাওয়া উচিত।

(ii) থানায় খবর দেওয়া উচিত।

(iii) নিজের বাড়িতে তালাবন্ধ করে সাবধানে থাকা উচিত।

(vi) দমকলে খবব দেওয়া উচিত।

(ঙ) **ঠিক করে সাজান** (Matching Test) :

এই ধরণের প্রশ্নে কতকগুলি প্রশ্ন ও তার উত্তর এলোমেলো ভাবে দেওয়া থাকে। সেগুলিকে ঠিক করে সাজিয়ে দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়

পি. সি. রায়—শ্রেষ্ঠ যাদুকর।

পি. সি. সরকার—শ্রেষ্ঠ কবি

গোষ্ঠ পাল—শ্রেষ্ঠ নট

শিশির ভাদুড়ী— শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক

নূতন পরীক্ষার সুবিধা :

(১) প্রশ্নগুলির উত্তর একেবারে সুনির্দিষ্ট। তাই তার নম্বরও হবে সুনির্দিষ্ট—হয় পূর্ণ নয়ত শূন্য। সেইজন্য পরীক্ষক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই নম্বর দিতে পাববেন—ব্যক্তিগত রুচি বা মেজাজ দ্বারা মূল্যায়ন প্রভাবিত হবে না। সুতরাং মাপকের নির্ভরযোগ্যতা এবং নৈর্ব্যক্তিক গুণ পুরামাত্রায় বজায় থাকে।

(২) এক-আধ কথায় উত্তর দিতে হয় বলে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। সেইজন্য সমগ্র পাঠ্য জুড়েই বহুসংখ্যক

প্রশ্ন ছাড়িয়ে দিতে পারা যায়। এই ধরণের প্রশ্ন আগে থেকে অনুমান করা যায় না বলে না-বুঝে মুখস্থ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

(৩) যে বিষয়ের জ্ঞানটি মাপা হচ্ছে সেই বিষয় জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছু (যথা—হস্তাক্ষর, বর্ণাশুদ্ধি, ভাষাচাতুর্য ইত্যাদি) পরীক্ষকের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই হল মাপকের সত্যতা গুণ।

(৪) উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সঠিক জ্ঞানের পরিচয় জানা যায়। ভাষার ধোঁয়ায় আসল বস্তুকে আচ্ছন্ন করে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই।

(৫) নম্বর দেওয়া এমন সহজ যে, যে কোন ব্যক্তি তা পারবে এবং তাতে নম্বরের কোনই পার্থক্য হবে না।

(৬) প্রশ্নগুলি সোজা থেকে কঠিন—এই পর্যায়ে সাজান থাকে। তার ফলে সকল ছেলেই কিছু-না-কিছু উত্তর দিতে পারে।

উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার ঃ

নূতন অভীক্ষায় এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এতে অসুবিধাও রয়েছে যথেষ্ট এবং পুরাতন পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি সুবিধা আছে, যা নূতন পরীক্ষায় নেই। যথা—

(১) নূতন পরীক্ষার একমাত্র ঘটনামূলক জ্ঞানের (factual knowledge) পরীক্ষা করা চলে। রসানুভূতির কোন পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। রচনাধর্মী পরীক্ষার সাহিত্যাদি রসানুভূতিমূলক বিষয়ের মূল্যায়ন আরো ভালভাবে করা যায়।

(২) নূতন অভীক্ষায় বিভিন্ন চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করে যুক্তি অনুসারে পর পর সাজানর ক্ষমতার কোন বিচার হয় না। অথচ জ্ঞানার্জনে এর মূল্য অপরিসীম। এর ফলে কল্পনাশক্তি, রচনাশক্তি, যুক্তিস্থাপনার শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রচনাধর্মী পরীক্ষায় সেটি পুরামাত্রায় পাওয়া যায়।

(৩) প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে ছাত্রের যত কিছু জানা আছে তা জানবার সুযোগ নেই এই পরীক্ষায়। অথচ রচনাধর্মী পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে তা জানবার সুযোগ আছে।

(৪) নূতন পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা, যে এই পদ্ধতিতে অনেকখানি আন্দাজ বা অনুমানের সুযোগ দেয়। না বুঝে যেঁখানে-সেখানে আন্দাজমত

দাগ দিয়ে গেলেও দেখা যাবে কিছুসংখ্যক সঠিক উত্তরে দাগ পড়ে গিয়েছে। পরীক্ষক মোটেই বুঝতে পারেন না, কোনখানে জ্ঞানের শেষ এবং অনুমানের আরম্ভ। [The examiner cannot say where the knowledge stops end guessing begins—P. Sandiford]

প্রয়োগসিদ্ধ বা আদর্শীকৃত পরিমাপ (Standardised Test) :

এছাড়া আছে প্রয়োগসিদ্ধ বা আদর্শীকৃত পবিমাপ। এতক্ষণ ধরে যে সব ধরণের পরীক্ষার কথা বলা হল, সেগুলিকে যথাসাধ্য ত্রুটিশূন্য করবাব জন্য প্রশ্নপত্র রচনায় নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), সত্যতা (Validity) এবং নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) গুণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র এই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটলেই যে পরিমাপকে বিদ্যাবত্তায় নির্ভুল পরিমাপ ঘটবে সে কথাও বলা যাচ্ছে না।

—মনে করা যাক্ নবম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য অষ্টম বা সপ্তম শ্রেণী উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা করা গেল। অধিকাংশ ছেলেরই সেখানে ৮০ উপর নম্বর পাবার কথা। আবার, প্রশ্নপত্রেব মান যদি দশম শ্রেণীর উপযুক্ত করে চড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অধিকাংশই ছেলেই ফেল করবে সেখানে। একই শ্রেণীর বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র বিভিন্ন মানের, তাই পরীক্ষার ফল দেখে ছেলেদের বিদ্যার কোন তুলনামূলক বিচার করা চলে না। ওজনের একসেরি বাটখারাটা যদি কোথাও ৬০ তোলার, কোথাও ৮০ তোলার হয় তাহলে দেশনিবপেক্ষ কোন কিছুর ওজন নির্ধারণ করা যায় কি ?

সুতরাং পরিমাপকের একটা আদর্শমান (Standard) নির্ণয় করা দরকার।—কাজটা অবশ্য সহজ নয়। নানাবিধ জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভাবনাকে এগিয়ে এ'কাজ করতে হয়। সংক্ষেপে তাব মূল পদ্ধতিটি উল্লেখ করি—

বুদ্ধির পরীক্ষায় যেমন বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত আদর্শমানের প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়ে থাকে, বিদ্যার পরীক্ষাতেও তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর, বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। তারপর সেগুলিকে আদর্শীকৃত মাপের (Standerised) মধ্যে আপনার জন্যে বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে প্রশ্নগুলি বহুসংখ্যক ছাত্রের উপর পরীক্ষা করে যত

বেশী প্রয়োগসিদ্ধ করা যায়, ততই সেগুলি হয় আদর্শের নিকটবর্তী বা গড় সংখ্যার প্রতিনিধিমূলক (Satisfaction to norms)। অবশ্য এই ভাবে প্রয়োগসিদ্ধ করবার পথে আরো অনেক জটিলতা আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হল না।

এই ভাবে বিশেষশ্রেণীর প্রশ্নগুচ্ছে যারা অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে তাদের নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীর অনুপযুক্ত মনে করা যেতে পারে, কারণ এই প্রশ্নগুচ্ছই হচ্ছে ঐ শ্রেণীর বহু পরীক্ষার প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শ পরিমাপক। এছাড়া প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর সহজাতবুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞানের একটা তুলনামূলক বিচার করাও চলে। যেমন মনে করা যাক, কোন ছেলে ইতিহাসের মাত্র ৩৫ নম্বর পেয়েছে। এইটুকুমাত্র জেনে আমরা মনে করতে পারি যে ছেলেটি ইতিহাসে মোটেই ভাল নম্বর পায়নি। কোন প্রকারে পাশ করেছে মাত্র। কিন্তু সেই শ্রেণীতে ঐ প্রশ্নের প্রয়োগসিদ্ধি গড় বার করে যদি দেখা যায় যে সেই সংখ্যামান মাত্র ২৫ তাহলে ছাত্রটিকে ইতিহাসে আর মন্দ ছেলে বলা চলবে না, বরং তুলনামূলক ভাবে বেশ ভাল ছেলে বলেই মনে করতে হবে তাকে।

বলাই বাহুল্য, এই ধরণের প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরিমাপক নির্মাণের কাজ আজও আমাদের দেশে আরম্ভ হয়নি।

পরীক্ষা-প্রথার সংস্কার—উভয় মতের সমন্বয় :

নূতন পরীক্ষার এই সব সুবিধা-অসুবিধার সমালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রেমণ্ট একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন—

তিনি বলেন—এ'জাতীয় পরীক্ষার **সুবিধার কথা** হল—

(i) উত্তরগুলি হবে সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট, এবং একেবারে নির্ভুল বা ভুল। পরীক্ষকের মতামতের উপর তা মোটেই নির্ভরশীল নয়।

(ii) প্রশ্নপত্র রচনা করতে সময় কিছু বেশী লাগবে বটে, কিন্তু উত্তর পরীক্ষার দ্রুততায় তার ক্ষতিপূরণ হবে।

(iii) রচনাপদ্ধতিতে যে কয়টি প্রশ্ন দেওয়া যায় নূতন অভীক্ষায় তার বহুগুণ প্রশ্ন দেওয়া যায় বলে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপকতার পরিচয় জানা সম্ভব হয়।

(iv) পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মেজাজ বা রুচি দ্বারা প্রভাবিত নয়।

(v) লেখার সময় কম লাগার ফলে চিন্তা করবার সময় বেশী পাওয়া যায়।

(vi) ভাষা বা রচনাবলীর কৌশলে অর্জিত জ্ঞানের ক্ষীণতাকে গোপন করা সম্ভব হয় না।

আর **অসুবিধার কথা** হল :

(i) বিষয়ঘটিত স্থূল খণ্ডিত জ্ঞানের উপরই অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়।

(ii) জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোন সাঙ্গীকরণের সুযোগ নেই।

(iii) জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও সেই জ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষমতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(iv) উত্তরদানে অনুমান বা আন্দাজের ব্যবহার ভালভাবেই করা যায়।

সুতরাং দুই প্রকার পরীক্ষার মধ্যেই কিছু কিছু গলদ আছে আর কিছু কিছু সুবিধাও আছে। তাই পরীক্ষাকে যথাসম্ভব নির্দোষ করতে হলে দুই জাতের পরীক্ষারই সাহায্য নিতে হয়। রেমণ্টের মতে আদর্শ পরীক্ষা মাত্রেরই দুটো উদ্দেশ্য থাকা চাই—যথা—(ক) পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ এবং (খ) নূতনতর জ্ঞানার্জন উৎসাহ ও উদ্দিপনা সঞ্চার। নূতন পরীক্ষায় প্রথম উদ্দেশ্যটি কথঞ্চিৎ সাধিত হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আদৌ সাধিত হয় না। আবার, রচনামূলক পরীক্ষায় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হলেও প্রথমটির সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

তাই অনেক শিক্ষাবিদের মতে প্রশ্নপত্রে দুই জাতীয় প্রশ্নেরই ব্যবস্থা থাকলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য কিছু সফল হতে পারে। দুই পদ্ধতির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে, তাই পদ্ধতিদ্বয়ের সার্থক সমন্বয়ে পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্নপত্র নির্মিত হতে পারে।

[...that the advantages of the new type test far outweigh its limitations. These limitations may be overcome, in part, by the retention of the essay type for such purposes as it can adequately fulfil. *The conspicuous weakness of the later in regard to the reliability of its scores should cause teachers to*

pay more attention to this aspect of the subject. Otherwise the virtues it possesses will continue to be swamped by the vices of its unreliability—P. Sandiford.]

মুদালিয়র কমিশনের প্রস্তাব ঃ

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টেও এই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে—

(১) প্রাচীন রচনাধর্মী পরীক্ষার অনেক দোষ সত্ত্বেও এমন একটা নিজস্ব গুণ আছে যা নূতন পদ্ধতিতেই নেই, আবার জ্ঞানের বিচারে বস্তুমুখী নূতন অভীক্ষার মূল্যও অনস্বীকার্য। তাই প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুমুখী পরীক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। [In order to reduce the element of subjectivity of essay-type tests, object-tive tests of attainments should be widely introduced side by side.]

(২) উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নির্ধারণে গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহার একেবারেই অর্থহীন। শতকরা হিসাবে যে নম্বর দেওয়া হয় আপাতদৃষ্টিতে তা অত্যন্ত সূক্ষ্মবিচারের পরিচায়ক, কিন্তু বাস্তবে এতটা সূক্ষ্মবিচার ত করা সম্ভব হয় না। যে ছেলে ২৯ নম্বর পেয়েছে এবং যে ছেলে ৩০ নম্বর পেয়েছে বাস্তবিক পক্ষে তাদের উত্তরপত্রের মানের কোনই পার্থক্য নেই। অথচ একজন ফেল করবে এবং অপরজন পাশ করবে। সুতরাং শতকরা হিসাবের গাণিতিক সূক্ষ্মতা এখানে একেবারেই নিরর্থক।

উত্তরের মান নির্ণয়ের জন্য তাই সংখ্যাবাচক মূল্য না দিয়ে A B C D ইত্যাদির চিহ্নবাচক মূল্য দেওয়া ভাল। যেমন A=খুব ভাল, B=ভাল, L=মোটামুটি ভাল, D=মন্দ, E=খুবই মন্দ। পরীক্ষার্থীদের শতকরা গাণিতিক হিসাবে বিভক্ত না করে ভাল মন্দ মাঝারি জাতীয় ছোট ছোট দলে (Category) ভাগ করলে ভাগটা যথাসম্ভব সহজসাধ্য ও বাস্তবানুসারে হয়। প্রয়োজন হলে এই দলগত বিভাগকে শতকরা গাণিতিক বিভাগেও রূপান্তরিত করে নেওয়া যায়।

অন্তস্থ ও বহিস্থ পরীক্ষার সমস্যা :

শিক্ষাব্যবস্থার উপরে বহিস্থ পরীক্ষার ভয়াবহ প্রভাবের কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কারকের মুখে। এরই ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বোধ মুখস্থের রাজত্ব, এরই ফলে সম্ভাব্য প্রশ্ন নির্বাচনের উপরেই শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার, এবং এরই ফলে পরীক্ষার্থীর মানসিক চরম বিপর্যয়। অটো জেসপার্সন বহিস্থ পরীক্ষা-ভীতি-ব্যাকুল ছাত্রগণের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন—

পরীক্ষার ঠিক পূর্বে সমস্ত ইস্কুলটাই যেন বাৎসরিক পরীক্ষা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইস্কুলে তখন সর্ববিভাগে কেবল পুরাতন পাঠ্যেরই অনুশীলন, মনে হয় ছাত্রেরা যেন সাময়িক ভাবে মানসিক রোমন্থনকারী জীবে পরিণত হয়েছে।

["Just before the examination, the whole school is seized with its yearly attack of the examination catarrh. In all departments it is considered necessary to recapitulate for examination ; for a couple of months the pupils transferred into mental ruminants."—Otto Jesperson]

(৩) মুদালিয়র কমিশন বলেন যে, বহিস্থ পরীক্ষা যতদূর সম্ভব কম করা ভাল, এবং অন্তস্থ পরীক্ষা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করবার পর ছাত্রের পাঠোন্নতি বিচার করবার সময়ে একবার মাত্র বহিস্থ পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এর আগে আর কোন বহিস্থ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কোন বহিস্থ পরীক্ষা হবে না। বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক মহাশয় স্কুল রেকর্ড দেখে তার শিক্ষাদান শেষে সার্টিফিকেট দেবেন।

[There should be only one public examination at the completion of School Course.]

(৪) ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় নিতে হলে এবং তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ নির্ধারণ করে নিতে হলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড রাখতে হবে। সেই রেকর্ড হতেই জানা যাবে ছাত্র সারা বছর কি কাজ করেছে এবং কিভাবে ক্রমশ উন্নতি করছে।

(৫) পরীক্ষান্তে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে বিভিন্ন বিষয়ে বহিস্থ পরীক্ষার ফল এবং সেই সঙ্গে অন্তস্থ পরীক্ষার ফল এবং দৈনন্দিন স্কুল রেকর্ডের ফল উল্লেখ করা থাকবে।

(৬) শেষ পরীক্ষায় কম্পার্টমেণ্টাল প্রথা চালু করা প্রয়োজন। একটি বা দুইটি বিষয়ে যদি কেউ অকৃতকার্য হয় তবে পরবর্তী বৎসরে তার পরীক্ষা দেওয়া চলবে কিন্তু সেক্ষেত্রে স্কুল-রেকর্ড গণ্য হবে না। কিন্তু এই সুযোগ তিনবারের বেশী দেওয়া চলবে না। এইভাবে মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষা-সংস্কারের যে সব পরিকল্পনা দিয়েছেন সেগুলোর ফলাফল বেশ কিছুদিন ধরে বিচার করলে তবেই তার যোগ্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করেছেন।

খেলা

(Play)

সকল দেশে সকল কালের ছেলেরাই খেলা করতে ভালবাসে—তারা খেলতে চায়, খেলার আনন্দে মেতে ওঠে। এর কোন ব্যতিক্রম বড় একটা কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ? কেন সকলে খেলাধূলার নামে নিরর্থক পরিশ্রমে মেতে ওঠে? খেলার এই অন্তর্নিহিত আকর্ষণী শক্তির মূল উৎসটা কোথায়? বিভিন্ন দার্শনিক ও মনোবিদ এই উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন নানাভাবে।

খেলার তত্ত্ব—(Theory of Play):

(১) বহুকাল আগে বিখ্যাত জার্মানকবি শিলার বলেছিলেন, খেলা হচ্ছে **বাড়তি শক্তির** ক্ষয়। পরবর্তীকালে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারও এই মতের সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন বড়রা জীবনসংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে আহার আচ্ছাদন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, ছোটদের তা করতে হয় না, অথচ অনায়াসলভ্য খাদ্যাদি থেকে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে, এবং সেই সঞ্চিত শক্তির ব্যয়েরও কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। তাই অকারণে দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলার মাধ্যমে সেই সঞ্চিত বাড়তি শক্তি ক্ষয় করে ছেলেরা। [···According to their view, play is always the expression of a surplus nervous energy. The young creature, being tended and fed by its parents, does not expend its energy upon the quest of food, in earning its daily bread, and therefore, has a surplus store of energy which overflows along the most open nervous channels producing purposeless movements of the kind that are most frequent in real life—Mcdougall.

এই তত্ত্বের মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্যতা আছে, কিন্তু সমস্ত খেলাকেই এভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। দোলনায় শুয়ে ছোট্ট শিশু যে অনবরত হাত পা নেড়ে খেলা করে, সেখানে বাড়তি শক্তির ব্যয় হিসাবে তাকে দেখা যেতে

পারে। কিন্তু সব খেলাই ত এই রকম এলোমেলো ক্রিয়া নয়। তার কতরকম পদ্ধতি, কত প্রকার উদ্দেশ্য—নিছক শক্তিক্ষয়ের তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা মেলে না। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর যখন ক্লান্ত, একটুকুও শক্তি নেই তখনও ত খেলার কথায় নেচে ওঠে ছেলেরা। সুতরাং সব খেলাকেই বাড়তি শক্তির ক্ষয় বলা চলে না। নান সাহেব একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই তত্ত্বের ভুল দেখিয়ে দিলেন। ষ্টীমইঞ্জিন যেমন বাড়তি বাষ্পের চাপ সেপটিভ্যালব দিয়ে ছেড়ে দেয় ছেলেরাও কি তেমনি বাড়তি শক্তিকে খেলার অজুহাতে ছেড়ে দেয়, তাহলে ছেলেরা খেলাধূলা করে যেমন শক্তি অর্জন করে, ষ্টীম-ইঞ্জিনও তেমনি বাড়তি বাষ্প ছাড়ার ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না কেন? সুতরাং এই তত্ত্বটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

২। খেলার তত্ত্বের আর একটি মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কার্লগ্রুজ (যদিও মেলেব্রান্স এই মতের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন বহুপূর্বে)। পশু এবং মানব শিশুর খেলা নিয়ে কার্লগ্রুজ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটা নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। আমরা লক্ষ্য করব, জীবজগতে কীট-পতঙ্গ সরীসৃপাদি নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে খেলাধূলার কোন পাঠ নেই, কিন্তু উন্নততর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাচ্চাদের জীবনে খেলার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তার কারণ কি?—

দেখা যায়, জীবজগতে যে যত নিম্নস্তরে আছে, সে ততই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) দাস। জীবন-সংগ্রামে তার একমাত্র অস্ত্র হল অমার্জিত প্রবৃত্তিগুলির তাড়না। জীব যত উন্নতস্তরে উঠেছে, সহজাত প্রবৃত্তির বেগ তার তত কমেছে। জীবন সংগ্রামের অস্ত্র তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, শাণিত করতে হয়েছে, ভাবী সংগ্রামবহুল জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। খেলার মধ্যে দিয়েই তাদের এই **ভাবী জীবনের প্রস্তুতির মহড়া**।

ভবিষ্যতে যে জটিল সংগ্রাম-জীবন আসছে, বাল্যকালেই যেন তার মহড়া চলে খেলার ছলে। বেড়ালের বাচ্চারা উলের বল লোফালুফি ক'রে ইঁদুর ধরা অভ্যাস করে; কুকুর বাচ্চারা পরস্পর কামড়াকামড়ি খেলা করে ভাবী জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে।

মেয়েরা গৃহিণীপনার মহড়া দেয়, ছেলেরা দৌড়ঝাঁপে ছটোপুটি করে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে। তাই এই তত্ত্বের নাম দেওয়া যায় **প্রস্তুতিকরণ তত্ত্ব** (Anticipatory theory)। এককথায় খেলার মধ্যে দিয়ে

ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাবীজীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, অনাগত জীবনসংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। এই হিসাবে কার্লগ্রুজের মত শিলার-স্পেন্সারের মতের বিপরীত বলা যায়। অর্থাৎ খেলা বাড়তি শক্তির ক্ষয় নয়, শক্তির সঞ্চয়।

[Groos therefore reverses the Schiller-Spencer dictum, and says, it is not that young animals play because they are young and have surplus nervous energy ; we must believe rather that the higher animals have this period of youthful immaturity in order that they may play.—Mcdougall]

৩। গ্রুজের বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ষ্ট্যানলি হল। তিনি বলেন গ্রুজের এই প্রস্তুতিবাদ-তত্ত্ব একান্তই আংশিক, পল্লবগ্রাহী ও বিকৃত (very partial, superficial and perverse)। হলের মতে খেলা ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য নয়, অতীতের ভুলে-যাওয়া স্মৃতির পুনরাবৃত্তির জন্য, তাই এই তত্ত্বের নাম **পুনরাবৃত্তি-তত্ত্ব**। গুহাবাসী অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে চাপা রয়ে গিয়েছে। অতীত জীবনের সেই সব চিন্তাভাবনাহীন সুখস্মৃতির প্রতি আকর্ষণ জীবের স্বাভাবিক। বলাই বাহুল্য এই আকর্ষণ সজ্ঞান মনের স্তরে নয়, নির্জ্ঞানস্তরে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেই অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়, তাই খেলার মাধ্যমে তার পুনরাবৃত্তি করে আমরা তৃপ্তি পাই, হারানো স্বর্গরাজ্য যেন নতুন করে ফিরে পাই।

[The heart of youth goes out into play as into nothing else, as if in it man remembered a lost paradise—Stanly Hall.]

মারামারি খেলা, প্রতিযোগিতা খেলা, লুকোচুরি খেলা, শিকার খেলা, সবই মানব-সভ্যতার গোড়ার দিকের পাতায় লেখা আছে। অতীত জীবনের ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম ত আজ নেই, তাই আজকের ভাবনাহীন নিশ্চিন্তজীবনে সেই অতীতের স্মৃতি যে অনুভূতি জায়গা তা সুখকর। খেলার ছলে আমরা সেই সুখকর অনুভূতি গ্রহণ করি।

স্ট্যানলি হলের এই মত যে কার্লগ্রুজের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত তা ত দেখাই যাচ্ছে। একজনের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, অপর জনের অতীতের দিকে। গ্রুজের মতকে যেমন বলি প্রস্তুতিবাদ (anticipatory), হলের

মতকেও তেমনি বলতে হয় পুনরাবৃত্তিবাদ (recapitulary)। এ মতেও অবশ্য কিছুটা সত্যতা আছে তবে আংশিক, পল্লবগ্রাহী ও বিকৃত (Partial, superficial, perverse) বলবার সুযোগ যে এতেও একেবারে না আছে এমন নয়।

৪। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগাল খেলাকে অবশ্য কোনরকম সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে তাঁর মতে খেলার মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির **সামাজিক উদগমন** (Sublimation) ঘটে। যেমন প্রতিযোগিতামূলক খেলাকে যোধন প্রবৃত্তির উদ্‌গতি বলা যায়। তেমনি আত্মবিস্তার, আত্মসংকোচন, কৌতূহল, নির্মাণেচ্ছা দলগঠন প্রভৃতি বহু প্রবৃত্তির সার্থক উদ্‌গতি ঘটে খেলাব মাধ্যমে। ম্যাকডুগালের মতে খেলার মূল প্রেরণা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বের স্পৃহা। খেলার মূল কথাই হল **প্রতিদ্বন্দ্বিতা** (Rivalry theory)। যোধন প্রবৃত্তির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোধনের মতে প্রতিপক্ষের মৃত্যু কামনা নেই।

৫। ক্রীড়াতত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য মত হচ্ছে **বিরেচনবাদ** (Catharsis) বিবেচন শব্দটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের। জোলাপ দিয়ে ভিতরেব ময়লা বার কবে দেওয়াই হচ্ছে বিরেচনের কাজ। মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েড এই শব্দটি একটি বিশের অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। আসল বস্তুটি যেখানে নাগালের বাইরে, সেখানে অন্য একটা কিছু উপলক্ষ্য করে আসলবস্তু ভোগের পরোক্ষ চেষ্টা। এ যেন বাস্তব পদার্থের পরিবর্তে অনুকল্পের ব্যবস্থা। মনের মধ্যে এখন অনেক নিরুদ্ধ ইচ্ছা বেরিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে যার কোন বাস্তব পূরণ সম্ভব নয়, সেগুলি তখন খেলার ছদ্মবেশে বেরিয়ে এসে তৃপ্তি খোঁজে।

কার্লগ্রুজের ও স্ট্যানলি হলের আপাতবিরোধী মত দুইটিরও সার্থক সমন্বয় করা যায় এই বিরেচন-বাদ তত্ত্বে।

অন্তর্নিহিত অবদমিত ইচ্ছাটি যদি ভাবীজীবনের প্রস্তুতির জন্যই হয়, খেলার মধ্য দিয়েই হয় তার বিরেচন। খুকুমণি তার কাঠের ছেলেটি ভাত খাইয়ে ভাবী মাতৃত্বের বিরেচন ঘটায়। কাঠ আর মাটি সেখানে ভাবী বাস্তবের অনুকল্প।

আবার পুনরাবৃত্তিবাদ মতে ইচ্ছাটা যদি ফেলে-আসা জীবনের কোন

সুখকর ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে চায় সেখানেও আসলের পরিবর্তে খেলা অনুকল্পের সাহায্যে মনের পরোক্ষ ভোগ ঘটে। গুহাবাসী জীবনের শিকারের উল্লাস খেংরাকাঠির ধনুক দিয়ে ফড়িং শিকারের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে তৃপ্তি খোঁজে।

এই জাতীয় কাল্পনিক তৃপ্তির নাম হল বিরেচন (Catharsis)। ফ্রয়েড-পন্থীরা বলেন, মানুষের অবচেতন মনে কতরকম অসামাজিক ইচ্ছা মাথা তুলবার জন্য দিনরাত ছটফট করছে। সেগুলি সব সময়েই নির্দোষ সামাজিক ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে, খেলার মধ্য দিয়েই শিশু তার অবচেতন মনের **অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ** করে নিতে চায়। যে ছেলের পিঠে খাবার খুব লোভ অথচ খেতে পায় না, খেলার ছলে সে অজস্র মাটির পিঠে বিতরণ করে। পিঠে-গাছে অসংখ্য পিঠে ফলায়। [The child who actually is allowed less cake than he would like, may provide (in his play) an unlimited supply of make-believe cake—" —Gates and Jersild]

আচরণবাদী উডওয়ার্থ খেলাকে একেবারে **বাহ্যিক উত্তেজনা** ও **প্রতিক্রিয়া** হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বাইরের একটা চামড়ার বল শিশুর মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করল তারি প্রতিক্রিয়া হল বল খেলা। এটা যেন একেবারেই পেশী, তন্তু, স্নায়ু ও গ্ল্যাণ্ডের রসক্ষরণের ব্যাপার—এছাড়া আর কিছুই নয়।

৬। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের **ক্ষমতালিপ্সাবাদ** তত্ত্বে কোন কোন খেলার ব্যাখ্যাটি ভালভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর মতে, খেলার মূল প্রেরণাটা অসামাজিক ইচ্ছা-পূরণ প্রচেষ্টা নয়, ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। ছোট শিশুরা বড় হতে চায়, বড়দের অনুকরণ করতে চায়, বড়দের মত ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। বাস্তবে ত সেটা সম্ভব নয়, তাই লেখার কল্পনা-জগতে তার পরিতৃপ্ত ঘটে। Some psycho-analysts have tried to see a sexual symbolism in children's play. This, I am convinced in utter moonshine. The main instinctive urge of childhood is but the desire to become adult or perhaps more correctly, the will to power. —Bertrand Russell]

কল্পনাবিলাসবাদের (Make believe play) মধ্যে পরিচয় পাওয়া

যার এই ক্ষমতালিপ্সাবাদের। অসহায় দুর্বল শিশু সেখানে কল্পনা করে "আমি যখন বাবার মত হব," কল্পনা করে সে হবে কানাই মাষ্টার, বেত হাতে ছাত্রদের যথেষ্ট পিটিয়ে যাবে, ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে মাকে উদ্ধার করবে, এ সবই ক্ষমতালিপ্সাবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে।

খেলি কেন?

মোট কথা খেলার তত্ত্ব হিসাবে এতক্ষণ যেসব মতবাদের কথা উল্লেখ করা হল তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যত বিভেদই থাক, একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত,—সে হচ্ছে **আনন্দানুভূতি**। খেলার প্রতি শিশুদের যে অনুরাগ তার মূল কথাই হল আনন্দের প্রতি অনুরাগ। আনন্দ থেকেই ত জীব সকলের উৎপত্তি। তাই আনন্দের প্রতি জীবনমাত্রেরই সহজাত আকর্ষণ। আনন্দোন্মুখতা জীবের স্বধর্ম। খেলার দিকে তাই শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ।

দৌড়াদৌড়ি করে ধুলোকাদা মেখে খেলা নিয়ে মশগুল থাকে ছেলেরা। ক্ষুধাতৃষ্ণা শারীরিক পরিশ্রম কোন দিকেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই আনন্দ তারা পায় কোথা থেকে? ছেলেদের খেলা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে খেলার আনন্দ খেলার উপকরণ বা লেখনার পরিপাট্যের উপর নির্ভর করে না, একান্তভাবেই তা শিশু-অন্তরের মধুচক্র থেকে আহরিত। চকচকে রঙ্গীন দামী খেলনা আর মাটির ডেলা পাথরের নুড়ি সবই সমমূল্য শিশুর আছে।

তাছাড়া খেলা কি শুধু ছেলেরাই ভালবাসে? বড়রাও ত খেলার নামে মেতে ওঠে। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যেবেলা তাসের আড্ডায় বা খেলার মাঠে যেতে তার কোন আলস্য দেখা যায় না। কাজের নামে আমরা ব্যাজার হই, অথচ তাদের চেয়ে বহুগুণ পরিশ্রম সাপেক্ষ খেলার নামে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই কেন?

তাহলে খেলার স্বরূপ কী? কাজের সঙ্গে খেলার মৌল পার্থক্যটা কোথায়?

খেলা ও কাজ—(Play and Work):

প্রথমেই একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করব যে কাজ মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু খেলার কোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নেই, আনন্দলাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং খেলা মানেই হল আনন্দ লাভ। আরো সংক্ষেপে বলা যায়, যে-

কর্মের ক্রিয়াটাই প্রধান সেই হল খেলা, আর যে-কর্মের মধ্যে ক্রিয়ার অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে সে হল কাজ।

[In play, the value and significance of the activity are found in the activity itself, whereas in work, the value and significance of the activity are found in an end beyond the activity."—Drever.]

তাছাড়া কাজের মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতার ভাব আছে। একটা দায়িত্বের চাপ আছে—খেলার মধ্যে সেটি নেই। কাজের থেকে হয়ত খেলার পরিশ্রম অনেক বেশী। বুদ্ধিবিবেচনা ও ব্যবহার করতে হয় অনেক বেশী, তবু তার পিছনে একটা মানসিক কর্তৃত্ববোধ আছে যে আমার একাজের আমিই মালিক,—এ কাজ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। তাই অধ্যাপক গালিক খেলার একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন যে কাজ আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারি সেই হল খেলা—[Play is what we do, when we are free to do what we will.—Prof. Gullick]

সত্যিকারের খেলা বলে যাকে আমরা মনে করি, তার মধ্যেও যদি কর্তৃত্ববোধ অন্তর্হিত হয়ে সেখানে বাধ্যবাধকতার ভাব এসে পড়ে তবে খেলা তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলে হারিয়ে ফেলে তার আকর্ষণ। খেলা হয়ে পড়ে কাজের অধম।

মনে করা যাক্, একটি ছেলে বাঁশী বাজায় মনের আনন্দে। কাজ পালিয়ে নিরালায় বসে সে বাঁশী বাজায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজালেও তার ক্লান্তি আসে না। কিন্তু সে বাঁশুরিয়াই যদি কোন থিয়েটার বায়স্কোপে নিয়মিত ভাবে নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট স্বরে বাঁশী বাজাবার চাকরি পায় তখন তার এই বাঁশী বাজাবার আকর্ষণটা সব নষ্ট হয়ে যাবে। এটা তখন বিরক্তিকর কঠোর কর্তব্যের আহ্বান হয়ে দাঁড়াবে।

ডঃ হ্যারিস তাঁর Psychological Foundation of Education গ্রন্থে এই কথাটি নূতনভাবে বলেছেন। তিনি বলেন যে কাজটা আমরা আত্মকেন্দ্রিকভাবে ব্যক্তিগত সুখের লোভে করি সেইটেই হল খেলা আর সমাজকল্যাণে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলি যে কাজে, সে হল কাজ। একটা আত্মকেন্দ্রিক কাজ আর একটা সমাজকেন্দ্রিক কাজ। [In work individual surrenders himself to the services of a universal

want or necessity of society. Man gives up his particular, special likes and desires in work. He sacrifices his momentary convenience of rational ends. He adopts the social order. But in play he gives full rein to the individual whim or caprice. In play, his activity is wholly turned towards his own immediate gratification. After work, in which he sacrifices his private particular inclinations for society and for rational ends,—comes play, in which he returns to his individuality and relaxes this tension of work. He regains his feeling self in play, because in play, immediate inclination alone guides his activity, and thus the particular self in the impelling principle, and also the immediate object of it.]

অধ্যাপক হর্ণি এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে সুন্দর করে বলেছেন। তাঁর মতে খেলা আর কাজের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল অর্থনৈতিক। কাজের পিছনে রয়েছে কিছু অর্থপ্রাপ্তির স্বর্ণমরীচিকা আর খেলার পিছনে কেবল মাত্র আনন্দের দ্যুতি। মনস্তত্ব হিসাবে খেলাটা কাজের তুলনায় একটু স্বল্পকালস্থায়ী এবং আনন্দাশ্রয়ী। সুতরাং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে খেলা আর কাজের মধ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য নেই। অবশ্য সব খেলাই তা বলে কাজ হিসাবে গণ্য হবে না, অথচ সব কাজই খেলার মনোভাব নিয়ে নূতন করে দেখলে তাকে একটি শিল্পকর্ম রূপে উন্নত করে দেওয়া যায়।

["Economically, play does not aim at earning a living and work does. Psychologically, the differences are these : in play the activity is likely to be shorter than work and leads on to further activity enjoyed on its own occount, while in work the activity is likely to be longer than in play and leads on not only to further activity but to some material tangible result or accomplishment.—H. H. Horne.]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেলাটা কেবলমাত্র অর্থহীন অঙ্গবিক্ষেপ নয়—কাজের ভূমিকাস্বরূপ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি-কৌশল। খেলার

মাধ্যমেই শিশু নিয়মনিষ্ঠা, কল্পনাপ্রবণ, কৌশলী, সমস্যা-সমাধানের-কর্মী ও চিন্তাশীল নাগরিকে পরিণত হয়। [Play is the prepatory school for what has to be done later in the form of work. It teaches reverences for law, exercises the imagination, gives opportunities for frequent change in which every child delights, and creates little difficulties to be mastered. Indeed, play and games without difficulties would not be appreciated—Bray]

—শিক্ষাবিদ বেটস্ শিশুর খেলাকে আলো বাতাস এবং খাদ্যের মতই অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেছেন। [Play is necessary to the child as food, as vital as sunshine, as indispensible as air.

—G. H. Betts.]

মোটকথা—খেলা আর কাজ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আদৌ বিষয়ঘটিত নয় বিষয়ীঘটিত, বস্তুমুখী (objective) নয়, ভাবমুখী (subjective)। অর্থাৎ কোন ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে সেটি বড় কথা নয় ; বড় কথা, কোন ভাবে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে। ক্রিয়াটি যদি আত্মকেন্দ্রিক রূপে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং কেবল মাত্র আনন্দলাভের প্রেরণার পরিচালিত হয় তবে ক্রিয়াটি যত শ্রমসাধ্যই হোক, সেটি খেলার পর্যায়ে পড়বে।

অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্ব ও আনন্দ এই দুটোই হল খেলার মূলকথা তাই খেলার দিকে মানুষ মাত্রেরই সহজাত আকর্ষণ এবং কাজের দিকে বিকর্ষণ। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখান কাজটা যতদিন পর্যন্ত বেত্রানুশাসন জর্জরিত শিশুদের উপরে শিক্ষক অভিভাবকের চাপিয়ে দেওয়া কাজ হয়ে থাকবে ততদিন সে শিশুহৃদয়কে কখনই আকর্ষণ করতে পারবে না। শিক্ষা কাজটাই শিশুদের কাছে একটা বিরক্তিকর ব্যাপারে পর্যবসিত হবে।

এর বিপরীতক্রমে কোন কাজকে আনন্দের অনুসঙ্গ করে উপস্থাপন করতে পারলে তা আনন্দময় করে তোলা যায়।

খেলায় মানসিক ও শারীরিক গুণের বিকাশ :

তাছাড়া খেলার মধ্যে দিয়ে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক গুণের বিকাশলাভ ঘটে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যথা—

(১) খেলা মনের একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া—শিশুরা খেলা করে একান্ত-ভাবেই স্বাধীন ইচ্ছায়। বাইরের কোন অনুজ্ঞা বা আদেশ-নির্দেশের প্রভাব নেই খেলার মধ্যে।

(২) খেলা শিশুমনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ—খেলার মধ্যে দিয়েই শিশুহৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা-স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ পায়।

(৩) খেলা মাত্রই শিশুর সৃজনমূলক কাজ। বড়দের দৃষ্টিতে খেলা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক শিশুর সৃষ্টিধর্মী মন খেলাকে অবলম্বন করেই নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মাতে।

(৪) খেলা শিশুমনের শৃঙ্খলা সাধনের সহায়ক। প্রত্যেক খেলারই একটা নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। খেলার ছলে শিশু অজ্ঞাতসারে সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে আগ্রহশীল হয়।

এই নিয়ম শৃঙ্খলা কোন বাইরের চাপে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত আগ্রহের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে তারা এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে।

(৫) খেলা স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর সমগ্র মনকে আকর্ষণ করে, তার ফলে অখণ্ড মনোযোগ, দলের প্রতি আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার সার্থক অনুশীলন হয়।

(৬) খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শেখে। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে একযোগে কোন কাজ করবার শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করে শিশুরা। তার ফলে শিশুমনের আত্মকেন্দ্রিক ভাব ক্রমশ দূর হয়ে যায় এবং দলকেন্দ্রিক ভাবে সামাজিকতা গুণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে।

(৭) খেলার মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিজেদের আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে শেখে শিশুরা।

(৮) খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুরা একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এমন অনেক জটিল কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে যেগুলি পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে লাগে। এই সত্যটি কার্লগ্রুজ তাঁর প্রস্তুতিবাদ তত্ত্বে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

(৯) খেলা শিশুমনের অনেক অসামাজিক প্রবৃত্তিকে সামাজিক পথে

উদ্গতি ঘটাতে সাহায্য করে। ম্যাকডুগাল এই হিসাবে খেলাকে মানবের চরিত্রগঠনে এত মূল্যবান বলে মনে করেছেন।

(১০) খেলা শিশুমনের অনেক নিরুদ্ধ আবেগকে তৃপ্ত করে। ষ্ট্যানলি হল তাঁর পুনরাবৃত্তিবাদে এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

(১১) খেলাকে উপলক্ষ্য করে শিশুমনের অনেক অবদমিত বিরুদ্ধ বাসনা তৃপ্তি লাভ করে, অনেক জট পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সত্যটি বিরেচনবাদ তত্ত্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) খেলার ছলে শিশুদের দৈহিক শক্তির চর্চা হয়। তাদের শরীর তখন সবে গড়ে উঠছে—শরীরচর্চা এ সময়ে তাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন—কিন্তু এই চর্চা অপরের আদেশ-নির্দেশে করতে বাধ্য হলে তার ফল ভাল হয় না। খেলার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দেব মধ্যে দিয়ে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তা ঘটে থাকে।

(১৩) খেলায় শিশুদের মানসিক শক্তির চর্চাও হয় অজ্ঞাতসারে। খেলার মধ্যে শিশুরা মাঝে মাঝে এমন এক একটা জটিল সমস্যায় পতিত হয় যে তার সমাধান করতে তাদের বেশ চিন্তশীলতার পরিচয় দিতে হয়।

(১৪) খেলার মধ্যে দিয়ে হয় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। ডিউই বলেন, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেবল মানসিক শক্তির চর্চায় হয় না, কেবল শারীরিক শক্তির চর্চাতেও হয় না। শরীর ও মনের যুগপৎ চর্চাটি সম্ভব হয় কেবল বুদ্ধিনির্ভর সক্রিয়তার মাধ্যমে। খেলা হচ্ছে একমাত্র সেই স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধিনির্ভর আনন্দদায়িনী ক্রিয়া; তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলার তুল্য আর কিছু নেই। ডিউইর মতে এইজন্য খেলা হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন-প্রক্রিয়া (life process)।

শিক্ষায় ক্রীড়াচ্ছল (Playway in Education):

এইভাবে খেলাকে উপলক্ষ্য করে শিশুর এতগুলি গুণের বিকাশ সাধন হয় বলেই বর্তমানের শিক্ষাবিদেরা আজ শিশুশিক্ষায় খেলার এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করেছেন।

এককালে খেলাকে দেখা হত কাজের বিপরীত হিসাবে, পড়াশুনার হানিকর হিসাবে। খেলার দিকে ঝোঁক হলে তার পড়াশুনা কিছু হয় না—এই ছিল সাধারণ মত। ক্রমশ মত বদলাতে লাগল। বলা হল, খেলার

প্রয়োজন আছে বৈকি—নিরেট পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটু খেলা ধূলার হাল্কা হাওয়ায় প্রয়োজন ছেলেদের মানসিক স্বাস্থ্যের খাতিরে। খেলা-ধূলা বাদ দিয়ে কেবল পড়াশুনা কাজকর্ম নিয়ে থাকলে ছেলের উন্নতি হবে না, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে না, ছেলে বোকা হয়ে যাবে—(All work and no play make Jack a dull boy) এই হল পরবর্তী শিক্ষাবিদদের ধারণা।

ধারণাটা এইখানেই থেমে থাকেনি। শিশুশিক্ষায় খেলার গুরুত্ব ক্রমশ আরো অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। বর্তমানের শিক্ষাবিদদের মধ্যে খেলা শুধু কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের জন্য নয় খেলাটাই কাজ, অর্থাৎ খেলা হচ্ছে শিক্ষারই একটা পদ্ধতি। পড়াশুনাটাকে আজকাল আর শুধু কর্তব্য পালন হিসাবে ছেলেদের সম্মুখে উপস্থাপিত না করে খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দময় করে তুলবার নানাপ্রকার পরিকল্পনা আজ শিক্ষাবিদেরা করেছেন। শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল্ সর্বপ্রথম খেলাকে শিক্ষা দেবার প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন বলা যায়। তাঁর মতে শিশুদের কোন খেলাই ব্যর্থ নয়, সবই কাজের অঙ্গ। আর যে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত নয় সে কাজের কোন আকর্ষণই নেই ছেলেদের কাছে। তাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলার স্থান এত উচ্চে। খেলায় কাজে কোন পার্থক্যই রাখা হয়নি সেখানে। খেলাকে সার্থকভাবে কাজের বাহন করেছেন মাডাম মন্তেস্বরী। খেলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাই এখানে শিশুদের শিক্ষার পথে নিয়ে চলে। মন্তেস্বরী-শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব হচ্ছে পড়াশুনার ব্যাপারে শিশুদের যথাসম্ভব আত্মনির্ভর করে তোলা এবং শেখার জিনিসগুলি খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা। আধুনিক সকল শিক্ষাবিদই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রীড়ানুসঙ্গ স্থাপন করে ভাল ফল পেয়েছেন। প্রজেক্ট পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি (heuristic) ডাল্টন পদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলির মূল কথাই হল ক্রীড়ানুসঙ্গ।

এ বিষয়ে ক্যাল্ডওয়েল কুকের নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। শিক্ষায় ক্রীড়াচ্ছলের (Play way in education) কথা বলে তিনি প্রথমে শিশু-শিক্ষার জগতে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পড়াশুনার বিরক্তিকর পরিবেশকে সহনীয় করে তুলবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি খেলাধুলার ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রথমে অনেকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু ক্যাল্ডওয়েলের মতে খেলাধুলাটাই হচ্ছে পদ্ধতি. অন্য পদ্ধতির ক্লান্তিহারী মাত্র নয়।

[······that the play methods······are not a relaxation or a diversion from real study, but only an active way of learning.—Caldwell Cook]

নীরস বিষয়বস্তু খেলার মাধ্যমে যে কতখানি মনোহারী হয়ে উঠতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত দেই—

ইংরেজী শব্দের অর্থ ও বানান মুখস্থ করা ছাত্রদের কাছে যে কতখানি বিরক্তিকর তা ত বলাই বাহুল্য। বিদেশী ভাষায় জটিল শব্দ, ততোধিক জটিল বানান আয়ত্তে আনা সত্যই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ওয়ার্ডমেকিং খেলায় মেতে নতুন নতুন শব্দ তৈরী করবার উৎসাহে আমি ছাত্রদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অভিধান মুখস্থ করতে দেখেছি।

এখানে খেলার আনন্দ পড়ার বিরক্তিকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—

Work while you work
and play while you play

বর্তমান মনোবিদ্‌দের মতে কথাটি ঠিক নয়—তার স্থানে বলা যেতে পারে

Work while you play
and play while you work—

অর্থাৎ কাজের মধ্যেই খেলা এবং খেলার মধ্যেই কাজ। সার্থক শিক্ষাবিদদের হাতে খেলা ও কাজের সীমারেখা ক্রমশই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানের এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগের কথা বার বার বলা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা, খেলা আর পড়াকে মিলিয়ে দেওয়া। এই মতের প্রধান উদ্গাতা স্যর জন আডামস্, ফ্রয়েবল, মন্তেস্বরী, জন ডিউই, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বর্তমান যুগের শিক্ষাগুরুবৃন্দ। এঁদের হাতে শিশু-শিক্ষা পদ্ধতি নূতন রূপ গ্রহণ করেছে, শিশুকেন্দ্রিকতার ক্রম-বিকাশ ঘটেছে। এঁদের প্রবর্তিত নবশিক্ষাধারার মূল কথা হল ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা। শিক্ষার মধ্যেও শিশুরা খেলার মত আনন্দের আস্বাদ পাবে, অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করবে, আত্মবিস্তারের সুযোগ পাবে, তাই সে শিক্ষা হবে সার্থক।

খেলার কল্পনা-বিলাসবাদ (Make-believe Play)

বিভিন্নপ্রকার খেলার তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে শিশুদের কল্পনা-বিলাসের

কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। শিশুদের জগৎ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তাদের নিয়ম-কানুন। বড়দের মনে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, বেড়া দেওয়া আছে। কল্পনার ঘোড়াকে ছুটাতে গেলেও আমরা সব সময়ে সতর্ক থাকি ঘোড়ার পা যেন বাস্তবের কঠিন রাস্তা ছেড়ে না ওঠে। কিন্তু শিশুদের মন সেদিক দিয়ে স্বাধীন, বাস্তবের দাসত্ব করতে কখনও তারা অভ্যস্ত হয়নি। তাই তাদের কল্পনার পক্ষীরাজ ছুটে চলে ভাবজগতের হাল্কা হাওয়ার পাখা মেলে। বাস্তবের মাটি কোথায় দূরে পড়ে থাকে, চোখেও দেখা যায় না। ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে বেড়া ছিল না উঁচু।
মনটা ডিঙিয়ে যেত এপার থেকে ওপারে
সহজেই—"

শিশুমনে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে কোন বেড়া থাকে না। শিশুর কল্পনা অবাধ। একটা ছোট ভাঙ্গা খাটের পেরেকে কাপড় জড়িয়ে তাকে ছেলে মনে করতে তার বাধে না। চেয়ারের ভাঙ্গা হাতলটাকে ঘোড়া কল্পনা করে তার গায়ে অনবরত বেত্রাঘাত করতে করতে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়িয়ে অশ্বারোহণের আনন্দ পায় সে পুরামাত্রায়। সামান্য একটু বাস্তবের খোলাব মধ্যে পোরা থাকে তার কল্পনার আতসবাজি।

পথ দিয়ে চলেছে বাসনওয়ালা ঢং ঢং করতে করতে, শিশুর কল্পনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল—সেও কল্পনা করে চলল সে হবে বাসনওয়ালা—রাস্তা দিয়ে এমনি করে ঘণ্টা বাজিয়ে সে চলবে···চলবে, শুধু চলবে···। ঘণ্টা বাজিয়ে চলার মজা তাকে অভিভূত করে দেয়। কখন বা কানাই মাষ্টার সেজে বললে—"আমি আজ কানাই মাষ্টার, পোড়ো আমার বিড়াল ছানাটি—"কখনও শিশু কল্পনা করে সে বীরপুরুষ। সেকালের নাইটদের মত তার মনোভাব—

"মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূর
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙ্গা ঘোড়ার পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে—"

এমনি কত কল্পনা শিশুর। কত লড়াই, কত রক্তপাত···হেলায় সে সব সেরে খোকা আবার মায়ের কোলে এসে বসেছে মায়ের খোকা হয়ে—

মাঝে মাঝে হয়ত শিশুর মনে এই অতিবাস্তব পৃথিবীর মূর্খতা দেখে হাসি পায়। কেন তারা এসব বিশ্বাস করে না? কেন তারা ছাতের উপর উঠে একটা বাঁশের খোঁচায় চাঁদটা পেড়ে ফেলে না?

শিশু ভাবে—

"কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে
শুনত যারা আবক হত সবে।—

শিশু যাতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, তাতে কেন অন্য কেউ অবাক হয়ে যায় না।···এই হচ্ছে শিশুব কল্পনা-বিলাস।

শিশুর এই কল্পনা-বিলাস মনোবৃত্তি নিয়ে মনোবিদেরা বহু আলোচনা করেছেন। পাগলেরও কল্পনা-বিলাস আছে কিন্তু তা শিশুর কল্পনা-বিলাস থেকে স্বতন্ত্র। পাগলের কল্পনা-বিলাপ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আহত মনের পলায়নী মনোবৃত্তি মাত্র। আর শিশুর কল্পনা তাঁর আত্মবিস্তারের সহায়ক।

ডঃ মন্তেস্বরী অবশ্য শিশুদের এই কল্পনা-বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মত এতে শিশু কর্মভীরু বাস্তববিমুখ কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়বে। কিন্তু শিশুমনের প্রসারতার জন্য এই জাতীয় কল্পনা-বিলাসের যে একেবারেই প্রয়োজন নেই সে কথাই বা বলা যায় কেমন করে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, কর্মভীরুদের অলস স্বপ্নবিলাস নিন্দনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে যে কল্পনা নতুন নতুন কাজের প্রেরণা জোগায় সেও জীবনাদর্শ রচনার প্রধান উপাদান। শিশুমনের কল্পনা-বিলাস নষ্ট করে দিলে তাকে রূঢ় বাস্তবের ক্রীতদাস করে তোলা হবে, ধুলির ধরণীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তার নষ্ট হয়ে যাবে।

[Dreams are only to be condemned when they are a lazy substitute for an effort to change reality ; when they are incentive, they are fulfiling a vital purpose in the incarnation of human ideals. To kill fancy in childhood, is to make a slave to what exists, a creature tethered to earth and therefor unable to create heaven—" Bertrand Russel]

নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা

(Moral and Religious Education)

নীতিশিক্ষা ঃ

শিক্ষার মূল কথাই হল আদর্শ সামাজিক মানুষ তৈরী করা,—একথা বার বার বলা হয়েছে। মানুষ যতদিন একক আত্মপরায়ণ এবং বনচারী অবস্থায় ছিল ততদিন পশুর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে সেইদিন থেকেই হয়েছে সভ্যতার সূত্রপাত। সেইদিন থেকেই অপরের জন্য তার বিচার-বিবেচনা, চিন্তা ও কর্মে আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিবোধের উন্মেষ। এককথায় পশুস্তর থেকে মানুষের স্তরে যাত্রা শুরু। সুতরাং মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে নীতিবোধ অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত।

স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি পরার্থপরতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণগুলি সামাজিক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। সমাজে যখন থেকে মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই আচার-আচরণগত কতকগুলি বিধিনিষেধ গড়ে উঠেছে এবং এর থেকেই নীতিবোধের উদ্ভব হয়েছে। মানুষ এই সব নৈতিক বিধিনিষেধ মেনে না চললে সমাজের সংহতি যায় নষ্ট হয়ে।

নীতিবোধ বললে ঠিক কি বোঝায় তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। জন ডিউই এই নীতিবোধ (morality) বোঝাতে গিয়ে সাধু উদ্দেশ্য, উন্নত চরিত্র, দুর্লভ আদর্শের প্রতি অনুরক্তি, অপ্রাকৃত শক্তির প্রতি আস্থা এবং সুদৃঢ় কর্তব্যপরায়ণতা—এই সব গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন—

বলাই বাহুল্য, এগুলি সবই সামাজিকতাবোধ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং সমাজের একজন সভ্য হিসাবে বসবাস করতে হলে প্রত্যেককেই এই সামাজিকতা ও নীতিবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তা না হলে সামাজিক শান্তি হবে ব্যাহত। মানুষ যতই জ্ঞানী-গুণী হোক বা পুঁথিগত পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক নীতিপরায়ণ না হলে তাকে নিয়ে কেউ সমাজে শান্তিতে বাস করতে পারে না। নীতিহীন মানুষ আত্মপরায়ণ, স্বার্থান্ধ;

প্রতিবেশী বা দেশবাসী সম্বন্ধে তার চিন্তা-ভাবনা নেই। সমাজে এই জাতীয় মানুষের আধিক্য ঘটলে সমাজ টেকে না, মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ভাবে যে ত্রুটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সমষ্টিগত ভাবে তাই ক্ষতিকর হয়ে দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে।

সুতরাং প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে এই নীতিবোধটি যাতে জাগ্রত হয়ে ওঠে সেইদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

(There is little doubt that the whole purpose of education is not fulfilled unless certain definite moral principles are incullcated in the minds of the youth of the country, —M. Commissions Report.)

পৃথিবীতে বার বার ভয়াবহ যুদ্ধ বাধছে, সভ্যতা বিপন্ন হচ্ছে, মানুষ পশুস্তরে নেমে আসছে।

এর প্রতিকার কোথায় ? মানুষে মানুষে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে, নীতিবোধ জাগ্রত করে তুলতে না পারলে মানবসভ্যতা অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কি করে তা করা যায় ?

নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ত অনস্বীকার্য; কিন্তু কিভাবে সেই শিক্ষা দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। ইতিহাস ভূগোল-গণিত-বিজ্ঞানের মত নীতিশিক্ষা ত পুঁথিগত শিক্ষার বিষয় নয়। নীতিসূত্রগুলি শিশুকাল থেকে মুখস্থ করিয়েও কিছু মাত্র ফল পাওয়া গিয়েছে এমন ত মনে হয় না।

শিশুকাল থেকে নানা ভাবে পড়ে আসছি 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না।'—কিন্তু সেই পাঠ আমাদের আচরণকে একটুও নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে কি ? —তা পারে নি। কারণ নীতিবোধটি পুঁথিগত বিষয় নয়, আচরণগত বিষয়. অর্থাৎ নীতিসূত্রগুলি কেবলমাত্র বই পড়ে জানলেই হবে না, আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলি পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। সুতরাং নীতিশিক্ষা দিতে গেলেও তাকে আচরণের মধ্যে দিয়েই দিতে হয়। এর জন্য আলাদা শিক্ষক, আলাদা পাঠ্যপুস্তক বা আলাদা ঘণ্টা বরাদ্দ করার কোন কথাই ওঠে না।

প্রত্যেকটি বিষয় পঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি শিক্ষক নীতিবোধের গুরুত্ব

ও প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পারেন। বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে নীতিশিক্ষার সুযোগ আবিষ্কার করে নিতে পারেন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

আগেই বলেছি, নীতিশিক্ষা আচরণমূলক বিষয়—সুতরাং শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব এ ক্ষেত্রে বড় কার্যকরী। নীতিবিদ হিসাবে শিক্ষক যদি সমাজের সকালের শ্রদ্ধাভাজন হন তাহলে তাঁর মুখের উপদেশে-নির্দেশে যতটা কাজ হবে, অন্য জনের দ্বারা তা কখনই হতে পারে না।

কথিত আছে 'রাগবীর' প্রধানশিক্ষক ডঃ আর্নল্ডের সম্মুখে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারত না, কারণ তারা জানত যে তিনি কারো কোনো কথাই অবিশ্বাস করেন না। (It is chiefly by his example that Dr. Thomas Arnold made his Rug by boys consider it 'a shame to tell the Headmaster a lie' and add the reason ; He always believes your word—Siqueira). আমাদের দেশেও মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের স্কুলের এই সুনাম ছিল বলে জানা যায়।

শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রে ছাত্রেরা যদি গৌরবান্বিত হয় তাহলে তাঁব প্রভাব অজ্ঞাতসারেই পড়বে ছাত্রদের উপর।

তাছাড়া শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে দিয়েও নীতিবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বলাই বাহুল্য, এই শিক্ষা-পদ্ধতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন প্রকার হবে। অবশ্য বয়স ভেদে, বালক-বালিকা ভেদে, এমন কি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভেদে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

যথা—শিশুশ্রেণীর নীতিশিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে নানাপ্রকার রূপকথা, গল্প কাহিনী ইত্যাদি। ধর্মের বা সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় সেই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠবে।

পরবর্তী স্তরে—নানাপ্রকার অভিযানমূলক কাহিনী, ভ্রমণকাহিনী এবং এমন সব মহাপুরুষ ও বীরপুরুষদের জীবনকাহিনী আলোচনা করতে হবে যাঁরা সত্যের জন্য, লোকহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এ দেশের পল্লীঅঞ্চলে আক্ষরিক-জ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষিতের হার খুব বেশী নয় ; কিন্তু নীতিপরায়ণতার জ্ঞান তাদের কারো চেয়ে কম নয়, এ জ্ঞান তারা লাভ করেছে যাত্রা পাঁচালী, কীর্তন কথকতার মাধ্যমে—রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ কাহিনীর আলোচনায়।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গল্পকাহিনীগুলি শিক্ষকমহাশয় যথাসম্ভব মুখে মুখেই বলবেন। এর জন্যে কোন স্বতন্ত্র বই নির্দেশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এমন কি, এর জন্য কোন স্বতন্ত্র ঘণ্টাও থাকবে না—নানা জাতীয় পাঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে এই জাতীয় গল্পকাহিনী শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করতে পারেন শিক্ষক।

আর একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি। তখন তাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্ত ক্রমশ বাস্তবমুখী হচ্ছে। তাই গল্প কাহিনীগুলিও ক্রমশ বাস্তবমুখী করতে হবে। বাস্তবজীবন থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করলে এই বয়সের ছেলের তা বেশী চিত্তাকর্ষক হবে। মহাপুরুষদের গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি থেকে নীতিশিক্ষার প্রভূত উপকরণ পাওয়া যাবে। এই বয়সে বিদ্যালয়ের কর্মজীবনের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রেখে নীতিশিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয়জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা-সমাধান প্রসঙ্গে নীতিবোধের চর্চা হতে পারে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আচার-ব্যবহারে যে সব ত্রুটি ঘটে, তারা যেসব অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ কর্ম করে, সেগুলির প্রতিকার বা প্রতিবিধানকল্পে নীতিবোধের অনুশীলন করার ফল ভাল হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে—'নীতিশিক্ষা দিচ্ছি' বলে স্বতন্ত্রভাবে কোন শিক্ষা দিলে কোনই কাজ হবে না: বরং উল্টো ফল হতে পারে। নীতিবোধ বাস্তব জীবন-সমস্যা সমাধানে যে কতটা কার্যকরী সেইটে আচারে-ব্যবহারে আলোচনায় শিক্ষায় ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই তা সার্থক হবে। বয়ঃসন্ধিকালে বাস্তবাশ্রয়ী আলোচনাকে একেবারে প্রত্যক্ষ গোচরীভূত করে তুলতে পারলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে নীতিবোধের প্রয়োগ এই বয়সের ছাত্রদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ে নানাজাতীয় শিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষার মূলগত পার্থক্য আছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলির মত পরীক্ষা গ্রহণ করে এই শিক্ষার মূল্যায়ন করা যায় না। এর মূল্যায়ন দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে।

বিদ্যালয়ের সমাজজীবনেই নৈতিক শিক্ষার আলোচনা ও অনুশীলন ঘটে, আবার সেইখানেই আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার পরীক্ষাও হয়ে যায়।

এই আচরণ আবার গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয় এই তিনের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশুজীবনের খণ্ডিতাংশকেই আমরা পাই। কিন্তু

তার বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে গৃহ আর পরিবেশ। সুতরাং নীতিপরায়ণতার চর্চা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিবদ্ধ রাখলে কখনই আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে না।

এ বিষয়ে গৃহের প্রভাবই অবশ্য সবচেয়ে কার্যকরী। গৃহ ও পরিবেশের দুর্নীতিমূলক প্রভাব বিদ্যালয়ের শত শিক্ষাতেও দূরীভূত করা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুশিক্ষায় নীতিচর্চার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বহু সভ্যদেশের বিদ্যালয়ের আজকাল নিয়মিত ভাবে নীতিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

এ বিষয়ে জাপান অগ্রণী। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মান অনুসারে নীতি-শিক্ষা বিষয়কে ধারাবাহিক পাঠ্যপুস্তক সরকারী তত্ত্বাবধানেই রচিত হয়, পঠিত হয় এবং অনুশীলিত হয়। জাপানীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নিয়মানুবর্তিতা বিশ্ববিখ্যাত। নীতিশিক্ষার উপর এতখানি জোর দেওয়াই তার মূল কারণ বলে তারা মনে করে। এ-বিষয়ে একবার আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির রিপোর্টে এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছে—

["—I certainly consider that the courage and devotion of the Japanese soldiers during the war was, to a great exent, the result of this systematic moral instruction and training in schools.]

ফ্রান্সের পাঠ্যতালিকায় নীতিশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে জার্মানীতে বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগরিকতা-শিক্ষার মাধ্যমে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইংলণ্ডে ত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব এককালে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বর্তমানকালে পাবলিক স্কুলগুলিতে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়গুলিতে নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

ধর্মশিক্ষা :

এদেশে ধর্মশিক্ষা দেবার সমস্যা নীতিশিক্ষা দেবার সমস্যা থেকেও জটিলতর। এখানে বহুপ্রকার ধর্ম-উপধর্ম বিদ্যমান। তাছাড়া বহুপ্রকার ধর্ম সম্বন্ধে এখানকার মানুষের স্পর্শকাতরতাও এত বেশী যে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে বা আলোচনা করতে গেলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

ভারতবর্ষ মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক দেশ। এ দেশে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রভাব আজও সর্বাপেক্ষা অধিক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ প্রভাবের প্রতিফলন ঘটে থাকে নানা ভাবে।

বিদ্যালয়ে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলে। শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে নানা ধরনের জ্ঞান আহরণ করে বৃহত্তর সমাজে বিভিন্ন প্রকার কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সেই সব কর্মের পিছনে যদি ধর্মবোধ বা ধর্মভীরুতা না থাকে, মানুষের প্রতি মানুষ যদি সমবেদনা বোধ না করে, স্নেহ ভালবাসা বোধ না করে, পাপপুণ্যের ধারণা দ্বারা তার আচরণ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মানুষের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই করবে বেশী। বিজ্ঞান মানুষকে আজ অমিত শক্তির অধিকারী করেছে। কিন্তু সেই শক্তির প্রয়োগে মানুষ যদি নীতিবোধ ও ধর্মবোধের দ্বারা চালিত না হয় তাহলে তার সর্বনাশা পরিণাম কেউ বোধ করতে পারবে না। আজকের দিনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমশঃ অভিশাপ হয়ে উঠেছে। অনেকের মতে তার একমাত্র কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও অধ্যাত্মবোধের স্বীকৃতি নেই, অপ্রাকৃত ভগবৎশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি, এবং পাপপুণ্যে বিচার দ্বারা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত নয়। এককথায় ঈশ্বরবিহীন শিক্ষা (Godless education) আমাদের যে শক্তি দিচ্ছে সে দানবীয় শক্তি। জনকল্যাণের শুভেচ্ছা দ্বারা তা পরিচালিত নয়। তাতে সভ্যতার অগ্রগতি না হয়ে ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং অধিকাংশ চিন্তাশীল শিক্ষাবিদের মতে সর্ববিধ শিক্ষার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মীয় ভাবের স্পর্শ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ধর্মবোধই মানুষের সামাজিক আচার-আচরণের একমাত্র উৎস। বিখ্যাত স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল পর্যন্ত সামাজিক জীবনে ধর্মের এই গুরুত্ব স্বীকার করেছেন—(religion is the source of the sense of social obligation—Bertrand Russel)।

ইতিপূর্বে নীতিবোধের কথা বলেছি। অনেকের মতে নীতিবোধ ধর্মবোধ থেকেই উদ্ভূত (without religion on morals)। কেউ কেউ হয়ত বলবেন ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলেও নীতিপরায়ণ হতে বাধা কি ? ধর্মবোধ থেকেই হয়ত নীতিবোধের উৎপত্তি ঘটেছিল কোন এক কালে, কিন্তু বর্তমানে ধর্মাচরণের সঙ্গে নীতিপরায়ণতার যোগ অচ্ছেদ্য নয়। তাই অনেক চিন্তাশীল

মনীষীর জীবনদর্শন নীতিবোধের দ্বারা যতটা অনুপ্রাণিত, ধর্মবোধের দ্বারা ততটা নয়।

যাই হোক, সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও কর্মে ধর্মের প্রভাব আজও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং শিক্ষার যদি একটা উদ্দেশ্য হয় সুসমঞ্জস মানুষ তৈরী করা, চরিত্র গঠন করা, তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মবোধের অনুশীলন করা অবশ্য করণীয় হয়ে ওঠে। (Religion is the innermost core of education —Swami Vivekananda)

তাছাড়া আরো একটা কথা ভাবতে হবে।

আগেই বলেছি আমাদের দেশ মূলতঃ ধর্মাশ্রয়ী।

এ দেশের জীবনদর্শন মোটামুটি ভাবে গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। এবং ধর্মহীন-নীতিশিক্ষা এ দেশের মানুষের মনে আকাঙ্খিত শুভফল প্রদান নাও করতে পারে। উপরন্তু কোন এক অতিপ্রাকৃত কল্যাণময় ভগবৎসত্তায় বিশ্বাস রাখলে নীতিশিক্ষা দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালন করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল সব দেশে। এবং বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরই নামান্তর ছিল। তারপর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশ জড়ধর্মী হয়ে পড়তে লাগল। ধর্মীয় বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। শিক্ষা ক্রমশ সরে এল ধর্মীয় প্রভাব থেকে। এইভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা আবার ধর্মহীন শিক্ষায় পরিণত হয়ে পড়ছে।

এই জাতীয় শিক্ষার অনিবার্য পরিণতির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। আজকের চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ তাই শিক্ষাকে আবার ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

(To-day it is the conviction of an increasing number of thoughtful people that education, if it is to produce and maintain a high degree of civilization and to safeguard against periodical lapses into barbarism, must bassed on religion.—J. S. Ross).

অতঃপর বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার কথা আলোচনা করতে হলে সমস্যাটিকে তিন দিন থেকে বিশ্লেষণ করে রাখতে হবে—

(১) **ধর্ম বলতে কি বুঝায়?**

(২) **ধর্মশিক্ষা কারা দেবেন?**

(৩) **ধর্মশিক্ষা কিভাবে দেবেন?**

(১) প্রথমেই **ধর্ম বলতে কি বোঝায়** সংক্ষেপে আলোচনা করি। প্রত্যেক ধর্মেরই দুটো দিক আছে—অন্তরঙ্গ দিক ও বহিরঙ্গ দিক। অন্তরঙ্গ দিকে বুঝি ধর্মের অধ্যাত্ম অংশ। স্রষ্টার স্বরূপ ও সৃষ্টির সঙ্গে তার সম্বন্ধ—এই দার্শনিক বিচাব ধর্মের অন্তরঙ্গ দিকের কথা। নীতিবোধের সঙ্গে ধর্মের এই অন্তরঙ্গ দিকের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। বরং বলা যায় ধর্মের এই অন্তরঙ্গ দিক থেকেই নীতিবোধ উৎসারিত হয়েছে, সুতরাং অন্তরঙ্গ দিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ ত নেই, বরং মিল আছে প্রচুর।

ধর্মের বহিরঙ্গ দিকে বুঝি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের কথা, বিধি-নিষেধের কথা। উপাসনার পদ্ধতি, পূজা-অর্চনার নিয়ম—এ সব বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকার। এই নিয়মেই ধর্মে ধর্মে বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত। অন্তরঙ্গ দিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যেখানে মিলনের কথা বলে বহিরঙ্গ দিকে সেইখানে রক্তারক্তি হানাহানি ঘটে। যা নিয়ে মানুষ মিলবে তাই নিয়েই যত বেশী বিরোধ ঝড় উঠেছে, রক্তপাত ঘটেছে এমন আর কিছুতে নয়। বিশেষতঃ, এই বিরোধ-এ দেশের বুকে যে সুগভীর ক্ষত উৎপন্ন করেছে আজও তাব বেদনায় সারা দেশ মুহ্যমান।

অতএব বিদ্যালয়ে যে ধর্মশিক্ষার কথা বলা হচ্ছে সে হল ধর্মেরই সেই অন্তরঙ্গ দিক। সাধারণ ব্যক্তিরা ধর্মের এই বাহ্যিক খোলসটাকে একমাত্র সত্য ধর্ম বলে মনে করে বলেই ধর্ম মানুষের বিরোধকে জাগিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ের কাজ হল ধর্মের সেই অন্তরঙ্গ দিকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তার ফলে মানুষে মানুষে বিরোধ দূর হয়ে যাবে। মিলনের পথ হবে প্রশস্ততর।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যার কথা অনেকে বলেন, আপাত-বিরোধী বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে দার্শনিক স্তরে এসে সামঞ্জস্যের সন্ধান মেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি সেই স্তরে দর্শনতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়? বরং ধর্মাচরণের

যে সব আচার-অনুষ্ঠান ছেলেমেয়েরা সহজেই শিখতে পারে বিরোধের বীজ ত সেখানেই লুকিয়ে আছে।

উত্তরে বলতে পারি ধর্মের মিলনাত্মক তত্ত্বগুলি আদৌ জটিল নয় বরং সহজ সরল এবং সত্যাশ্রয়ী। ধর্মের এই মূল কথাই হল নীতিকথা এবং সর্বজনের অনুভূতিগ্রাহ্য।

বস্তুতঃ ধর্ম বুদ্ধি দিয়ে শিখবাব জিনিস নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস। এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনুভূতিপ্রবণ, সহৃদয়। তাই এ'জাতীয় আশঙ্কায় কোন কারণ আছে বলে মনে করিনে।

(২) এইবার দ্বিতীয় আলাচ্য বিষয়, এই জাতীয় **ধর্মশিক্ষা দেবার ভার থাকবে কার উপর ?**

আগেই আমবা দেখেছি গৃহই হল মানুষের প্রথম শিক্ষালয়। পিতামাতাই হলেন প্রথম শিক্ষক। বিশেষতঃ, ধর্মশিক্ষা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শিক্ষা ছেলেমেয়েরা বাপমায়ের কাছ থেকেই প্রথমে শেখে। এই হিসাবে অনেকে বলেন—"যদি ধর্মশিক্ষা দিতে হয় তবে পরিবারেই তা ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যত্র কোথাও নহে। গৃহ এবং পরিবারই তো ধর্ম-শিক্ষা দিবার প্রশস্ততম ও অনুকূলতম ক্ষেত্র।"

কিন্তু এ কথাও পুরোপুরি সত্য নয়। ধর্মের এই আধ্যাত্মিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের মধ্যে ত সুলভ নয় তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যেও তা সহজে আসে না বরং উল্টো শিক্ষাটাই প্রকট হয়ে ওঠে! সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্যও কি মৌলবী মোল্লা পাদ্রী পণ্ডিত জাতীয় ধর্মীয় গোঁড়াদের উপর নির্ভর করতে হবে! এর জন্যও কি ধর্মশিক্ষার প্রথম-পাঠ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে? বলাই বাহুল্য তাতে আমাদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ ত হবেই না বরং ফল বিপরীত হতে পারে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাহ্যিক দিক প্রধান হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িকতায় তীব্র হলাহল সৃষ্টি করতে পারে।

নীতিশিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছি—প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রত্যেকটি বিষয় অবলম্বন করে ধর্মীয় ভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করতে পারেন। ইতিহাস ভূগোলের মত ধর্ম একটা স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় নয়, সমস্ত পঠনীয় ও আচরণীয় বিষয়ের মধ্যে তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার সময়েও সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধর্ম শিক্ষণীয় বিষয় নয়, উপলব্ধির বিয়য়। এইজন্য

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে হলে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে ভগবৎভক্তিমূলক প্রার্থনা বা ঈশ্বরস্তোত্র সমবেতভাবে পাঠ করা যেতে পারে।

এছাড়া সমস্ত ধর্মের সার কথা, অর্থাৎ ধর্মের অন্তরঙ্গ তত্ত্বকথা সঙ্কলন করে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করলে বিশ্বজননীন ধর্মবোধ বা আস্তিক্যবুদ্ধি-সঞ্জাত ভগভক্তির সঞ্চার হবে ছাত্রদের মনে। এইভাবে সর্বধর্মের আপ্তবাক্য সঙ্কলন করলে দেখা যাবে বিভিন্ন ধর্মের মূলকথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় এই জাতীয় ধর্মশিক্ষার কথা বলেছেন মহাত্মা গান্ধী—
(Fundamental principles of ethics are common to all and that should be regarded as adequate religious instruction so far as schools under the Wardha scheme concerned —M. Gandhi)।

ভারতে বহু ধর্মমত বিদ্যমান তাই এদেশে এই ধরণের সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক পাঠ প্রণয়ন করা ছাড়া গতি নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে (রাশিয়া ছাড়া) প্রাথমিক শ্রেণীতে নিয়মিতভাবে ধর্মশিক্ষা দেখার ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক স্কুলগুলিতে ধর্মশিক্ষা দেবার উপযোগিতা ক্রমেই বেশী করে উপলব্ধি করা হচ্ছে—(History reveals the belief of the American people in God. The public school reflects this belief in high degree. We approach the basic ethical values of life through the concepts of Fatherhood of God and the Brotherhood of Man.

—F. J. Brown)

ভারতবর্ষে বহু ধর্মমত প্রচলিত, তাই এখানকার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ—কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত সরকার স্বীকার করেননি। মহাত্মা গান্ধী ত স্পষ্টই বলেছেন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে, অর্থাৎ দেশ এক ধর্মাবলম্বী না হলে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

(Unless there is a State-religion, it is very difficult, if not

impossible, to provide religious instruction as it would mean providing for every denomination—M. Gandhi)

প্রত্যেকটি ধর্মের জন্য স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থা করতে গেলে বিদ্যালয়ে অন্যকিছু পড়াশুনার ত সময়ই থাকবে না সুতরাং তা আদৌ সম্ভব নয়। অগত্যা সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্বকথা আলোচনার কথাই বলেছেন অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোর দিয়েই উল্লেখ করেছেন। কমিশন বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক প্রার্থনার সুপারিশ করেছেন, তাছাড়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদের জীবনী ও বাণী স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে পঠনপাঠনার প্রস্তাব করেছেন।

মুদালিয়র কমিশনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মশিক্ষা দেবার অসুবিধা স্বীকার করে তাকে ঐচ্ছিক হিসাবে প্রবর্তন করার কথা বলেছেন।

(This does not imply that because the State is secular. There is no place for religion in the State. All that is understood is that the State as such shauld not undertake to uphold activity, assist, or in any way to set its seal of approval on any particular religion. It must be left to the people to practice whatever religion they feel is in conformity with their inclinations, culture and hereditary influence —M. Commission's Report)

(৩) অতঃপর, এই **ধর্মশিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায়** সে সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করি।

ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকার।

শিশুকালে ভগবান বলতে স্নেহশীল সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষের একটা ছবি মনের মধ্যে এঁকে নেয় শিশুরা।

তিনি সব দেখতে পান, জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, ভক্তিভরে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা পূরণ করতে পারেন—এই ধারণা গড়ে ওঠে তাদের মনে। তাই গোপনে কোন অন্যায় কাজ করতেও তারা ভয় পায়। ভগবান তাদের কাছে ভয় ও ভালবাসার মিশ্রিত রূপ।

এই বয়সে নানারকম পুরাণ বা ধর্মসংহিতার গল্প তাদের ভাল লাগে বা

তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাক্-কিশোর মনে ভালমন্দ সত্যমিথ্যা বা পাপপুণ্যের জ্ঞান কর্তব্যবুদ্ধি এবং সদাচরণের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতে এই জাতীয় ধর্মভীরুতার প্রভাব যে কত বেশী তা বলাই বাহুল্য। কৈশোর বা কৈশোরোত্তর কালে ছেলেমেয়েরা ধর্মবোধ সম্বন্ধে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বিচার করতে শিখেছে। সুতরাং সেই সময়ে শুধু পাপপুণ্যের ভয় দেখিয়ে তাদের ধর্মপথে আকর্ষিত করা যায় না। এই সময়টা হল বীরপূজার (Hero worship) সময়। কিশোর চিত্ত আদর্শ হিসাবে যাকে গ্রহণ করে অজ্ঞাতসারে তারই ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ে। সেইজন্য এই বয়সের ছেলেমেয়ের কাছে মহাপুরুষদের ও সাধুসন্তদের জীবনকাহিনী আলোচনা করা ভাল।

এই বয়সে জোর করে কোন কিছু শেখাতে বা মানাতে গেলে তার ফল হয় উল্টো। বুদ্ধি বিচারে যা তারা ভাল বলে মনে করছে তাকে জোর করে ধর্মবিরুদ্ধ বললেই তারা মেনে নিতে চাইবে না। মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই অসামাজিক হয়ে পড়তে পারে। এদেশে উনবিংশ শতকের গোড়ায় শিক্ষিত যুবকদের মনে এই জাতীয় একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার একটা প্রবল সংঘাত শুরু হয় তখন এবং সেই সংঘাতে বাংলার অনেক শিক্ষিত যুবক পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই যুগের সেই মানসিক উন্মার্গগামিতা রোধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবে এবং উপদেশ-নির্দেশে ধর্মীয় উন্মার্গগামিতা প্রতিরুদ্ধ হয়।

সুতরাং সামাজিক কঠোরতা প্রয়োগ করলেই মানুষকে ধর্মপরায়ণ করে তোলা যায় না। বাল্যকাল থেকেই তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্মবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করতে হয়। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক্ষ শিক্ষা ও পরোক্ষ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের ধর্মবোধ উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। সকল দেশের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী অনুশীলন করার ফলে তাদের মন হবে উদার, সংস্কারমুক্ত, ধর্মভীরু ও ঈশ্বরপরায়ণ। প্রাত্যহিক ঈশ্বরস্তোত্রের মাধ্যমে তারা মঙ্গলময় ভগবানের অসীম করুণা উপলব্ধি করতে শিখবে এবং সমস্ত জীবনই ভগবানের সৃষ্টি, এই বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে শিখবে এবং পরমতসহিষ্ণু হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মবোধ যে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেবার বিষয় নয় সে কথা যেন আমরা না ভুলি। বিদ্যালয়গুলিতে যদি এমনি পবিত্র ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারা যায় তবেই ধর্মশিক্ষা সহজ হবে। শিক্ষকদের জীবন যদি ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তবেই তাঁদের সঙ্গ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে ধর্মাচরণে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—তিনি বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"—নিজেদের অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষ-ভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনই সহজ হইবে না। যেমন, 'অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব, বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো। তাহার পাওয়া ও দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। * * * এই জন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে।"

শাসন ও শৃঙ্খলা

(Order and Discipline)

পার্বত্য নদীর বন্যাধারার বাঁধনহারা মূর্তি ভয়াবহ। তার উন্মত্ত প্লাবনে ভেসে যায় গ্রামের পর গ্রাম। অথচ সেই বন্যাধারাকে যদি নিয়ন্ত্রিত করে নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে বহান যায় তবে তাকে কল্যাণবর্ষী শক্তির উৎস বলে মনে করি। মানুষের শক্তিও যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্বেচ্ছাচারধর্মী হয়ে ওঠে, তবে তা তার নিজের এবং সমাজের উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর হবে।—অথচ তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করতে পারলে সমাজের পক্ষে হয় কল্যাণকর।

মানুষ যেদিন থেকে সমাজ বেঁধে বাস করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আচার-আচরণকে 'বহুজনহিতায়' অর্থাৎ সমাজের সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করবার প্রয়োজন অনুভব করছে।

বিদ্যালয় ত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখান থেকেই তার আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবার শিক্ষা শুরু হয়। সুতরাং শৃঙ্খলাবোধের প্রথম অনুশীলন-স্থান হল বিদ্যালয়। আমাদের চরিত্রগঠন থেকে শুরু করে সর্বপ্রকারে জ্ঞানানুশীলনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই শৃঙ্খলাবোধের আবশ্যকতা।—অর্থাৎ শৃঙ্খলাই হল জীবনের ছন্দ, বিশৃঙ্খল ছন্দহীন জীবন সমাজের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তার নিজের পক্ষেও তা তেমনি হানিকর।

এই শৃঙ্খলার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন—কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের পরিকল্পনায় মানুষের স্বভাব, চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাই হল শৃঙ্খলা—তা সে নিয়ন্ত্রণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হোক, বা বাইরের চাপেই হোক।

[It is a regulation imposed or spontenous of conduct of thought and of feeling, with the aim of furthering some purpose...]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শৃঙ্খলাবোধের উদ্দীপনাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভিতর থেকেও আসতে পারে আবার অপরের শাসনের চাপে বাইরে থেকেও আসতে পারে।

শাসন (order) ও **শৃঙ্খলা** (discipline) :

শৃঙ্খলাবোধের এই উদ্দীপনার উৎস হিসাবে এ'কে দুই নামে উল্লেখ করা যায়—**শাসন** ও **শৃঙ্খলা**। শব্দদুটি একার্থবাচক নয়, যদিও সাধারণভাবে এদের যুক্তভাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শাসন হল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আর শৃঙ্খলা হল ভিতরকার স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। বাইরে থেকে নানাপ্রকার ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে শান্ত করে রাখবার যে প্রক্রিয়া তাকেই বলা হয় **শাসন** (order), আর অন্তর থেকে আপনা হতেই নিয়মানুর্তিতা ও সংযত ব্যবহারের যে ইচ্ছা জাগে সেই হল **শৃঙ্খলা** (discipline)।

মোটকথা, শাসন বাধ্যতামূলক আর শৃঙ্খলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। শাসন বজায় রাখতে গেলে চাই শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ আর শৃঙ্খলার জন্য চাই ছাত্রের আন্তরিক সদিচ্ছা ও নিয়মনিষ্ঠার প্রতি একটা শ্রদ্ধা।

বিদ্যালয়ে এককালে শাসন বজায় রাখাটাই ছিল বড় কথা, যেমন করেই হোক শ্রেণীকক্ষে একটা নিস্তব্ধ শান্তি বজায় রাখতে পারলেই শিক্ষক সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাসাধনই হল কাম্য। বিদ্যালয়ে এমন একটা সুন্দর শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় এবং আনন্দে শিক্ষকের আদর্শ পালন করতে উৎসুক হয়, পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশায় বেশ ভদ্র এবং সংযত ব্যবহার করতে আগ্রহী হয় এবং বিদ্যালয়ের যাবতীয় নিয়মাবলী স্বেচ্ছায় পালন করতে উৎসাহী হয়।

মোটকথা, শৃঙ্খলা জোর করে মানাবার জিনিস নয়, আপনা থেকেই মানবার জিনিস। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নিজের থেকেই শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা, শাসনের বন্ধন স্বীকার করে নেয়। এই সংযম তারা বিদ্যালয়ের সংযত পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মবিকাশের প্রয়োজনেই মেনে চলে।

তবে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শৃঙ্খলাবোধ বেশীদিনের কথা নয়। আগেই বলেছি বহুকাল পর্যন্ত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শাসনকেই শৃঙ্খলা বলে আমরা মেনে এসেছি।

দেশকাল ভেদে এই শৃঙ্খলাবোধের অনুশীলন কোথায় কবে এবং কি ভাবে শুরু হয়েছে তা আলোচনার যোগ্য।

শৃঙ্খলাবোধের ঐতিহাসিক পটভূমি :

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্যপালনের অত্যন্ত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্বপ্রকার

বিলাসব্যসন-বিবর্জিত সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ছিল ছাত্রদের অবশ্যকরণীয়। তার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে নানাপ্রকার কঠিন শাস্তি পেতে হত। সুতরাং এই জাতীয় শৃঙ্খলাকে হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত বলা যাবে না, কারণ বাইরের শাসনেই তার উদ্ভব। তবু প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমিক নিয়মানুবর্তিতার পটভূমিতে তপোবনের গুরুগৃহে যে ছাত্রজীবন গড়ে উঠত তাতে শৃঙ্খলা কখনই শৃঙ্খল হয়ে উঠত না। মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযমের রজ্জুতে বেঁধে রাখবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

…"ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়। যেখানে সাধনা চলেছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে, তাই লাভ করবার স্থান।—"

প্রাচীন গ্রীসের ছাত্রজীবনের কঠোরতা বড ছিল না। স্পার্টানদের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবিধান ছিল অত্যন্ত কঠোর। স্পার্টান বালকেরা রাষ্ট্রের স্বার্থেই ছিল উৎসর্গীকৃত। তাই তাদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কঠোরতম আইন শৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধে বাল্যকাল থেকেই তাদের সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলা হত।

আবার এথেন্সের গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষাও ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই বালকদের শৃঙ্খলাবিধানের মধ্যে, সেখানে অনেকখানি স্বাধীনতার অবসর ছিল। বালকদের ব্যক্তিগত কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার উপরই শৃঙ্খলারক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যযুগে সারা ইয়োরোপ জুড়ে শৃঙ্খলাচর্চা ছিল একান্ত বাধ্যতামূলক এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাপেক্ষ। অবশ্য তাদের এই প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের পিছনে একটি দার্শনিক যুক্তিও ছিল। বাইবেলে বলেছে, আদি পিতামাতা আদম-ইভের আদি-পাপ থেকেই মনুষ্যজাতির উদ্ভব—সুতরাং পাপপ্রবণতা প্রত্যেকটি জাতকের সহজাত। কঠোর শাসনের দ্বারাই তাদের সৎপথে রাখা যায়, নইলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা নেমে আসবে অসৎ পথে!

হিন্দুদর্শনে এই জাতীয় আদি পাপের কথা বলা না হলেও কোন কোন মতে বলা হয়েছে—মায়া-কবলিত জীব স্বাভাবিক ভাবেই ভগবৎবিমুখী। সাধনার দ্বারা মায়াপাশ ছেদনপূর্বক জীবকে ভগবৎমুখী হতে হয়, সুতরাং মানবশিশুকে সৎপথে রাখবার জন্য সাধনার দরকার, বাইরের শাসনও দরকার। মোটকথা—বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাই শৃঙ্খলা ও শাসন একার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শৃঙ্খলা বনাম শাসন ঃ

বিদ্যালয় বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে একটা ছবি—বেত্রপাণি রক্তচক্ষু মাস্টারমশাই বসে বসে হুঙ্কার দিচ্ছেন আর সামনে কয়েকসার ভীত সন্ত্রস্ত নিরীহ মানবক প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। শুধু কি বেত? ইস্কুলের পিনাল কোডে বিভিন্ন অপরাধের বিচিত্র ধরণের শাস্তিব বরাদ্দ করা আছে···শিক্ষকমশাই গৌরব করে বলেন—আমাকে দেখে ছেলেরা যমের মত ডরায়—কারো টুঁ শব্দ করার জো নেই। ডিসিপিলিন কি আর সবাই রাখতে পারে?

সত্যি, গৌরবের কথাই বটে। এতগুলি নবোদ্গত-পল্লব কচি কিশলয়ের উপর শাস্তির শিলাবৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা কি সকলের থাকে? শিশুদের মানুষ করবার কঠিন দায়িত্ব কি সোজা কথা? বজ্জাত ঘোড়াকে একটু রাস আলগা দিলে আর রক্ষা নেই, ফাঁক পেলেই তারা বিপথে ছুটবে ··শিক্ষকমশাই তাদের সদাজাগ্রত রক্তচক্ষু মেলে সামলে রাখছেন।

শিক্ষকদলের উপর এই পুলিশি কর্তব্যের ভার শুধু যে আজ আমাদের দেশেই বর্তমান তা নয়, কিছুকাল আগেও পৃথিবীর সর্বত্রই দণ্ডপাণি শিক্ষকের প্রবল প্রতাপ ছিল। রাষ্ট্রতন্ত্রের মত শিক্ষাতন্ত্রেও ল' এণ্ড অর্ডার (Law and Order) রক্ষা করে চলবার প্রধান উপকরণ ছিল বিদ্যালয়ের পিনালকোড। মোট কথা, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা, অর্থাৎ শাসনতাড়িত শৃঙ্খলাই বিদ্যালয়ের একমাত্র অনুশীলনীয় বলে বহুকাল ধরে চলে আসছিল।

কিন্তু বর্তমানের শিক্ষাবিদেরা এই জাতীয় শাসনতাড়িত শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা বলেই স্বীকার করতে চান না। অর্থাৎ এইভাবে জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যে শৃঙ্খলা বা ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখার ফলে যে শান্তি, তার কোন মূল্যই নেই আজকাল শিক্ষাবিদদের কাছে।

তাঁরা বলেন, সত্যকার শৃঙ্খলাবোধ আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা থেকে। অর্থাৎ শৃঙ্খলা মেনে চলবার ইচ্ছাটা ছাত্রদের মনে যখন আপনা থেকেই জাগ্রত হবে তখনই সেটা হবে সত্যকার শৃঙ্খলা।

শৃঙ্খলার প্রকার ভেদ ঃ

এই হিসাবে শৃঙ্খলাকেই মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়— **নেতিবাচক শৃঙ্খলা** (Negative discipline) ও **ইতিবাচক শৃঙ্খলা** (Positive discipline)। নেতিবাচক শৃঙ্খলাবোধের উৎপত্তি ভয় থেকে। সর্বপ্রকার অন্যায় থেকে সে প্রতিনিবৃত্ত রাখতে পারে মাত্র, ন্যায় কর্মে পরিচালনা করতে পারে না। কিন্তু ইতিবাচক শৃঙ্খলাবোধ সৎকর্মের দিকে আকৃষ্ট করায়।

এই ইতিবাচক শৃঙ্খলাবোধ আপনা থেকেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে ছাত্র শুধু অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাই নয়, সৎকর্মেও আগ্রহান্বিত হয়। বলাই বাহুল্য এই শৃঙ্খলাধোধ শাসনতাড়িত আজ্ঞানুবর্তিতা নয়, নিষেধাত্মকও নয়।

আগেই বলেছি, মধ্যযুগে শৃঙ্খলা ও শাসন একার্থবাচক বলেই মনে করা হত। সেকালের শিক্ষকমশাইরা চাইতেন ছাত্রেরা ক্লাশে কাঠের পুতুলের মত বসে থাকবে—একটি কথা নয়, একটু নড়াচড়া নয়। শিক্ষকের প্রতি অপরিসীম বাধ্যতাই হল শৃঙ্খলার মূল কথা। শিক্ষকমশায়ের নির্দেশ—শুধু 'এটা করো', 'ওটা করো না'। ক্লাশে এই জাতীয় জবরদস্তি-শাস্তিকে মাদাম মন্তেস্বরী বলেছেন মৃতের শান্তি (a set of butterflies transfixed with pins to their seats)

শিশুদের মধ্যে সৃজনধর্মী মন আছে—সব সময়েই সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়; খেলাধুলা গান নৃত্য এবং নূতন কিছু করার আনন্দ তাকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। শৃঙ্খলার নামে তার সৃজনধর্মী মনের ধ্বংস সাধন করার চেয়ে অন্যায় আর নেই। ভুল করবে ভেবে কোন কিছুই যদি তাকে করতে না দেওয়া হয় তাহলে ভাল কাজই বা সে করবে কি করে— রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—"দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি। সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।" ভুলের মধ্যে দিয়েই ত সত্যের আবির্ভাব ঘটবে একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রকৃত শৃঙ্খলাই হল স্বতঃস্ফূর্ত। শিশুর নিজের ইচ্ছাতেই তার উৎপত্তি।

আসল কথা হল—শৃঙ্খলা মানাবার বস্তু নয়। নিজের প্রয়োজনেই তা মেনে চলবার বস্তু। শাসন গর্জন ভয় ভীতির দ্বারা তাড়িত না হয়েও আপনার ইচ্ছাতে ছাত্র যখন বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চায় তখনই প্রকৃত শৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছে বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে এই ইতিবাচক শৃঙ্খলার চর্চা কিভাবে করা যায়, তাই হল সমস্যা।

অধ্যাপক নান্ সাহেব এই শৃঙ্খলা অনুশীলনের কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমে জাগে আন্তরিক্ ইচ্ছা, তারপর নিজের অক্ষমতার উপলব্ধি, তারপর মনোযোগ, তা থেকে পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা এবং শেষে তা থেকে সাফল্যের উৎপত্তি। এই ভাবে প্রকৃত শৃঙ্খলার উৎপত্তি ঘটে শিশুমনে।

[First there must be something that one genuinely desires to do, and one must be conscious either of one's inability or of some one else's superior ability to do it. Next, the perception of inferiority must awaken the negative self-feeling within its impulse te fix attention upon the points in which one's own performance falls short or the model's excels. Lastly, comes the repetition of effort, controlled now by a better concept of the proper procedure, and accompanied, if successful, by an overflow of positive self-feeling which tends to make the improved scheme permanent.]

শৃঙ্খলা রক্ষার ইচ্ছাটি শিশুমনে জাগ্রত হলেই তা থেকে শিশু নিজের অক্ষমতা দুর্বলতার প্রতি সচেতন হয় এবং সেই প্রসঙ্গে তার আদর্শের সক্ষমতার প্রতি হয় শ্রদ্ধাশীল। সেই দিকে মনোযোগী হতে চেষ্টা করে। এই ভাবে অক্ষমতার দিকে মনোযোগী হলে স্বভাবতই বারে বারে তারা আদর্শ অনুসরণের চেষ্টায় উদ্যোগী হবে এবং তার ফলে সাফল্য লাভ ঘটবে। অর্থাৎ শৃঙ্খলাপালনের গোড়ার কথাই হল অক্ষমতার অনুভূতি বা হীনমন্যতার ভাব (Negative self-feeling)। তা থেকেই ক্রমশ উদ্ভব ঘটবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের (Positive self-feeling) অনুভূতি।

শৃঙ্খলাবোধের ক্রমবিকাশকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা—

(১) শারীরিক শাসননির্ভর (Phlebotomy)
(২) অবদমননির্ভর (Repressionistic)
(৩) প্রভাবনির্ভর (Impressionistic)
(৪) স্বতঃস্ফূর্তিনির্ভর (Expressionistic)

এই চারিটির মধ্যে প্রথম দুটিকে নেতিবাচক (Negative) শৃঙ্খলা এবং শেষ দুটিকে ইতিবাচক (Positive) শৃঙ্খলা বলতে পারি। সংক্ষেপে এই চার শ্রেণীর শৃঙ্খলাবোধের আলোচনা করেই আমাদের বক্তব্য পেশ করব।

(১) শারীরিক শাসননির্ভর :

শারীরিক শাসননির্ভর শৃঙ্খলার কথা ইতিপূর্বে বিশেষভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এই মতে শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায় হল বেত অর্থাৎ শারীরিক শাস্তি প্রদান। বেতের ব্যবহারে কার্পণ্য করলে ছেলে গোল্লায় যাবে (spare the rod and spoil the child), এই ছিল সাবেক কালের শৃঙ্খলার মূলনীতি। রহস্য করে তাঁরা বলতেন, 'ছেলের কানদুটো তার পিঠের উপর থাকে। পিঠের উপর ঘা কতক না দিলে তাদের কানে কিছু ঢোকে না'—(a boy's ear is on back, he does not listen if his back is not touched.)

এই জাতীয় বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলাবোধের ব্যর্থতা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

(২) অবদমননির্ভর :

অনেক সময় বেতের ভয় দেখিয়ে শিশুমনকে শাসন করা যায় না। তাই তাদের সদা-চঞ্চল মনকে সব সময়েই বিষয়ান্তরে ব্যস্ত রেখে সুশাসন বজায় রাখবার চেষ্টাও করেছেন অনেকে। কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। তাই কর্মহীন শিশুমন সব সময়ে শয়তানি বুদ্ধির আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেরা সব সময়েই কাজ চায়। হাতে কাজ না থাকলেই 'একটা কিছু হাঙ্গামা' বাধাতে লেগে যাবে তারা। বিদ্যালয়ে এমন একটা কর্মসূচী তৈরী করতে হবে যাতে আজে-বাজে চিন্তা করবার একটুও সময় না পায় তারা। ছাত্রেরা কি ভাবে অবসর যাপন করবে তা নিয়েও অনেক শিক্ষাবিদ প্রচুর গবেষণা করছেন। —নানা কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে

তা থেকে তাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সময় সুযোগ থাকবে না। দুষ্টপ্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্‌গতি ঘটবে। অবদমিত হবে তাদের দুর্বাসনা।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে—এই পন্থাও শৃঙ্খলাবিধানের আদর্শ পন্থা নয়।

(৩) প্রভাবনির্ভর :

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার অন্যতম কার্যকরী পন্থা হল শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব। বীরপূজা বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক চিত্তধর্ম। সুতরাং এই সময়ে অনুকরণ (imitation), অভিভাবন (suggestion) ও অনুবেদন (sympathy) এইগুলির সাহায্যে শিক্ষকগণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সহজেই শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলাবিধান করতে পারবেন। এই হিসাবে ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়মানুবর্তী করবাব চেষ্টা হয়েছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুল রাগবীর স্বনামধন্য প্রধান-শিক্ষক ডঃ আর্নল্ডকে এই মতবাদের পথিকৃৎ বলা যায়।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে, চারিত্রিক সৌন্দর্য না থাকলে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা করে চলা যায় না। জ্ঞানে গুণে চরিত্রমাধুর্যে নিয়মানুবর্তিতায় আদর্শচরিত্র শিক্ষকের প্রভাব অজ্ঞাতসারেই শিশুচরিত্রকে প্রভাবান্বিত করবে। ছাত্রগণ সব সময়েই বোঝে শিক্ষক কত জ্ঞানী কত মহানুভব কত দরদী। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রও নিজেকে তার তুলনায় কতটা অকিঞ্চিৎকর, এটা বুঝতে শিখবে। শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি কববেন যে, ছাত্র যেন তাঁর কাছে এলেই হীনমন্যভাব অনুভব করে। শিক্ষকের শাসন নয়, ভালবাসাই হবে শৃঙ্খলারক্ষার মূলকথা (discipline must be based on and controlled by love—Pestalozzi)।

মোটকথা, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার কাজে বইয়ের থেকে তর্জন-গর্জন শাসনের ভীতির দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না। আদর্শ-শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ছেলেরা আপনা থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে এবং নিয়মানুগ হয়ে চলবার চেষ্টা করে।

(৪) স্বতঃস্ফূর্তিনির্ভর :

কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রের প্রকৃত আত্ম-বিকাশের সহায়ক না হয়ে পরিপন্থীই হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি শিশু তার

নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মেছে এবং এই স্বাতন্ত্র্যই আনবে বৈচিত্র্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মূল্য আছে, প্রত্যেকটি শিশু বেড়ে উঠবে তার স্বাধীন সত্তায়। কোন আদর্শবাদের অজুহাতেই তাদের সকলকে একছাঁচে ঢালা চলবে না।

সেইজন্য শৃঙ্খলারক্ষার খাতিরেও তাঁরা ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট আদর্শবাদের আওতায় রাখতে চান না—সে আদর্শ যত বড়ই হোক। শিশু বেড়ে উঠবে সম্পূর্ণ তার নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে। সুতরাং তাঁদের মতে যতক্ষণ না ছাত্র তাদের আচার-আচরণে অপরের কাজে কোন বিঘ্ন উৎপাদন না করছে, অনিষ্ট না করছে, বা বিদ্যালয়ের কর্ম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি না করছে ততক্ষণ তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণ নেই; এমনকি শিক্ষকের প্রভাব বিস্তারেরও কোন অবশ্যকতা নেই। মাদাম মন্তেস্বরী এই মতের প্রধান সমর্থক।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার মূল কথা হল প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান, শুধু তাই নয় ছাত্রের, ব্যক্তিত্বের প্রতি যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন।

মানুষ ফুটে উঠতে যাচ্ছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, বাইরের প্রভাবে বা আওতায় তার সেই বৈশিষ্ট্য বিকাশের সম্ভাবনা পঙ্গু হয়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিত্বের অবহেলা তার আত্মবিকাশের পরিপন্থী। তাই সমস্ত কাজে তাকে স্বাধীনতা দিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে তার মনে জাগিয়ে তুলতে হবে দায়িত্ববোধ, ফুটিয়ে তুলতে হবে তার ব্যক্তিত্ব, জাগ্রত করতে হবে আত্মসম্মানবোধ।

শৃঙ্খলার গোড়ার কথাই হল দায়িত্বজ্ঞান। ছেলেদের বিশ্বাস করে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের এই দায়িত্বজ্ঞান যদি জাগ্রত করে তোলা যায়, তাহলে শৃঙ্খলারক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে।

এই ভাবে স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে শিখবে শৃঙ্খলার মূল্য।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র একসঙ্গে এসে মিলিত হয়, দিনের কয়েকঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করে, শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করে শিক্ষা লাভ করে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বিষয় জ্ঞান অর্জন করে ছেলেরা, অন্যদিকে তেমনি সচ্চরিত্রতা সামাজিকতা, নিয়মানুবর্তিতা

প্রভৃতি গুণগুলির চর্চা হয়। কিন্তু ছেলেরা যদি নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলতে ফিরতে চায়, আচার-আচরণের কোন নিয়ন্ত্রণ না মেনে চলে তবে বিদ্যালয়ের মূল কাজটাই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ঘটে। বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তাহালে শিক্ষক মহাশয়রাও সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করতে পারবেন না, এমন কি বিদ্যালয়-পরিচালনার দিক থেকেও গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। শৃঙ্খলা রক্ষা করবার সঙ্গে শিক্ষাদান কার্য অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত।

দ্বিতীয়তঃ, শিশু-ছাত্রদের চরিত্রগঠনের জন্যও শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিশুরা ত স্বভাবতই চঞ্চল। তাছাড়া কর্তব্য কর্মের গুরুত্বও তারা ভাল করে অনুধাবন করতে পারে না এবং এর শুভাশুভ বিচারশক্তি তাদের তেমন সুগঠিত হয়নি। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নির্দেশে যদি শৃঙ্খলা বজায় না রাখা যায় তাহলে শিশুদের চরিত্র গঠনই সম্ভবপর হবে না। ব্যবহারের দিক দিয়ে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

তৃতীয়তঃ, উত্তর জীবনে গঠনমূলক কোন কিছু করতে গেলে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করতে গেলে প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয় থেকে তার অভ্যাসটি ভালভাবে অনুশীলন না করলে উত্তরজীবনে আর তা অভ্যাস করা যাবে না।

চতুর্থতঃ, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশকে জাতিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে উন্নত করে তুলতে হলে প্রত্যেককেই শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে এবং এই গুণটি শিশুকালে বিদ্যালয়-জীবন থেকে অনুশীলন না করতে পারলে কখনই তা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় না।

শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা :

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার নানা প্রকার প্রতিবন্ধক আছে। তার ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অনেক সময় সমস্যার বিষয় হয়ে ওঠে।

এই প্রতিবন্ধকগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—

(ক) **বাহ্যিক** (External) ও (খ) **আভ্যন্তরিক** (Internal) :

(ক) **বাহ্যিক :**

(১) **বিদ্যালয় গৃহের পরিবেশ ও অবস্থান**—বিদ্যালয় গৃহের আদর্শ পরিবেশ বা অবস্থান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে যে সব আলোচনা করা হয়ে থাকে সে

সব এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেবল মাত্র শৃঙ্খলা রক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে যে সব স্থান বিদ্যালয় স্থাপন করবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সেগুলির কথাই এখানে উল্লেখ করি। অনেক বিদ্যালয় দেখেছি শহরের বড় রাস্তার উপর এমনভাবে অবস্থিত যে শ্রেণীকক্ষের পাশ দিয়েই অনবরত বাস্, লরি, ট্যাক্সি গাড়ী ঘোড়া ছুটছে বিকট শব্দ করতে করতে। কোন কোন স্কুল আবার রেল লাইনের ধারে এমন স্থানে অবস্থিত যে দিবারাত্র ট্রেনের যাতায়াতের শব্দে পড়ানই কঠিন, ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দেওয়া ত দূরের কথা।—এ সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের কাছ থেকে পড়শুনায় মনোযোগ বা শৃঙ্খলা রক্ষার আশা করা অন্যায় নয় কি ?

(২) **শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ**—ছাত্রেরা যেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে বাধ্য হয় সেই স্থানের পরিবেশ মনের উপর ত যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করবে। চুন-বালি-খসা, নোংরা ঝুল ভরতি দেয়াল, ছেঁড়া কাগজ আর ময়লা ভরতি মেঝে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোবাতাসের অভাবে ভ্যাপসা এঁদো ঘর—এই জাতীয় অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত পরিবেশ ছাত্রদের মনের উপর একটা বিরক্তিকর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

(৩) **শ্রেণীকক্ষের আয়তন**—ছাত্রসংখ্যার তুলনায় ঘর যদি যথেষ্ট পরিমাণে বড় না হয়, ছেলেদের সচ্ছন্দে চলাফেরা করার মত যথেষ্ট জায়গা না থাকে তাহলে তা ছাত্রদের মনকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে তোলে। সুতরাং সর্বপ্রথমে বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীকক্ষের আবহাওয়া ও পরিবেশকে সুন্দর চিত্তাকর্ষক ও প্রফুল্ল করে তুলতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোবাতাস না থাকলে কখনই সেখানে চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য আসে না।

(৪) **শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র**—ভাঙ্গাচোরা নোংরা নড়বড়ে দাগধরা, বেঞ্চি ডেস্কে বসে থাকতে ছাত্রদের মনেও একটা নোংরামির ভাব সংক্রামিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্রের সংখ্যার তুলনায় বেঞ্চি ডেস্ক কম। সুতরাং ছেলেরা চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া ছাত্রদের উচ্চতা অনুসারে ডেস্ক বেঞ্চি তৈরী না হলে ছাত্রদের বসে থাকতে বা কাজকর্ম করতে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ছোট সাইজের বেঞ্চিতে বড় ছেলেরা বা বড় সাইজের বেঞ্চিকে ছোট ছেলেরা বসতে বাধ্য হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক, দুদিক দিয়েই ক্ষতির কারণ ঘটে। বলাই

বাহুল্য, শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক হল আসবাবপত্রের সংখ্যাল্পতা ও গঠনের অসমতা।

তৃতীয় কথা হল, শিক্ষকের আসন একটা উঁচু চৌকি বা প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপন করা দরকার তা না হলে শ্রেণীকক্ষের সব জায়গা থেকে শিক্ষক মহাশয়কে দেখা যায় না। শিক্ষক ও ছাত্র সমভূমিতে থাকলে পিছনের ছাত্রেরা শিক্ষকের মুখ দেখতে পায় না বা শিক্ষকও তাদের দেখতে পায় না। সুতরাং ছাত্রেরা ক্রমশই অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

(৫) **শ্রেণীকক্ষের সজ্জা**—শ্রেণীকক্ষে ছাত্রেরা কি ক্রম অনুসারে বসবে সেটাও বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হয়। কোথায়ও দেখেছি, প্রথম থেকে শেষ অবধি ছাত্রদের রোলনম্বর অনুসারে সাজিয়ে বসান হয়। এটা একান্তই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোথাও বা নিয়ম প্রচলিত আছে, যে ছেলে আগে আসবে সেই সামনের বেঞ্চিতে বসতে পাবে। এর ফলে বিদ্যালয়ে আগে আসার একটা প্রতিযোগিতা হয় বটে কিন্তু এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। আসন নিয়ে গোলমাল মারামারি ও বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে এই পদ্ধতিতে।

সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা ছাত্রদের উচ্চতা অনুসারে শ্রেণী-শিক্ষক তাদের আসন নির্দিষ্ট করে দেবেন। ছোটরা বসবে সামনে এবং বড়রা ক্রমশ পিছনে বসবে। তাহলে বোর্ড দেখতে বা শিক্ষককে দেখতে কারো অসুবিধা হবে না।

(৬) **অবৈজ্ঞানিক সময়-পত্রিকা**—অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সময়-পত্রিকা তৈরী করার মূলে কোন পরিকল্পনা নেই, আর থাকলেও যে তা মনস্তত্ত্বভিত্তিক নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সময়ে ছাত্রদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা বা পাঠের দিকে একাগ্রচিত্ত হওয়ার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে পড়ে সেই সময়ে গুরুভার পাঠ্য-বিষয় নির্দেশ করলে পাঠ ত হবেই না, উপরন্তু অমনোযোগ-ঘটিত শৃঙ্খলাহীনতার দোষ ঘটবে।

(৭) **অমনস্তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রম**—পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণ করবার সময় ছাত্রের ক্ষমতা আগ্রহ রুচি সব কিছু বিচার-বিবেচনা করতে হয় কিন্তু একান্ত অবৈজ্ঞানিক অমনস্তাত্ত্বিক গুরুভার পাঠ্যক্রম জোর করে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিতে গেলে তা ছাত্রদের কোন কাজে ত লাগবেই না উপরন্তু তাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলাহীনতা ঘটবে।

(৮) **শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণ**—

শ্রেণীকক্ষে প্রাত্যহিক পাঠদান প্রসঙ্গে যে সব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় সেগুলিও যথোপযুক্ত না হলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। অনেক সময় দেখা যায় ব্ল্যাকবোর্ডের রং উঠে গিয়েছে, ভাল করে দাগ পড়ে না, ম্যাপ বা গ্লোব যথোপযুক্ত বড় নয় বা ছেঁড়া ময়লা। অথবা প্রদীপন হিসাবে শিক্ষক যে সব ছবি বা চার্ট শ্রেণীকক্ষে দেখাতে চান, তা ভাল করে সকলে দেখতেও পায় না। ফলে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়।

(৯) **পঠন-পদ্ধতি**—আধুনিক পঠন পদ্ধতিগুলি মনস্তত্ত্বভিত্তিক। তাদের মূলকথাই হল ছাত্রের আগ্রহ সঞ্জীবিত করা, মনোযোগ আকর্ষণ করা। কিন্তু প্রাচীন অবৈতনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করতে গেলে শ্রেণীকক্ষের আগ্রহ উদ্দীপিত হবে না, ববং ছাত্রদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। সুতরাং শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে।

(১০) **শিক্ষকের প্রভাব**—এটি সবশেষে উল্লেখ করা হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে বোধ হয়, সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষক হলেন শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী এবং সমগ্র শ্রেণীকক্ষের মনোযোগ শিক্ষকের দিকেই কেন্দ্রীভূত। সুতরাং শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে শিক্ষকের প্রভাবের তুল্য আর কিছুই নেই। শিক্ষক যদি শিক্ষকোচিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হন তাহলে শ্রেণীকক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তিনি যতটা সক্ষম হবেন এমন অন্য আর কেউ নয়।

শিক্ষক যদি ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন না হন, তাঁর কণ্ঠস্বর, হাতের লেখা, পঠন-পদ্ধতি যদি ছাত্রদের চিত্তাকর্ষক না হয় তাহলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে কঠিন হবে সে ত বলাই বাহুল্য।

(খ) আভ্যন্তরিক কারণ:

(১) **শারীরিক অসুস্থতা**—শরীর খারাপ থাকলে কোন কিছুতেই মন বসে না, কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না, পাঠে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, তার ফলে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাঘাত ঘটে।

অনেক ছাত্রের চোখ খারাপ থাকে, দূরের বেঞ্চিতে বসে বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না, কিংবা শ্রবণশক্তি দুর্বলতার জন্য হয়ত সব কথা ভাল করে শুনতে পায় না। তার ফলে পাঠে অমনোযোগ ঘটে।

(২) **মানসিক অসুস্থতা**—পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক

সময়ে মনে ঈর্ষা, ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকার অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে। তার ফলে শ্রেণীকক্ষে তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে।

অনেক সময় অবচেতন মনের ভাবজট ছাত্রের আচরণকে অসামাজিক দিকে বা নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করে। তার ফলেও শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

(৩) **অপরিণত বুদ্ধি**—সকল শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligent quotient) সমান নয়। বুদ্ধির দিক দিয়ে যারা কিছু অপবিণত তারা শ্রেণীকক্ষে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে চলতে পারে না,—শ্রেণীকক্ষের কাজে তারা ব্যাঘাত ঘটায়।

(৪) **আত্মকেন্দ্রিক আচরণ**—শিশু প্রথমে আত্মকেন্দ্রিক থাকে তারপর বিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলাফেরা করতে করতে সাধারণতঃ তার স্বভাবের সমাজীকরণ (Socialization) ঘটে। কিন্তু কোন কারণে শিক্ষার দোষে যদি এই সমাজীকরণের বৃত্তি কারো পরিস্ফুট না হয়ে ওঠে তবে তাকে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটে।

(৫) **দারিদ্র্য**—আমাদের দেশ সাধারণতঃ দরিদ্র। বিশেষতঃ পল্লীঅঞ্চলে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেরা বা শহরাঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, শীতকালে যথোপযুক্ত গাত্রবস্ত্র পায় না, পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করতে পারে না, ইত্যাদি কারণে সবদিন সমভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। দেহ দুর্বল ও মন অবসাদগ্রস্ত থাকায় শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে পারে না।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় ঃ

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিবন্ধক কি কি হতে পারে ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা আনয়ন করতে হলে ওই সব প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারিত করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সেইগুলির মধ্যেই শৃঙ্খলারক্ষার উপায়ের কথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। তবে সেগুলি অধিকাংশই 'নেতিবাচক' অর্থাৎ নিষেধাত্মক বা যা করতে হবে না। এছাড়া 'ইতি-বাচক' অর্থাৎ আদেশাত্মক বা যা করতে হবে তারও কিছু আলোচনা করা দরকার।

(১) প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিক্ষার্থীদের **ব্যক্তিত্বের যথাযথ সম্মান দান**। তাদের সঙ্গে এমন স্নেহশীল অথচ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে

যার ফলে তাদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। আত্মমর্যাদা জাগ্রত হলে তবেই দায়িত্ববোধ জাগবে, এবং এই দায়িত্ববোধ ছেলেমেয়েদের মনে জাগাতে না পারলে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা কিছুতেই আসতে পারে না। মূলকথা হল ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস করলে তবেই তারা শিক্ষকদের বিশ্বাস করতে পারবে, নচেৎ নয়। ভয় দেখিয়ে শাসন করা যায়, ভালবাসান যায় না, বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। প্রথমেই তাদের দায়িত্ব দিতে হবে এবং দায়িত্ব পালন করতে করতেই দায়িত্ববোধ জাগবে তাদের মনে এবং স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটবে।

(২) **শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব**—শিক্ষক মহাশয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিরপেক্ষতা ও মহান ব্যক্তিত্ব থাকলে তবেই তিনি শ্রেণীকক্ষ সহজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবেন। শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রদের মনে অজ্ঞাতসারেই পড়ে। সেই হিসাবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতা না থাকলে ছাত্রের মধ্যে তা আশা করা সহজ নয়। শিক্ষকেব চরিত্রই ছাত্রের কাছে জীবন্ত উদাহরণ, শিক্ষকের আচার ব্যবহারই ছাত্রের কাছে আদর্শরূপে প্রতিভাত। সুতরাং ছাত্রদের সংযত স্বভাব, সচ্চরিত্র ও শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে হলে শিক্ষকের মধ্যে, এই গুণগুলির সমাবেশ আমরা নিশ্চয়ই আশা করব।

(৩) **বিদ্যালয় পরিচালনায় সুব্যবস্থা**—ছাত্রদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে চলতে শেখাতে গেলে বিদ্যালয়-পরিচালনার দিক থেকেও তেমনি কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষক সকলে নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে অবিচলিত ভাবে চলবেন এবং তাঁদের জাগ্রত দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ যেন কিছু নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে না পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কোন ছাত্রের প্রতি যেন কোন কারণেই পক্ষপাতিত্ব দেখান না হয়।

(৪) **বিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়মাবলী প্রণয়ন**—ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের সমুদয় নিয়মাবলী যেন স্বেচ্ছায় মেনে চলে, এ কথা বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নিয়মাবলী প্রণয়ন করবার সময়ে চারিদিকে ভাল ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। সমাজ পরিবেশ অনুসারে, ছাত্রের আর্থিক শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুসারে, নিয়ামাবলী রচনা করা প্রয়োজন। খেয়াল খুশির মত স্বেচ্ছাচারের আইন কখনই ছাত্রদের আন্তরিক সমর্থন ভাল করতে পারে না। সুতরাং আইন ভঙ্গ করবার ইচ্ছাও তাদের স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়মাবলী রচনা করে প্রত্যেকটি ছাত্রকে তা জানিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে একখানি করে ছাপান কপি দিতে পারলে ভাল হয়। অজ্ঞতাবশতঃ নিয়মভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

(৫) **সর্বদা কাজে নিয়োগ**—ছোট ছেলেমেয়েরা সব সময়েই কোন কিছু একটা কাজ করতে চায়। কাজ ছাড়া তারা এক সময়েও থাকতে পারে না। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে বসে কেবল পড়া আর পড়া ছাত্রদের বেশীক্ষণ আকর্ষণ করে রাখতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরই তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের জোর করে এক জায়গায় চুপচাপ বসিয়ে রাখা আর প্রাণহীন করে রাখা একই কথা।

কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। ছাত্রদের পক্ষে এই প্রবাদ সমধিক প্রযোজ্য। তাদের করণীয় কোন কাজ না থাকলেই অকরণীয় কাজ করবার দিকে ঝুঁকবে। গোলমাল করে সমস্ত শ্রেণীকক্ষের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেবে।

সুতরাং সব সময়েই তাদের কাজে নিযুক্ত রাখার মত একটি সুন্দর এবং সুসম্পূর্ণ পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করে রাখতে হয়।

(৬) **প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান**—প্রধানশিক্ষকের একটা প্রধান কাজ হল বিদ্যালয়ের সমগ্র কর্মপদ্ধতি তত্ত্বাবধান করা। প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রত্যেকটি ছাত্র এমনকি প্রত্যেকটি কর্মচারী তাদের যথানির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম যথাযথ ভাবে পালন করছে কিনা তা প্রধানশিক্ষক মহাশয় যদি নিয়মিতভাবে না দেখেন তাহলে কর্তব্যকর্মের ত্রুটি ঘটবে; বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং তার প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের আচরণের উপরও সংক্রামিত হবে।

(৭) **বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ ও গৌরববোধ**—শৃঙ্খলা রক্ষার দিক দিয়ে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, কর্মপদ্ধতি বা পরিচালনায় খ্যাতি যদি দেশের মধ্যে প্রশংসা অর্জন করে তবে ছাত্রেরাও তার জন্য গৌরববোধ করবে এবং সেই গৌরবের ক্ষুন্নতা ঘটে এমন কোন কাজ করতে স্বভাবতই তারা সঙ্কোচ বোধ করবে।

(৮) **স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা**—আগেই বলেছি দায়িত্ব না দিলে দায়িত্ব-বোধ জাগে না। বিশ্বাস না করলে বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। তাই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক কার্য পরিচালনার জন্য যদি ছাত্রদের উপরই ভার

দেওয়া যায় এবং স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে স্বভাবতই তারা দায়িত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে এবং তার ফলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শৃঙ্খলা রক্ষার মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হবে।

(৯) **বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ**—বিদ্যালয়-সমাজ ও গৃহ-সমাজ এ'দুটি আদর্শ যেন বিপরীতমুখী না হয়। বালক-বালিকারা দিনের খানিকটা অংশ থাকে বিদ্যালয়ে, বাকী অংশ গৃহে। একটি আদর্শ যদি অপরটির পরিপন্থী হয় তাহলে দোটানায় পড়ে ছাত্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। তাদের মনের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটবে এবং তার ফলে তাদের আচার আচরণে অনেক জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হবে, শিশুমনের ভারসাম্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহের সহযোগিতা আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলতে পারলে ভাল হয়। এর জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 'অভিভাবক শিক্ষক সংঘ' গঠন করা যেতে পারে।

(১০) **শাস্তি ও পুরস্কার**—স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায় 'শাস্তি ও পুরস্কারের' কোন স্থান নেই। কিন্তু কখন কখন শাসন নির্ভর শৃঙ্খলা দরকার হতে পারে! সে ক্ষেত্রে শাস্তি পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরের পরিচ্ছেদে সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

শাস্তি ও পুরস্কার

(Punishment and Reward)

শাস্তির প্রয়োজনীয়তা ঃ

শৃঙ্খলারক্ষার উপায় স্বরূপে শাস্তি প্রদানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যতরকম মতই থাক, কোন প্রকার শাস্তির প্রয়োজনীয়তা যে একেবারেই নেই এমন কথা বলা চলে না। মানুষের মধ্যে এমন অনেক দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে তার কিছু কিছু সংশোধন করা সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ সংশোধন করা যায় না। বর্তমান মনোবিদেরা বলেন, মানব-শিশু স্বভাবতঃই শয়তান নয়, আবার অপাপবিদ্ধ দেবশিশুও নয়। সুতরাং তাদের গুণের অংশ যেমন উৎসাহ দিয়ে বর্ধিত করতে হবে তেমনি দোষের অংশের পরিমার্জনার জন্য শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তাও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

এককালে যেমন শৃঙ্খলারক্ষা বা পড়াশুনায় মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র উপায় ছিল বেত্র আস্ফালন, তেমন আজকাল আবার গুরুতর অন্যায়ের জন্যও শাস্তি না দেওয়ার উপদেশ। মনে হয়, মধ্যবর্তিনী সত্যের এই দুটি প্রান্তসীমা।

মোটকথা, শাস্তি দেওয়া মোটেই চলে না—এমন কথা নয়, এমন কি দৈহিক শাস্তিও দিতে হবে প্রয়োজন হলে। 'প্রয়োজন হলে'—কথাটাই বড় কথা। শিক্ষক যখন বুঝবেন এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, তখনই এর সংযত প্রয়োগ সুফল আনবে।

শিক্ষাবিদ রেন্ শিক্ষকের বেত্রকে চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ছুরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর অপপ্রয়োগ যেমন ক্ষতিকর তেমনি সময়বিশেষে অপ্রয়োগও কম ক্ষতিকর নয়।

[Punishment is an evil thing and a thing to be avoided. So is the surgeon's knife. Both are necessary however—]

এখন সমস্যা, শাস্তি কি উদ্দেশ্যে দিতে হবে এবং কতটুকু দিতে হবে। উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা একে দু'দিক থেকে দেখতে পারি—**সংশোধক ও নিবারক।**

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের যে শাস্তি দেওয়া হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দোষত্রুটি সংশোধন এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষা।

এই উদ্দেশ্যে শাস্তিটা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে—যাতে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী সচেতন হয় এবং অনুতপ্ত হয়। তবেই ভবিষ্যতে সে আর অনুরূপ অপরাধ না করার দিকে মনোযোগী হবে।

এছাড়া যখন একজনকে দেখে পাঁচজন শিখবে, এই উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় তখন তাকে নিবারণমূলক শাস্তি বলতে পারি। কোন ছাত্র যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে, তবে তার কঠিন শাস্তি দিয়ে শুধু অপরাধীকেই মাত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে সমস্ত ছাত্রদলকেই তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করা যায়। গুরুতর অপরাধের জন্যই অবশ্য এই জাতীয় শাস্তির প্রয়োজন হয় এবং শাস্তির মাত্রাও হয় গুরুতর। এছাড়া শাস্তিকে আরো কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। ক্ষতিপূরক (Retributive) শাস্তি ঃ

কোন ছাত্রের ব্যবহারে যদি অন্য কোন ছাত্রের বা বিদ্যালয়ের কিছু ক্ষতি হয় তবে সেই ছাত্রকে দিয়েই তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই হল ক্ষতিপূবক শাস্তি। যেমন কোন ছেলে 'যদি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে বা অন্য কোন সহপাঠীর বই-খাতা জামা-কাপড় নষ্ট করে দেয় তবে তার জরিমানা থেকে সেইগুলি পূরণ করা যায়।

২। শৃঙ্খলাভঙ্গের (Disciplinery) শাস্তি ঃ

বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা কেউ ভঙ্গ করলে সেই নিয়মের মর্যাদা রক্ষার খাতিরেই তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তা নইলে বিদ্যালয়ের শাসনের কোন মূল্যই থাকবে না, শৃঙ্খলা যাবে নষ্ট হয়ে।

মোটকথা হল, শাস্তিদানের উদ্দেশ্য প্রতিহিংসানিবৃত্তি নয়, শিক্ষা দান। শিক্ষাদানই হল আসল লক্ষ্য, অন্য উপায়ে যখন তা সম্ভব হল না তখনই শাস্তিদানকে উপলক্ষ্য করা হল।

[The end and object of all punishment is education and training. The sufferer is taught by pain, and others are taught by his examples.]

শাস্তিপ্রদানের ব্যর্থতা ঃ

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে শাস্তিদান করবার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি উল্লেখ করা

হল সেগুলি যে নিরঙ্কুশ কল্যাণকর এমন কথা বলা যায় না। দোষত্রুটি সংশোধন করা অথবা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষা করবার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়ার মূল কথা হচ্ছে—যে অন্যায় করেছে শাস্তি দিয়ে যেন তার প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। মানুষের চরিত্র সংশোধনে এই দুটো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। এই দুটোরই মূল কথা হল ভয় দেখিয়ে সৎপথে রাখবার চেষ্টা—কিন্তু তা কখনও হয় না। ভয় একটা শক্তিশালী প্রক্ষোভ, তা মানুষের মনের সমতা নষ্ট করে দেয়, চরিত্র বিকাশের সহজ সরল পথ রুদ্ধ করে দেয়, স্বাভাবিক সৃজনীপ্রতিভা ধ্বংস করে দেয়।

তাছাড়া ভয় দেখিয়ে প্রথম প্রথম হয়ত কিছু ফল পাওয়া যায় কিন্তু বারবার ঐ পন্থা অবলম্বন করলে ফল উল্টো হবার সম্ভাবনা। আরো, যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—যে অন্যায়কারীর সংশোধন করা বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঁচ জনকেও সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেওয়া—এটাও সব সময়ে হয় না। কারণ, বন্ধুকে শাস্তি পেতে দেখলে অন্য বন্ধুদের মনে সহানুভূতি জাগতে পারে, গণমানসে প্রতিহিংসা জাগতে পারে। সুতরাং পুরানো দিনেব বেত্রানুশাসন ছেলেদের চবিত্রগঠনে অথবা শৃঙ্খলারক্ষণে একেবারেই ব্যর্থ।

শাস্তি দেবেন কে এবং কখন?

তথাপি মাঝে মাঝে শেষ অবলম্বন হিসাবে একটি পন্থা গ্রহণ করতেই হয়। —'শেষ অবলম্বন' কথাটা লক্ষণীয়।

শিক্ষক যখন বুঝবেন এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই, কেবল মাত্র তখনই তিনি এই পথ অবলম্বন করবেন। শাস্তি দেবার সময়ে ছাত্রের মনে যেন কখনও এ ধারণা না হয়, যে অন্যায় করে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। শাস্তি পাবার সে যোগ্য, এ বোধটি যেন তার জাগ্রত হয়। শাস্তির পিছনে শাস্তিদাতার যেন কোন প্রকার ক্রোধ বা হিংসার ভাব না থাকে। শাস্তির আঘাত দাতা ও গ্রহীতার মনে যখন সমভাবে বাজবে তখনই হবে সুবিচার, তখনই সে শাস্তির সুফল দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি—

"—দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

দণ্ড যেন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী হয়। লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলে ছাত্রের মনে শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয়ে যায়। সব সময়ে মনে রাখতে হবে ছেলেদের শাস্তি দেওয়া মানেই শিক্ষকের পরাজয় স্বীকার। শিক্ষক আর কোন পথ না পেয়ে তবেই চরম পথে পা বাড়িয়েছেন,—এটা যেন তিনি স্বীকার করে নিলেন। সুতরাং সেটা যতই কম হয় ততই ভাল।

আর এক কথা,—দণ্ডদান বিষয়ে শিক্ষক যেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হন। এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছাত্রের মনে জাগলেও ক্লাশের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে। কখনই ভুললে চলবে না যে শাস্তির একটি মাত্র উদ্দেশ্য সংশোধন, প্রতিহিংসা নিবৃত্তি নয়।

শেষ কথা, শাস্তি দেবার অধিকারী কে? বিদ্যালয়ের বিধানে অবশ্য একমাত্র প্রধানশিক্ষককেই দৈহিক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু নৈতিক অধিকার অর্জন করতে হয় শিক্ষককে। কেবলমাত্র পদাধিকার বলে বা বয়সের গুরুত্বে এই অধিকার জন্মায় না। এ অধিকার জন্মায় ভালবাসায় ও স্নেহে। পুনরায় কবিগুরুর কথা উল্লেখ করে বলি—

"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো—"

সুতরাং শাসন করার অধিকার অর্জন করতে হয় স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, সোহাগ দিয়ে।

বলাই বাহুল্য, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ছাত্রদের শাসন করার চেষ্টা অপেক্ষা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শাসন করার পথটা অনেকখানি সহজ। তাই অনেক অলস শিক্ষক এই সহজপথের পথিক।

[It is lazy and short way of government.—Locke]

কিন্তু সহজ সস্তাপথে শিশুর চরিত্র গঠন হয় না, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলা যায় না।

পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা :

শাস্তি দিয়ে আমরা যেমন অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করি তেমনি আবার পুরস্কার দিয়ে ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করি। সুতরাং বিদ্যালয় পরিচালনায় তিরস্কার ও পুরস্কার দুটোই অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, শাস্তি ও পুরস্কার এই দুটোর উদ্দেশ্য বিপরীতমুখী, শাস্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি কাজটি সময় সময় অপরিহার্য বলে

মনে হলেও তা একান্তই অপ্রীতিকর এবং আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। পুরস্কার সম্বন্ধেও একথা সত্য। কোন কোন শিক্ষাবিদ পুরস্কারদান প্রথাকে শাস্তিদান প্রথার মতই ক্ষতিকর বলে মনে করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় রাখার পক্ষে শাস্তিদানের মত পুরস্কারদান প্রথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

পুরস্কারদানের উপকারিতা :

ভাল কাজে পুরস্কার দিলে সাধারণতঃ ভাল কাজ করবার দিকে একটা উৎসাহ আসে। পুরস্কারকে অবলম্বন করে শ্রেণীকক্ষে বেশ একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়, তার ফলে শ্রেণী পাঠোন্নতি ঘটে।

তাছাড়া থর্নডাইকের শিক্ষাসূত্রের (Law of learning) পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে উদ্দীপনার সঙ্গে আনন্দমধুর অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে সেই উদ্দীপনাটিই মনে স্থায়ী রূপ নেয়। সুতরাং শিক্ষার্থীর যে আচরণটি আমরা স্থায়ী করতে চাই তার সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দমধুর অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করে দিলে কাজটা সহজ হতে পারে।

পুরস্কারদানের অপকারিতা :

তবে অনেকের মতে, এই উপকারিতাটি অবিমিশ্র নয়। ভাল কাজ পুরস্কারের লোভে করতে শিখলে ভাল কাজের প্রতি যে অহেতুক একটা আকর্ষণ থাকার কথা, তা থাকে না। ভাল কাজ করবার প্রেরণা যেখানে সত্যের আকর্ষণে নয়, লোভের আকর্ষণে—সেটা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ—পুরস্কারলাভের প্রতিযোগিতা অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হয়, এবং তাতে বিদ্যালয়ের সুস্থ সামাজিক আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রের মনে অকারণ ঈর্ষা, হিংসা, আত্মম্ভরিতা জাগতে পারে। এইজন্যই প্রতিযোগিতায় পুরস্কারযোগ্য হবার জন্য অনেকে অসদুপায় অবলম্বন পর্যন্ত করে থাকে।

তৃতীয়তঃ—শ্রেণীতে এই জাতীয় পুরস্কার-প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকটি ছেলেমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার পাওয়া তাদের ক্ষমতার বাইরে মনে করে প্রতিযোগিতায় উদাসীন থাকে। সুতরাং পুরস্কারদান প্রথা বিদ্যালয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

চতুর্থতঃ—পুরস্কার দেওয়া হয় ফল দেখে—প্রচেষ্টা দেখে নয়। যদি দেখা

যায় কোন ছেলে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে উন্নতি করতে এবং ক্রমশ উন্নতিও করছে, তবু সে শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভের মত সুফল দেখাতে পারছে না বলে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। সুতরাং পুরস্কারদান প্রথা সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে না, সুফল প্রদর্শনকে করে মাত্র। —যদিও সুফল সব সময়ে সৎপ্রচেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি নয়।

পঞ্চমতঃ—অনেক সময় সচ্চরিত্রতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন কোন গুণে বালককে সচ্চরিত্র বলে মনে করা হয় তা বোঝা মুস্কিল। সাধারণতঃ যে সব বালকবালিকা একান্ত নিরীহ নিস্তেজ, কারো সাতে-পাঁচে নেই তাদেরকেই সচ্চরিত্রতার (good conduct prize) পুরস্কার দেওয়া হয়। অথচ বালক বয়সে এইগুলি গুণ নয়, দোষ। তাছাড়া সারা শ্রেণীর মধ্যে ২।১ জনকে সচ্চরিত্র বলে চিহ্নিত করে দিলে বাকিগুলো অসচ্চরিত্র নীতিহীন বলে ইঙ্গিত করা হয় না কি ?

যাই হোক, প্রচলিত পুরস্কারদান প্রথার মধ্যে কিছু কিছু ভাল দিকও অবশ্য আছে, আগেই তার উল্লেখ করেছি। সুতরাং প্রথাটিকে একেবারেই উঠিয়ে না দিয়ে তাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সংস্কার করে নেওয়া চলতে পারে।

পুরস্কারদান প্রথার সংস্কার—

পুরস্কার সাধারণতঃ দেওয়া হয় (১) পাঠোন্নতির জন্য, (২) সচ্চরিত্রতার জন্য, (৩) বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিবার জন্য, (৪) খেলাধুলার জন্য ইত্যাদি—

(১) পাঠোন্নতির পুরস্কার কোন একটি বিশেষ পরীক্ষার ফলের উপর না রেখে সারা বছরের কাজ বিবেচনা করে দেবার ব্যবস্থা করলে ছাত্র সারা বৎসরই তার উন্নতির মান বজায় রাখবার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফল ভাল করার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ে অতিরিক্ত খাটুনি, প্রশ্ন বাছাই করে পড়া, এমনকি অসদুপায় অবলম্বনের দুরভিসন্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।

[Rewards for progress must be the rewards of merits and not of accident—P. Wren]

(২) পুরস্কারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। কেবলমাত্র ১ম, ২য় ৩য় স্থান দখলকারীদের পুরস্কৃত না করে, যারা বৎসরের কাজে পূর্বাপেক্ষা উন্নতি দেখিয়েছে, তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করা ভাল।

(৩) সচ্চরিত্রতার ত্রুটির কথা আগেই বলেছি। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে ভাল

ব্যবহার করবে, চরিত্রবান হবে, নিয়মনিষ্ঠ হবে, এইটেই ত স্বাভাবিক এবং না হওয়াই অন্যায়। সেক্ষেত্রে সচ্চরিত্র, নিয়মানুগ হবার জন্য পুরস্কার দেওয়া কারো কারো মতে ঘুষ দেবার নামান্তর।

[It is in this particular that prizes come nearest to bribes and have the greatest chance of doing more moral harm than good by breeding hypocrisy and low motives—Wren.]

সুতরাং এই পুরস্কার সমর্থনযোগ্য নয়। তবে কোন ছাত্র যদি বিশেষ কোন মহানুভবতার কাজ, সাহসের কাজ বা পরোপকারের কাজ করে, তবে তাকে পুরস্কৃত করে তার এই সাধু প্রবৃত্তিটিকে উৎসাহিত করা ভাল।

(৪) বিদ্যালয়ের নিয়মিত উপস্থিতিও অনেকে পুরস্কারযোগ্য বলে মনে করেন না। কারণ বিদ্যালয়ের পরিবেশই ছাত্রদের আকর্ষণ করবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে হাজির করবার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়।

তবে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার মধ্যে যে এক বৎসরের আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে সেটাকে পুরস্কৃত করা মন্দ নয়। বিদ্যালয়ে পড়তে আসার ঢিলেমি থেকে সর্ববিষয়ে ঢিলেমির প্রমাণ পাওয়া যায়। সব শিক্ষার মূল কথাই হল নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্যজ্ঞান নিয়মিত হাজিরায় আমরা স্বভাবের এই মূল্যবান গুণগুলির পরিচয় পাই। তাই এই বিষয়ে পুরস্কারপ্রদান সমর্থন করা যেতে পারে।

(৪) খেলাধুলা :

এই বিষেয়ে যোগ্যতার পুরস্কার বিশেষভাবে কাম্য। বিদ্যালয় শুধুমাত্র মানসিক শক্তি অর্জনের স্থান নয়, শারীরিক শক্তি অর্জনেরও স্থান—এই বিষয়ে পুরস্কার দিলে শারীরিক চর্চার মানমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

পুরস্কারের প্রকার ভেদ :

(১) পুস্তকাদি :

কাদের পুরস্কার দেওয়া ভাল, এবিষয়েও যেমন বিচার করতে হয়, কি পুরস্কার দেওয়া ভাল এ বিষয়েও বিচার করবার দরকার। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কতকগুলি রঙচঙে গল্পের বই আর কিছু মোটাসোটা অভিধান দেওয়া হয়ে থাকে। কোন্ ছেলেকে কোন্ বই দেওয়া হচ্ছে এবং কেন দেওয়া হচ্ছে এ বিষয় আমরা বড় বেশী চিন্তা করি না।

(ক) প্রথমতঃ, পুরস্কারযোগ্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের প্রয়োজনমত বই কেনা ভাল।

(খ) যে ছাত্রটি যে বিষয়ে উন্নতি করে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, সেই বিষয়েই আরো উচ্চতর বই পুরস্কার দেওয়া ভাল।

(২) শ্রেণীতে সম্মানজনক স্থান :

প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষকের দুই পাশে খানকয়েক বেঞ্চি সম্মানজনক আসন হিসাবে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকদিন পড়াশুনায় বা নৈতিক ব্যাপারে প্রশংসাযোগ্য বিবেচিত হলে ছাত্রকে সেই বেঞ্চিতে বসবার অধিকার দেওয়া যায়, এবং উন্নতির মান বজায় রাখতে না পারলে সম্মানজনক স্থানটি হারাতে হবে। —এই নিয়মে ছাত্রদের মধ্যে বেশ একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে, এবং কার্যের সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়ায় মনের উপর এব প্রভাবও হয় বেশী।

(৩) অভিজ্ঞান পত্র :

পুস্তকাদি না দিয়ে তার পরিবর্তে অভিজ্ঞান পত্র বা (certificate of honour) সম্মানপত্র দেওয়ার প্রথা ভাল। এখানে মূল্য বস্তুগত নয়, মর্যাদাগত ; অর্থাৎ জনসাধারণের সমক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃক তার স্বীকৃতি। বলাই বাহুল্য, জনসাধারণের কাছে বিদ্যালয়ের সম্মান যত বেশী সেই বিদ্যালয়ের চিহ্নিত অভিজ্ঞানের মূল্যও তত বেশী। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকদের একটি করে সপ্তপর্ণির পাতা উপহার দেবার প্রথা সৃষ্টি করেছিলেন কবিগুরু। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বা বস্তু থেকে ঐ পাতাটির মূল্য অনেক বেশী সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

(৪) বস্তু উপহার :

অনেক সময়ে পুস্তকের পরিবর্তে নানাপ্রকারের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। পাঠোন্নতির পুরস্কার ছাড়া খেলাধূলা বা সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে নানাবিধ দ্রব্যাদি পুরস্কার দেবার রেওয়াজ আছে। এ প্রথা মন্দ নয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে দ্রব্যগুলি যাকে দেওয়া হচ্ছে সে যেন সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেদের নানারকম রঙ্গিন পুতুল, খেলনা, ব্যাটবল, রঙের বাক্স, নানারকম ঘরোয়া খেলার সরঞ্জাম (indoor-games) ইত্যাদি দেওয়া মন্দ নয়।

চারাগাছকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রথমেই যেমন তাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে বাইরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সরিয়ে রাখতে হয়, তারপর স্বভাবতঃই সে মাটি আলো বায়ু থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে চারাটি নিজেকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তোলে, তেমনি সমাজের অশুভ প্রভাব থেকে শিশু মনকে রক্ষা করা চলাই হল প্রথম স্তর। এরই তিনি নাম দিয়েছেন নেতিবাচক শিক্ষা (Negative education)।

এর পর শুরু হবে ইতিবাচক শিক্ষা (Positive education) একান্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতির হাতে। শিক্ষালয়গুলি থাকবে শহর থেকে দূরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মধ্যে। শহরগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত নেই। তাদের নাম দিয়েছেন তিনি মানুষের কবরখানা (graves of human species)। শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক। জীবনের পথে চলতে চলতে শিশু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে এবং সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সে সঠিক শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারবে।

ইতিপূর্বেই তার নেতিবাচক শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এতদিনে তার দেহ ও মন একান্ত স্বাভাবিক পথে সুগঠিত ভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে। সৎ ও অসৎকে ন্যায় ও অন্যায়কে প্রকৃতিজ স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সে বিচার করে নিতে শিখেছে। নেতিবাচক শিক্ষার কথায় তিনি বলতে চেয়েছেন এমন শিক্ষা যা প্রত্যক্ষভাবে কোন শিক্ষা দেয় না অথচ শিক্ষাগ্রহণের ইন্দ্রিয়াদিকে স্বাভাবিক ভাবে পরিমার্জনা ক'রে তাকে সম্পূর্ণ ও সজাগ করে তুলতে চেষ্টা করে।

পরে এই জাগ্রত ও পরিমার্জিত ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় শিশু স্বাভাবিক ভাবেই সত্য ও শুভ পথ অবলম্বন করে চলতে শিখবে। এটা সত্য, ওটা মিথ্যা, এটা ন্যায়, ওটা অন্যায় এই জাতীয় নির্দেশাত্মক শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

নেতিবাচক শিক্ষায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় পরিমাজনার ফলে সত্যাসত্য শুভাশুভ বিচার করবার এবং নির্বাচন করবার ক্ষমতা তার আছে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবার পূর্বে ইন্দ্রিয়গুলির পরিমার্জন ঘটেছে বলেই শিশু প্রকৃতি থেকে ন্যায় ও সত্য জ্ঞান নির্বাচন করে দিতে পারবে। এই নেতিবাচক শিক্ষার ফলে শিশু ভাল হয়ে উঠবে এ কথা বলা হচ্ছে না তবে মন্দ হতে বিরত হবে, সত্যপথে আকর্ষিত না হলেও অসত্য পথ থেকে নিবৃত্ত হবে।

এর ফলে স্বভাবতই শিশু সত্যের পথে মঙ্গলের পথে চলতে শিখবে। ভাল-

মন্দ বিচার করবার বুদ্ধি ও বয়স হলে তখন সে একান্ত প্রকৃতিপ্রভাবেই ভাল দিকে আকর্ষিত হবে।

মোটকথা, এই শিক্ষার অন্তর্নিহিত সত্যটি হল, নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা হবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে। তার পর সেই পরিমার্জিত-ইন্দ্রিয় শিশু স্বাভাবিক ভাবে অসত্যের অমঙ্গলের ও অশুভের পথ থেকে নিবৃত্ত হবে এবং পরিশেষে সত্য মঙ্গল ও শুভের পথে আকর্ষণ অনুভব করবে এবং তাকে ভালবাসতে শিখবে।

আমরা লক্ষ্য করে থাকব যে রুশো তার শিক্ষাতত্ত্ব রচনা করতে গিয়ে বার বার প্রকৃতি বা স্বভাবের (Nature) কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাকে স্বভাবগত ও প্রকৃতিনির্ভর করবার কথা বলেছেন। এই প্রকৃতি বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা অনুধাবনযোগ্য।

রুশোর মতে শিক্ষাকার্যটি হল একান্তই প্রাকৃতিক ক্রিয়া। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিমবস্তু নয়। মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এটি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠবার কথা। সেইজন্য মানুষের বাহ্যিক পরিণতি যেমন শৈশব বাল্য কৈশোর ও যৌবন তেমনি তার আন্তরিক পরিণতিও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হবার কথা। সুতরাং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতিরও স্তর বিভাগ থাকবে।

শিক্ষার উৎস মানুষের অন্তর—প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই অন্তর বিকশিত হয়। এই প্রকৃতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—অন্তঃপ্রকৃতি, বহিঃপ্রকৃতি ও জড়প্রকৃতি। উক্ত তিন ভাগ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনই হল শিক্ষা।

এই তিন বিভাগের কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন :

১। অন্তঃপ্রকৃতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব রুচি, প্রবণতা, বুদ্ধি, সামর্থ্য, সহজাত সংস্কার, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি সব কিছু। এই অন্তঃপ্রকৃতি হিসাবেই প্রত্যেকটি মানুষ অনন্যসাধারণ ও স্বতন্ত্র। শিক্ষা দেবার প্রথমেই শিশুর এই আন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়টি নিতে হবে। এবং তার রুচি প্রবণতা সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে মানসিক খাদ্য দিতে হবে। তবেই তা তার কাজে লাগবে।

এই আন্তঃপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেই রুশো শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগোদয়ের সূচনা করলেন এবং রুশোর এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেই অ্যাডামস্ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার (Paido centric education) পত্তন করলেন।

রুশোর ওই তত্ত্বই পরে পেস্তালৎসিক মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার ভিত্তি রচনায় উৎসাহিত করে এবং ধীরে ধীরে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান গড়ে ওঠে।

২। বহিঃপ্রকৃতি বলতে বোঝায় শিশুর পরিবেশ। রুশোর মতে মানুষের গড়া পবিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ একান্ত প্রকৃতি-বিরোধী ও কৃত্রিম। এবং এই সকল কৃত্রিমতা থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে না রাখতে পারলে কখনই তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে না। তাই শিশুকে নাগরিক সভ্যতার পাপপঙ্কিল কৃত্রিম কবল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শান্ত সরল অনাড়ম্বর পল্লীপ্রকৃতির কোলে রাখতে হবে।

রুশো বলেছেন মানুষ প্রকৃতির কোলে স্বাধীন হয়েই জন্মায়, তারপর মানবসমাজ তার গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেয় (Man is born free, the every where he is in chains), মানুষ নিজে ইচ্ছে করেই সভ্যতার শৃঙ্খল গলায় পরে। সভ্য হবার নামে মিথ্যা কৃত্রিম জীবনের অনুসরণ করে ব্যর্থ জীবন যাপন করে। কৃত্রিম সভ্যতার চাপে আজীবন সে বৃথা নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়ি পরে বেড়ায়, শেষে কৃত্রিমতার রজ্জুতে ফাঁসি লাগিয়ে মরে। জন্মকালে তাকে সেলাই-করা কাঁথা জড়িয়ে রাখা হয়, আবার মৃত্যুকালে কফিনের বাক্সে পেরেক ঠুকে সমাহিত করা হয়। যতক্ষণ সে বেঁচে থাকে সামাজিকতার কৃত্রিম নিগড়ে সে থাকে বাঁধা।

সুতরাং শিশুকে যতদূর সম্ভব সভ্যতার এই কৃত্রিম পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই তাকে সত্যশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

৩। জড়প্রকৃতি বলতে বোঝায় বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলী (Laws of Nature)। রুশো বলতেন, বিশ্বপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মাবলীই শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমরা ছেলেদের বিদ্যালয় নামক একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পুঁথির লেখা জ্ঞানের বোঝা পড়িয়ে বা শুনিয়ে শেখাবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না, তার চেয়ে যদি সে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসে প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত তবে সে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠত। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এই সত্যটি যদি সে কেবলমাত্র শুনে না শিখে ঠেকে শিখত তবে সেই শিক্ষা তার পাকা হয়ে যেত। তাছাড়া নৈসর্গিক পরিবেশের প্রভাবে শিশুর মনের সুষম বিকাশ ঘটে। প্রকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা শিশুমনকে স্বাভাবিক ভাবেই শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি রুশো মানুষের শিক্ষা-জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে প্রত্যেক স্তরের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। সেই স্তরগুলি সম্বন্ধে এইবার সংক্ষেপে আলোচনা করছি—

(১) প্রথম স্তর—শৈশবকাল (পাঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত)

এই বয়সের শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল শিশুকে কোন রকম বাধা-নিষেধের মধ্যে না রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। শিশুমনকে সুস্থ সরল স্বাভাবিক হয়ে উঠবার পক্ষে কোন রকম বাধাই আরোপ করা চলবে না।

অতিরিক্ত স্নেহ আদর দিয়ে শিশুদের পরনির্ভর আদুরে গোপাল করে তোলা হবে না। নিজের চেষ্টায় নিজের কৌতূহলে নিজের ইচ্ছায় শিশু যেটুকু শিখতে চায় শিখুক, বাইরে থেকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই শেখানর চেষ্টা করা হবে না, এমনকি তার কিছু ধরা-বাঁধা অভ্যাস তখনও তৈরী করে দেওয়া হবে না, হোক না সে অভ্যাস যতই কল্যাণকর। মোটকথা শিশু যেন সব সময়েই তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারে—অভ্যাসের দাস না হয়ে পড়ে। (The only habit, which the child should be allowed to form is to contract no habit whatsoever).

সুন্দর অসুন্দর সুশ্রী কুশ্রী ভীতিকর ও প্রীতিকর সর্বপ্রকার অবস্থার সঙ্গেই শিশুর পরিচয় থাকা দরকার। কোন প্রকার ভয়ের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

শিশুর পোশাক হবে একান্ত সাদাসিদে ঢিলেঢালা যাতে সে সহজেই চলা-ফেরা দৌড়ঝাঁপ করতে পারে।

খেলার জন্য কোন কৃত্রিম উপকরণ দেওয়া হবে না। গাছের ফুল লতা ডাল পালা ইট পাথর নিজের পছন্দমত সংগ্রহ করে তাই নিয়ে খেলা করতে পারে।

সভ্যতার কৃত্রিমতা যেন তার দেহ ও মনে স্পর্শ করতে না পারে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রখর হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

(২) দ্বিতীয় স্তর—(পাঁচ থেকে বারো বৎসরকাল বয়স)

এই বয়সের মধ্যে সমাজের দুষ্ট প্রভাবকে এড়াবার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, অর্থাৎ নেতিবাচক শিক্ষা শুরু হবে। শারীরিক ও মানসিক অনুভূতিগুলিকে যথাসম্ভব মার্জিত করতে হবে কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করা চলবে না।

Exercise the body, the organs, the senses and powers but keep the soul lying fallow as long as you can.

অনুভূতিগুলির পরিমার্জনার জন্য শিশু ওজন গণনা তুলনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে সেই সব অনুভূতির মাধ্যমে আপনা হতেই এর সূত্র আবিষ্কার করবে।

এই স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ বারো বছর পর্যন্ত কোনো রকম পুঁথিগত বিদ্যাদানের প্রচেষ্টা না করাই ভাল। রুশোর সুস্পষ্ট অভিমত, যে বয়স পর্যন্ত পুঁথির পাঠ গ্রহণের মত মানসিক শক্তি অর্জন না করবে ততদিন তার হাতে পুঁথি দিয়ে কোনই লাভ নেই।

অবশ্য নেতিবাচক শিক্ষার সঙ্গে কিছু কিছু ইতিবাচক শিক্ষাও আরম্ভ হবে এই সময়ে। প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষার ফলে শিশুর যখন কৌতূহল জাগ্রত হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে কিছু জ্ঞান লাভ করতে থাকবে।

ইতিবাচক শিক্ষার আর একটা বড় দিক হল স্বাস্থ্যচর্চা। দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলা সাঁতার ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু তার দেহকে সুস্পষ্ট করে তুলবে, কাজকর্মে ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতা বাড়বে। দৈহিক শক্তি অর্জনের দিকে রুশো বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর যত কিছু মন্দ কাজ করবার তার মূলে আছে শারীরিক দুর্বলতা! দেহ সবল কর্মক্ষম ও শক্তিশালী হলে সে কখনও অন্যায় কর্ম করতে পারে না।

"All wickedness comes from weakness. A child is bad only because he is weak. He who can do everything, does nothing wrong."

(৩) তৃতীয় স্তর—কৈশোর (বারো থেকে পনেরো বৎসর বয়স)

রুশোর মতে এই হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যার্জনের প্রকৃষ্ট সময়। রুশো এই সময়ের নাম দিয়েছেন 'পরিশ্রমের ও বিদ্যার্জনের কাল'। এতদিন এমিল দৈহিক শক্তি অর্জন করেছে এইবার মানসিক শক্তি অর্জনের সময়। বই পড়ায় রুশোর কোন আস্থা নেই। বই পড়ে জ্ঞান বাড়ে না শুধু বচনবাগিশ হয়—I hate books, they merely teach us to talk of what we do not know.

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি সে চর্চা করতে শিখবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাতের কাজও শিখবার কথা

বলেছেন তিনি। কাঠের কাজকে তিনি প্রধান্য দিয়েছেন তেমনি বইয়ের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন রবিনসন ক্রুশোর।

(৪) চতুর্থ স্তর—(পনেরো থেকে কুড়ি বৎসর বয়স)

এমিল এবার সঙ্কটময় বয়ঃসন্ধি কালে উপস্থিত হয়েছে। এতদিনে সে শারীরিক শক্তি অর্জন করেছে, বুদ্ধির চর্চাও হয়েছে যথোচিত। এইবার হৃদয়াবেগের চর্চা করার প্রয়োজন। নীতিবোধ ও ধর্মবোধেরও অনুশীলন করতে হবে এই সময়ে।

"We have formed his body, his senses and his intelligence, it remains to give him a heart."

এমিল এতকাল এককভাবে শিক্ষালাভ করছিল এইবার তাকে সমাজে বেরিয়ে আসতে হবে। সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র-গঠনও এই সময়ে শুরু হবে।

রুশো বলেন, সর্বপ্রকার শিক্ষার একটি মাত্র পদ্ধতি—সে হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। রুশো বলেন—I do not grow weary in repeating that all the lessons of young men should be given in action, rather than in words. Let them learn nothing, that cannot be taught from experience,

(৫) পঞ্চম স্তর—এমিলের সহধর্মিনী সোফির শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

এইবার যুবক এমিলের জীবনে যৌন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। এই সময়ে তার আদর্শ জীবনসঙ্গিনী সোফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যাতে সে সোফিকে ভালবাসতে শেখে।

সোফির শিক্ষা-প্রসঙ্গে রুশোর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ হয়েছে। রুশোর মতে সর্বতোভাবে এমিলের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবার শিক্ষাই হল আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা। নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য রুশো স্বীকার করেননি। তিনি বলেন নারীর কোন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রয়োজন নেই। তার প্রধান কাজ হচ্ছে স্বামীর সেবা করা, মনোরঞ্জন করা এবং শিশু পালন করা।

কুমারী অবস্থায় সোফির কিছু স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেছেন কিন্তু বিবাহের পর সোফির কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা স্বীকার করেননি।

রুশোর শিক্ষানীতির সমালোচনা :

দু'শ বৎসর পূর্বে এমিলের কাহিনীর মাধ্যমে রুশো যে শিক্ষানীতির প্রস্তাব করেছিলেন আজও তার কতটুকু গ্রহণযোগ্য, কতটুকু নয় সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই।

আপাতঃদৃষ্টিতে রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে অনেক ভুল-ত্রুটি ধরা পড়েছে, ভাবের ঘোরে রুশো অনেক কিছু বলেছেন যা বাস্তবক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তাঁর প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আজ যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশোর দান যে কত বেশী, তা আর বলে শেষ নেই। রুশোর পুরোপুরি শিক্ষাতত্ত্বটি আজ কোথাও গৃহীত হয় না বটে তবে তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি পরবর্তী বহু শিক্ষা-নায়কদের উদ্বোধিত করেছে।

এমন কি এমন কথাও বলা যায় যে, রুশো বলেননি এমন কোন কথাই আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষাবিদ বলতে পারেননি। আধুনিক শিক্ষার ভাবধারার মূল কথাই হচ্ছে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। বলাই বাহুল্য, রুশোই এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর জনক। শিশুশিক্ষার নামে শিশুপাল বধের যে ব্যবস্থা ছিল সারা দেশ জুড়ে রুশোই তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

২। দ্বিতীয়তঃ—শিশুর রুচি সামর্থ্য প্রকৃতি প্রক্ষোভ অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন রুশো। তাঁর কথায় ইঙ্গিত পেয়ে পববর্তীকালে পেসতালৎসি বলতে পারলেন শিক্ষাকে আমি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থাপন করব (I shall psycholosise the education)।

৩। তৃতীয়তঃ—শিশুর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তবেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তার সামনে উপস্থিত করার কথা বলেছেন রুশো—পরবর্তী কালে হার্বাটও এই তত্ত্বটি গ্রহণ করে আরো বিস্তারিত করেছেন।

৪। চতুর্থতঃ—কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি (learning by doing) আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র। এটাও রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৫। পঞ্চমতঃ—রুশো সব সময়েই শিক্ষাকে আনন্দময় পরিবেশে দেখার কথা বলেছেন। ফ্রয়েবল্ ও মন্তেস্বরীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই আনন্দময় পরিবেশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার পদ্ধতিও রুশোর উদ্ভাবিত।

৬। ষষ্ঠতঃ—প্রত্যেকটি, শিশু স্বতন্ত্র ও অনন্য। একজন অপরজনের

প্রতিলিপি নয়। অর্থাৎ শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে, তার ব্যক্তিসত্ত্বাকে সশ্রদ্ধভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

৭। সপ্তমতঃ—শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনও রুশোর শিক্ষানীতির প্রধান অংশ।

৮। অষ্টমতঃ—শিশুর শিক্ষা প্রধানতঃ হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। শুধু পুঁথিগতভাবে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। অর্থাৎ, শিশুকে বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না। তার জন্য চাই বিচিত্র সম্ভাবনাময় বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা। ওই সূত্রটিই পরে জন ডিউইর হাতে পরিমার্জিত হয়েছে।

মোট কথা, রুশোর প্রস্তাবিত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে, অনেক স্ববিরোধী উক্তি আছে, অনেক অসামঞ্জস্য আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশোই বর্তমান শিক্ষাধারার জনক। রুশোর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে বেস্‌ড, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবল্, হার্বার্ট, মন্তেস্বরী ও ডিউই প্রভৃতি পরবর্তী যুগের চিন্তানায়কগণ।

রুশোর শিক্ষানীতির মূলকথা

রুশোর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এতক্ষণ মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হল। এইবার সেই নীতিগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করি—

(১) প্রথমতঃ—শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুই প্রধান। শিশুর আগ্রহ ও চাহিদার দ্বারাই তার শিক্ষার প্রকৃতি স্থির করা হবে, শিক্ষকের অভিভাবকের বা অন্য কারো ইচ্ছা বা চাহিদা সেখানে গৌণ। এই হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গোড়ার কথা।

(২) দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে শিশুর রুচি ও ক্ষমতার দ্বারা। অর্থাৎ ভাবমূলক ভাষাভিত্তিক শিক্ষণীয় বিষয় কমিয়ে দিয়ে কর্মেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তবমুখী বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে।

(৩) তৃতীয়তঃ—শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যেমন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে হবে, তার চেয়েও বেশী করে জানতে হবে শিক্ষার্থীকে। অর্থাৎ শিশুর প্রকৃতিকে ভাল করে না জানলে শিশুকে কখনই ভাল করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই তত্ত্বই পরে পেস্তালৎসির হাতে পরিবর্ধিত হয়।

প্রয়োজনীয়তা পেস্‌তালৎসিই প্রথমে তুলে ধরলেন জগতের মাঝে। পেস্‌তালৎসির মতে শিক্ষা হচ্ছে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শিক্ষাকে পেস্‌তালৎসি কি চোখে দেখেছিলেন তা তিনি একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন—

Sound education stands before me symbolised by a tree planted near a fertilizing water······Man is similar to the tree. In the new born child are hidden those facalties which are to be unfolded during life.

বার্গডর্ফের শিক্ষালয় সার্থকতা লাভ করল। বহু ছাত্র এসে ভর্তি হতে লাগল, বহু নূতন শিক্ষক এসে তাঁর কাজের সহায়ক হলেন এবং জনসাধারণও এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা স্বীকার না করে পারল না।

এইভাবে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার দিকদর্শন হিসাবে পেস্‌তালৎসির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হল।

পেস্‌তালৎসি তাঁর নবাবিষ্কৃত শিক্ষাতত্ত্বগুলি—How Gertrude teaches her children' নামক গ্রন্থে বেশ গুছিয়ে লিখেছেন।

পেস্‌তালৎসির শিক্ষানীতির মূলকথা :

তার শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম কথাই হল ভালবাসায় ছাত্রেব অন্তব স্পর্শ করতে না পারলে কখনই কোন শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে না। নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটে না—এই তাঁর দৃঢ় ধারণা।

তিনি বলেন—I am conviced that when a child's heart is touched, the consequence will be great for his development and his entire moral character.

দ্বিতীয় কথা হল শিক্ষার বনিয়াদ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। ভাষা শিক্ষাও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতিতে দিতে হবে।

মোটকথা শিক্ষা কখনই পুঁথিগত হবে না, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি তিনি স্বীকার করেছেন।

তৃতীয়তঃ—শিক্ষনীয় বিষয়গুলি সব সময়ে সরল থেকে জটিলের মধ্যে অগ্রসর হবে। তারপর শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুসারে বিষয়ের গুরুত্ব বাড়বে।

চতুর্থতঃ—তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। শিক্ষাকে প্রকৃতি-নির্ভর করবার কথা বললেও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা তাতে একটুও কমেনি।

পঞ্চমতঃ—পেস্‌তালৎসির মতে ব্যক্তির বিকাশ সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তির উন্নতি সমাজের উন্নতির জন্যই এবং সমাজের উন্নতি না হলে ব্যক্তির উন্নতি হতে পারে না।

এ বিষয়ে মন্‌রো বলেছেন—পেস্‌তালৎসির মতে—Education is the process as well as the means of bettering society ; education is ever to perform more for the individual than to give him the rudiments of learning , it is to assist him to be something for himtelf and to be something for others.

শিক্ষার ক্ষেত্রে পেস্‌তালৎসি রুশোর শিষ্য এবং রুশোর ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাই পেস্‌তালৎসির হাতে এসে ইতিবাচক শিক্ষায় পরিণত হল। যে-তত্ত্ব মূলতঃ ভাবপ্রধান ছিল তাই বাস্তবাশ্রয়ী হয়ে উঠল এবং আদর্শ শিক্ষানীতিকে দরিদ্র জনগণের দরজায় এনে হাজির করল। শিক্ষালয়গুলি পেস্‌তালৎসিব মতে—as nearly like the homes as possible—and the chief incentive to right not fear but kindness and love.

—এই হচ্ছে পেস্‌তালৎসির শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা।

পেস্‌তালৎসির শিক্ষানীতির সমালোচনা :

পেস্‌তালৎসি রুশোর ভাবশিষ্য, অর্থাৎ রুশোর অভিনব শিক্ষাতত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রুশোর নির্দেশিত পথই তিনি যথাসাধ্য অনুবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রুশোর মত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না বা বিশেষ কোন পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল না। রুশো যে সব কথা বলে গিয়েছেন তার বইয়ে একটি নূতন কথাও তিনি বলেন নি।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি যে শিক্ষা সৌধকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থাপন করবার পথিকৃৎ হিসাবে সম্মানিত, সেই মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর ধারণা এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবেই মনোবিজ্ঞান বিরোধী।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাধারার পথিকৃৎ হিসাবে পেস্‌তালৎসিকে আমরা চিরদিনই স্মরণ করব, কারণ পেস্‌তালৎসিই প্রথম রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

এই চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও পরবর্তী শিক্ষাবিদদের অনুপ্রাণিত করেছে। রুশোর কাছে যা ছিল একটা তত্ত্বমাত্র, পেস্‌তালৎসির হাতে এসে তাই বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ীভূত হল। জনসাধারণের কাছেও তার মূল্য স্বীকৃত হল।

শুধু রুশোর কথাই বা বলল কেন, শিক্ষাধারা সংস্কার সাধনের কথা ইতিপূর্বে লক্‌, ডেকার্ট হবস্‌, কমেনিয়াস প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ বলে গিয়েছেন কিন্তু পেস্‌তালৎসিই প্রথম সেই কাল্পনিকতত্ত্বগুলি বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করবার চেষ্টা করলেন। যেটা ছিল নিছক তত্ত্ব তাই একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে রূপদান করতে স্থরু করল। এই দিক দিয়ে বিচাব করেলে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষাধারায় পেস্‌তালৎসির দান অপরিসীম।

তারপর পেস্‌তালৎসি সেই শিক্ষাতত্ত্বকে কেবল যে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করছেন তাই নয়, অপরিসীম পরিশ্রমে আজীবন তিনি তার যথাযথ ও কার্যকারিতা বিচার করেছেন বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেছেন, সংশোধন করেছেন।

স্থতরাং আজ যে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষণা চলছে তারও পথিকৃৎ পেস্‌তালৎসি।

শিক্ষা যে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং একমাত্র আনন্দময় পরিবেশই তার বিকাশ ঘটে এই অভিনব তত্ত্বটিও পেস্‌তালৎসিই প্রথম বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভালবাসার মধুর সম্পর্কের কথা পরবর্তী সকল শিক্ষাবিদই বলে গিয়েছেন, পেস্‌তালৎসিই প্রথম তা বিশ্বজনের কাছে জোরগলায় বলেছিলেন।

আগেই বলেছি, পেস্‌তালৎসির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান যে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করা। যেদিন তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন— I must psychologise the education সেই দিনই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের স্থচনা করেছেন। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাঁর অবশ্য তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান গড়ে তুলবার স্থচনাটি তিনিই করে গেলেন।

পেস্‌তালৎসির কথা অনুসরণ করেই পরবর্তী কালের মনোবৈজ্ঞানিকবৃন্দ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশাল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান গড়ে তুললেন।

তাঁরই গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে হারবার্ট, ফ্রয়েবল্, ডিউই প্রমুখ সকল প্রগতিশীল শিক্ষাবিদই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিপূর্ণ করে মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী করে তুলেছেন।

মোটকথা রুশোর কাছে যা ছিল একটা বীজ মাত্র পেস্‌তালৎসির হাতে এসে তার অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটল এবং পরবর্তী শিক্ষানায়কদের সযত্ন পরিচর্যায় আজ তা একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

হারবার্ট (১৭৭৬—১৮৩৪)

রুশোর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-দর্শন থেকে সূত্র গ্রহণ করে পেস্‌তালৎসি শিশু শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী করে তোলবার কথা বলেছিলেন এ'কথা আগেই বলেছি। কিন্তু কিভাবে তা করা যায়, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে চললে শিশুর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত হয় সে-বিষয়ে পন্থা নির্দেশ করে গিয়েছেন জার্মানির বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট।

পেস্‌তালৎসি ছিলেন হৃদয়বান দরদী শিক্ষক। শিশুদের তিনি ভালবাসতেন, শিক্ষা দিতেন ভালবাসার মাধ্যমে সংস্কারকের ভাবালুতায় এবং এই ভালবাসা থেকেই তাঁর কৌতূহল জেগেছিল শিশুমনের গতি-প্রকৃতি জানাবার। কিন্তু হারবার্ট হলেন ধীমান শিক্ষক, দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং সেই শিশু-শিক্ষার কৌশল ও পদ্ধতি তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর স্থাপিত করলেন এবং শিশুদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে একটি অভিনব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

একমাত্র কান্টের শিক্ষাদর্শনের কথা বাদ দিলে হারবার্টই হচ্ছেন প্রথম দার্শনিক-শিক্ষক যিনি শিক্ষা-পদ্ধতির পিছনে একটা স্থায়ী দার্শনিক যুক্তি ও তত্ত্ব রচনা করেছিলেন। এখানেই হল হারবার্টের কৃতিত্ব। এদিক দিয়ে পেস্‌তালৎসির সঙ্গে হারবার্টের পার্থক্য বড় কম নয়, বরং দুজনে একেবারে বিপরীতমুখী বলা চলে। হারবার্টের দার্শনিক-তত্ত্ব যুক্তিনিষ্ঠ, অথচ পেস্‌তালৎসির কোন বিশেষ দার্শনিকতত্ত্বও নেই আর তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির পেছনে কোন যুক্তি-স্থাপনাও নেই—(Herbart's work was the antithesis of Pestalozzi's, in that it was logical and philosophy in character while Pestalozzi's possessed no logical form or system and little definitly formulated philosophical bias—Monroe)।

হারবার্টের জন্ম হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানির এক সুশিক্ষিত অভিজাত পরিবারে। তাঁর পিতামাতা উভয়ই ছিলেন সুশিক্ষিত এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। হারবার্টও নানা প্রকার বিদ্যা অর্জনে স্বাভাবিক প্রবণতা প্রদর্শন করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি ফিকটে ও শেলিং এই দুইজন খ্যাতনামা দার্শনিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দার্শনিক মনোভাব গড়ে ওঠে। পরে তিনি

কোনিগস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি একবার কিছুকাল তিনটি ছেলের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, এই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা উত্তরজীবনে তাঁর খুবই কাজে লেগেছিল। এই সময়েই তিনি পেস্‌তালৎজির শিক্ষাধারার দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর বার্গডর্ফের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পেস্‌তালৎসির শিক্ষা-পদ্ধতি সমালোচনা করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে, শিক্ষা মনস্তত্ত্বভিত্তিক হওয়া একান্ত দরকার তবে পেস্‌তালৎসির পদ্ধতির যুক্তিহীনতা ও অস্পষ্টতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন।

হারবার্ট নিজে দার্শনিক সুতরাং শিক্ষা-পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি নিজে একটা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করলেন।

তিনি দেখালেন বিচিত্র ধরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেমন করে অন্বয়ীকরণের (apperception) দ্বারা ভাবজটের সৃষ্টি করে এবং সেই ভাবজটের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অভিজ্ঞতাই শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়।

এছাড়া তিনি আরো দেখালেন শিক্ষার উপাদান ও পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে কিভাবে ছাত্রের নৈতিক-চরিত্রের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে হারবার্ট জোর দিয়েছেন নীতিজ্ঞান (morality) ও নীতিধর্মের (vertue) উপর। তাঁর মতে নীতিবোধক জীবন-যাপনের স্থায়ী অভ্যাস পরিণত করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্ব বুঝতে হলে তাঁর দার্শনিক তত্ত্বটি প্রথমে বুঝতে হবে। তাঁর মতে মানুষের মন হল একটা অখণ্ড সত্তা। এর আগে অ্যারিস্টট্‌ল বলেছিলেন মানুষের মত অনেকগুলি ফ্যাকালটি বা শক্তির সমাবেশ। কোন শক্তি বিচারবুদ্ধির, কোনটি যুক্তিস্থাপনার, কোনটি বা স্মৃতি-শক্তির, এমনি বিভিন্ন শক্তি মিলিয়েই মানুষের মন।

হারবার্ট মনের গঠন সম্বন্ধে এই তত্ত্ব বিশ্বাস করেননি, তিনি বলেন, মনে একটি অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তু তবে বিচিত্র ধরণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবার বা চিন্তা করবার ক্ষমতাও এই মনের আছে।

মনের প্রধান ধর্ম হল গ্রহণ আত্মীকরণ ও সংযোজন। মন বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করছে, নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে নবনব রূপ গ্রহণ করছে এবং মনের পটে এই নবযুগের ছাপ পড়ছে। হারবার্ট এই ছাপের নাম

দিয়েছেন ছাপজট (apperceptive mass)। মানসিকতত্ত্ব সম্বন্ধে হারবার্টের দ্বিতীয় কথা হল শিশুর জন্মের সময়ে কোন প্রকার সংস্কারের বা অভিজ্ঞতার ছাপ তার মনে থাকে না। একেবারে মোছা শ্লেট (Tabula Rasa) নিয়েই সে জন্মায়, পরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাতে দাগ পড়তে শুরু করে। ইন্দ্রিয় পথে বহির্বিশ্বের বস্তু নিয়ে অনবরত মানুষের মনে এসে আঘাত দিচ্ছে। তার ফলে গড়ে উঠছে নব নব ভাব (idea) এবং এই নবজাত ভাবগুলিই তাদের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশীল শক্তির ফলে বাস্তববোধে (existance) পর্যবসিত হয়ে থাকে।

হারবার্ট মনের এই তত্ত্বের উপব নির্ভব কবেই তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব গঠন করেছেন। পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা শিশু গ্রহণ করবে এবং কিভাবে সেই সব নূতন অভিজ্ঞতা শিশুর পূর্বলভ্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে (circle of thought) ইচ্ছানুরূপ সমৃদ্ধ করবে তা সবই নির্ভর করছে শিক্ষাদানের কৌশলের উপরে। হারবার্ট বলেছেন শিক্ষাদান-কার্যে কোন নূতন অভিজ্ঞতা শিশুকে দিতে গেলে ঐ জাতীয় তাব কোন পুরাতন অভিজ্ঞতা অর্থাৎ তাব মনের পূর্বসঞ্চিত কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত করে তা দিতে হবে, তবেই শিক্ষাদান কার্য সার্থক হবে।

শ্রেণীপাঠনার ক্ষেত্রে তাঁর এই তত্ত্বটিকে তিনি ব্যবহারিক রূপদান করেছেন পঠনক্রিয়াকে কয়েকটি খণ্ডে বা সোপানে বিভক্ত করে। এই খণ্ডগুলি একটির সহিত অপরটি এমন যুক্তিনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে, সেই অনুসারে গঠনক্রিয়া পরিচালিত করলে শ্রেণীকক্ষে গঠনক্রিয়া সার্থক করে তোলা সহজ হবে। এইভাবে একটি বিমূর্ত দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করবার পদ্ধতি নির্দেশই হারবার্টের কৃতিত্ব।

হারবার্ট তাঁর পঠনক্রিয়াকে প্রথমে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

(১) স্পষ্টতা (clearness) অর্থাৎ যে-বিষয়ে পাঠদান করা হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে দিতে হবে।

(২) সংযোগ (association)—এই স্তরে শিক্ষার্থীর মনে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার সংযোগসাধন করতে হবে।

(৩) পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা (system)—পূর্ব স্তরে গঠিত ভাবজটগুলি ধারাবাহিকভাবে ও পরস্পর যুক্তিনিষ্ঠভাবে সাজাতে হবে।

এবং (৪) পদ্ধতি (method) শিক্ষার্থী তার নবলব্ধ জ্ঞান নূতন ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তা দেখতে হবে ?

হারবার্টের এই চারি সোপানে বিভক্ত পদ্ধতি পরে তাঁর শিষ্য জিলারের দ্বারা সংশোধিত হয়ে পঞ্চ সোপানিক পদ্ধতিতে (five formal steps of instruction) পরিণত হয়।

জিলার স্পষ্টতাকে (clearness) ভেঙ্গে আয়োজন (preparation) ও উপস্থাপন (presentation) এই দুটি অংশে বিভক্ত করলেন। পরে রেন্ (Rein) আবার গোড়ার দিকে উদ্দেশ্য (aim) বলে একটা উপাংশ জুড়ে দেন। বাকী তিনটি সোপানেরও নাম পরিবর্তন করা হল।

এইভাবে হারবার্টের চারি সোপানের পদ্ধতি নিম্নরূপ পঞ্চ সোপানিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হল। যথা—

(i) আয়োজন (Preparation) } ...হারবার্টের স্পষ্টতা (Clearness)
(ii) উপস্থাপন (Presentation) }
(iii) তুলনা করণ ও বিমূর্তকরণ (Comparison & Abstraction) „—সংযোগ (Association)
(iv) সূত্রনির্দ্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation)— „ধারাবাহিকতা (System)
(v) অভিযোজন (Application)— পদ্ধতি (Method)

বর্তমানে শ্রেণীগঠনের ক্ষেত্রে হারবার্টের এই পদ্ধতিই সাধারণতঃ অনুসৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এই পদ্ধতিরও অনেক দোষ ত্রুটি আছে।

আধুনিক শিক্ষা-শিশুকেন্দ্রিক, কিন্তু হারবার্টীর-শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ শিক্ষক নির্ভর। শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা পরিচালনা করবেন তারই নির্দেশ এই পদ্ধতিতে। শিশু কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে এই তত্ত্বটি জানলে তবেই শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারবেন অথবা অভিজ্ঞতা অর্জনে শিশুকে সাহায্য করতে পারবেন। শিক্ষাদানের সব চেয়ে বড় উপায় হল শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা। এই আগ্রহ হওয়া চাই সম্পূর্ণ ও বহুমুখী (many sided interest)।

হারবার্টের শিক্ষাদর্শনের আর একটি বড় কথা হল অনুসঙ্গবাদ (correlation of studies) বা শিক্ষার সাঙ্গীকরণ। জগতে বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত আমাদের মনের পটে ছাপ রেখে যাচ্ছে এবং সেই সব বিচিত্র

অভিজ্ঞতা পরস্পর সংযোজিত হয়ে নব নব রূপ গ্রহণ করেছে। বাইরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মানুষের মনের মধ্যে এসে আর স্বতন্ত্র কুঠারিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না। সুতরাং বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা-গুলিও যদি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাবে পরিবেশন করতে পারি তাহলে শেখার কাজটাও পাকা হয়, অথবা পরিশ্রমও অনেকটা লাঘব হবে।

হারবার্ট-প্রদর্শিত মনের এই সাঙ্গীকরণ-বৃত্তির উপর নির্ভর করেই তাঁর শিষ্যেরা বিভিন্ন প্রকার অনুসঙ্গবাদ আবিষ্কার করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে তারই সঙ্গে অনুসঙ্গ স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনার নাম দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রবদ্ধ পদ্ধতি (concentration)। পরে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হারবার্টীয় তত্ত্ব একটি নূতন পথের দিশা দেখাল। এই পথের মূল বক্তব্য হল শিক্ষাদান (instruction) কার্য একটি সুসমন্বিত চিন্তাবলয় গঠন করে, এবং শিক্ষা (education) গঠন করে চরিত্র। শেষেরটি অর্থাৎ চরিত্র গঠন ব্যতীত প্রথমটি অর্থহীন।

হারবার্টীয় শিক্ষাতত্ত্বের একটিই হল মূলকথা। (Instrument will form the circle of thought and education of character. The last is nothing without the first, Herein is contained the whole sum of my pedagogy—Herbart)

হারবার্টীয় শিক্ষানীতি ঃ সমালোচনা

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বটি পেস্‌তালৎসি মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক করে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তাঁর তেমন দার্শনিক জ্ঞান ছিল না। হারবার্টই প্রথম সেই শিক্ষাতত্ত্বটির দার্শনিক বুনিয়াদ গঠন করলেন।

হারবার্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল শিক্ষা-পদ্ধতিকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার করার কথা পেস্‌তালৎসি প্রথমে উল্লেখ করলেও তা ব্যবহারিক ভাগে প্রয়োগ করেছিলেন হারবার্ট।

শিক্ষা-পদ্ধতিটি একটি সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় রূপায়িত করবার উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেন। এই পরিকল্পনার পিছনে যে দার্শনিক যুক্তি তিনি স্থাপন করেছিলেন, বর্তমানের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিচারে—তাতে

অবশ্য অনেক দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু সর্বাঙ্গীন ভাবে শিক্ষা-পদ্ধতির উপর যেভাবে তিনি মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তার উপযোগিতা আজ সকলেই স্বীকার করেছেন। এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই পরবর্তীকালের নব নব শিক্ষা-পদ্ধতির (methodology) পরিকল্পনা করেছেন। হারবার্টীয় শিক্ষা দর্শনের সবচেয়ে বড় অবদান হল আগ্রহ তত্ত্বের আবিষ্কার। কোন কিছু শিক্ষা দেবার পূর্বে সেই বিষয়ে আগ্রহ উদ্দীপিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা হারবার্টই প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্তী শিক্ষাবিদেরাও এর গুরুত্ব অনুভব করেছেন এবং নিজ নিজ শিক্ষণ-পদ্ধতি রচনায় তাঁর যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেছেন। তবে ঐ আগ্রহ উদ্দীপনের পিছনে যে দার্শনিক যুক্তি হারবার্ট দিয়েছেন এবং যে-ভাবে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন সে সম্বন্ধে অবশ্য সকলে এক মত হন নি। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে হারবার্টের ঐ যুক্তি ত্রুটি-মুক্ত নয়, তবে শিক্ষণ-পদ্ধতিটি আগ্রহ ভিত্তিক করবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

child as a living whole in which all the parts work together to produce harmonious unity—"

ফ্রয়েবলের মতানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে ফ্রয়েবলের দার্শনিক মতটি আমাদের প্রথমেই অনুধাবন করতে হবে। প্রথমেই বলেছি, কতগুলি বস্তুবিষয়কজ্ঞান সঞ্চয়ণকে তিনি কখনই শিক্ষা বলে স্বীকার করেন নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে একমদ্বৈতম পরমাশক্তির লীলা চলেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অখণ্ড লীলারস উপলব্ধিতে শিশুকে সাহায্য করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের ও একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্যের (unity in diversity and diversity in unity) সন্ধান করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে হচ্ছে শিক্ষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করা। শিশু বড় হবে, এবং সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক পরিবেশে স্বয়ং-সম্পাদিত কর্মের (Self activities) মাধ্যমে তার শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণীত হবে। **(ফ্রয়েবলের শিক্ষাপদ্ধতি পূর্বে কিণ্ডার-গার্টেন পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে)**

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতির মূলকথা—

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এতক্ষণ যেসব আলোচনা করা হল এইবারে সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করি—

(১) শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ বিশ্বময় যে একই পরমাশক্তির লীলা চলেছে চিন্তায় ও কর্মে সেই অখণ্ড লীলা উপলব্ধি করা, এককথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় একটা আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি করা।

(২) এই আত্মোপলব্ধি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানে আসে না, আসে অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমবিকাশে।

(৩) এই ক্রমবিকাশ অপরের নির্দেশে পরিচালিত কোন কর্মের দ্বারাই সম্ভব নয় কেবল মাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বয়ংক্রিয় কার্যাবলীর দ্বারাই তা সম্ভব। শিশুর খেলাই হল সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বয়ংক্রিয় কাজ, তাই ফ্রয়েবলের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে খেলা একটা প্রধান অঙ্গ।

(৪) ফ্রয়েবলের দর্শনে আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি হল প্রধান বিষয় এবং এই একতা উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে কতগুলি প্রতীক ব্যবহার করা যায়। ফ্রয়েবল এই দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলি প্রতীক আবিষ্কার করেছেন।

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতির সমালোচনা—

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতি একটা সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী শিক্ষাবিদেরা সকলেই যে ফ্রয়েবলের মত এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করেছেন একথা মনে করবার অবশ্য কোন হেতু নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি আজ পৃথিবীময় একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় আদর্শ হিসাবে গৃহীত।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবলের অপরিসীম প্রভাব আজ অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় কথা, সত্যকার দর্শনভিত্তিক শিক্ষার কথা আমরা ফ্রয়েবলের কাছেই প্রথম শুনলাম। তাঁর পূর্বে অবশ্য রুশো, পেস্তালৎসি শিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শনের কথা বলেছেন এবং হার্বার্ট ত বিশেষভাবেই তার উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু সে সবই হল শিক্ষাদর্শন, যার ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ফ্রয়েবলের দর্শন-চিন্তা সেরকম খণ্ডিত শিক্ষা দর্শন নয়। অখণ্ড জীবনদর্শন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই আরো পরিমার্জিত ও সুসঙ্গতভাবে জীবনদর্শন-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পনা করেছেন দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ খেলাকে শিক্ষার একটা অপরিহার্য পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা ফ্রয়েবলের প্রধান কৃতিত্ব। শিশুচিত্তের ক্রমবিকাশ একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে তার খেলার মাধ্যমে, ফ্রয়েবলের এই অভিনব তত্ত্বটি আজ সর্ববাদীসম্মত। তাই আজ প্রগতিশীল শিশু-শিক্ষার পদ্ধতিতে খেলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থতঃ খেলাকে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষা আর কেবলমাত্র লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নাচ, গান, অভিনয়, গল্প-বলা, নানাবিধ হাতের কাজ করা এই সব বাস্তব ক্রিয়া-কৌশলের অনুশীলনও শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্গত।

পঞ্চমতঃ বহুর মধ্যে একের লীলা এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে ওঠার ফলে ফ্রয়েবলের নির্দিষ্ট শিক্ষার পরিবেশ একান্তভাবেই সমাজধর্মী। তাঁর মতে বহু শিশুর একটা সমাবেশের মধ্যে শিশুর সমাজধর্মী মনের বিকাশ ঘটে এবং ক্রমশ নিজেকে বিশ্বসত্তার একটি অংশ বলে অনুভূত হতে থাকে। এক কথায় সমাজ সচেতনতা ফ্রয়েবলের শিক্ষাপদ্ধতির একটা প্রধান অঙ্গ।

এই মতবাদই পরবর্তী কালে 'শিক্ষালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি' এই মতবাদের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

ষষ্ঠতঃ শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চারাগাছের বৃদ্ধির মতই একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। চারাগাছ যেমন অনুকূল পরিবেশ পেলে স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে শিশুও তেমনি অনুকূল পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়ে ওঠে। শিক্ষাপদ্ধতির কাজ কেবল সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে চলা।

তাই তাঁর বিদ্যালয় হল শিশুর বাগান আর শিক্ষক হলেন তার অভিজ্ঞ মালি।

মন্তেস্বরী (১৮৭০—১৯৫২)

ডঃ মাদাম মারিয়া মন্তেস্বরী শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিশ্রুত নাম। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই অনুশীলিত হচ্ছে এবং প্রবর্তকের নাম অনুসারে সেই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে **মন্তেস্বরী-পদ্ধতি। এই গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠায় মন্তেস্বরী-পদ্ধতি ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।** এখানে তাহাব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে সেই পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ কবতে হয় শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদাম মন্তেস্বরীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। প্রচলিত এবং গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্বিচারে গ্রহণ না করে তিনি বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা দ্বাবা বিচার করে সেগুলি একেবারে ভেঙ্গে-চুরে দিয়েছিলেন। শ্রেণীকক্ষ, পাঠ্যপুস্তক, সময়পত্র, ঘণ্টা সব কিছু তিনি বাদ দিয়ে একটি অভিনব স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এই দিক দিয়ে মাদাম মন্তেস্বরীর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।

দ্বিতীয়তঃ মাদাম মন্তেস্বরী তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব রচনায় যে নূতন কিছু বলেছেন তা নয়। রুশো পেস্‌তালৎসি ফ্রয়েবল প্রভৃতি পূর্ববর্তী শিক্ষাচার্যগণ যেসব শিক্ষাতত্ত্ব স্থাপন করে গিয়েছেন, মোটামুটিভাবে মন্তেস্বরীর শিক্ষাতত্ত্বও তার থেকে অভিন্ন; তবে তত্ত্বগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া মন্তেস্বরী-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁর মতে প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী স্বাধীন আবহাওয়া রচনা করতে হবে, বাইরের কোন কিছুর প্রভাব যেন শিশুর উপর না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার তিনি এত পক্ষপাতী।

দ্বিতীয়তঃ শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন ছাত্রদের উপরই স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা এবং স্বয়ংক্রিয় কার্যাবলীর উপর তিনি জোর দিয়েছেন বেশী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে শিশুদের উপরে যদি সম্পূর্ণ দায়িত্ব

দেওয়া যায় তাহলে তারা নিশ্চয়ই তার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবে। নিজে থেকেই তারা শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে উঠবে।

চতুর্থতঃ ইন্দ্রিয়পরিমার্জনার (sense training) উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি শিক্ষোপকরণ বা শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (didactic apparatus) আবিষ্কার করেছেন। সেই সব সরঞ্জামের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য নির্ণয় করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন প্রকার রঙ, আকার, আয়তন, গঠন ও ওজনের সম্বন্ধে যাতে তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন করা যায় এই দিকে লক্ষ্য রেখেই সরঞ্জামগুলিকে তিনি প্রস্তুত করেছেন। লেখাপড়া শেখবার সময়েও শিশুরা যেন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ পায় সে দিকে তিনি লক্ষ্য রেখেছেন।

সরঞ্জামগুলির আর এক বৈশিষ্ট্য হল, শিশুরা যদি এদের ব্যবহারে কখনো কোন ভুল করে থাকে তাহলে সরঞ্জামগুলি আপনা থেকেই তার ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে। এর জন্য কোন শিক্ষকের নির্দেশ দরকার হবে না। এই হল তাঁর স্বয়ং-শিক্ষা (auto education) পদ্ধতি। সরঞ্জামগুলির অন্য এক বৈশিষ্ট্য হল এগুলি শিশুর সৌন্দর্যানুভূতিচর্চারও সহায়ক। সরঞ্জামগুলির রঙ, ঔজ্জ্বল্য, আকার, আয়তন এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের আকর্ষণ করে তাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি ফ্রয়েবলও তাঁর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কতকগুলি উপহারের (gifts) প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েবলের উপহার (gift) আর মন্তেস্বরীর (didactic apparatus) সরঞ্জাম এক জাতীয় জিনিস নয়।

ফ্রয়েবলের উপহারগুলি মোটামুটিভাবে প্রতীকধর্মী (symbolic)। বিশেষ কতকগুলি ভাব বা ধারনার প্রতীক হিসাবেই সেগুলি গঠিত, কিন্তু মন্তেস্বরীর সরঞ্জামে কোন প্রতীকধর্মিতা নেই।

মন্তেস্বরীর পদ্ধতির আলোচনা—

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে মন্তেস্বরী-পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে আজ আর কারো সন্দেহ নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যথা—

মন্তেস্বরীর স্বয়ংশিক্ষা (auto education) পদ্ধতি একটি অভিনব আবিষ্কার। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষার সরঞ্জাম এই কার্যের সহায়ক। কিন্তু এইসব

শিক্ষা-সরঞ্জামের (didactic apparatus) সাহায্যে স্বয়ং-শিক্ষা-ব্যবস্থা কখনই বাস্তবধর্মী হতে পারে না, অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। অথচ শিক্ষাকে সব সময়েই বাস্তবমুখী করে তোলাই হল আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা। শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহারের দ্বারা শিশু কখনই বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখবার কথা। মন্তেস্বরী-পদ্ধতিতে এই স্বাতন্ত্র কেবল বাহ্যিক দিক থেকে, যথা শিশুর উচ্চতা ওজন, হাত-পায়ের গঠন ইত্যাদির দিক থেকে বিচার করা হয়, মন বুদ্ধি রুচি প্রবণতা এই আন্তরিক দিক থেকে বিচার করা হয় না।

তৃতীয়তঃ মন্তেস্বরী-পদ্ধতিতে যে ভাবে ইন্দ্রিয়পরিমার্জনায় (sense training) ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মনে হয় তিনি তথাকথিত মানসিক বৃত্তি-চর্চা (formal training of sense)—এই পুরাতন মতবাদে বিশ্বাসী। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা এই তত্ত্ব বহুদিন বাতিল করে দিয়েছেন। মন্তেস্বরী মনে করেন শিশুকালে কোন একটি মানসিক বৃত্তি একবার পরিমার্জিত হলে পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকম পরিবেশেও আজীবন তার সুফল পাওয়া যাবে, কিন্তু তা হয় না। মানসিক শক্তির বিকাশ সামগ্রিক ভাবেই ঘটে বিভিন্ন বৃত্তিতে, খণ্ডিতভাবে নয়।

চতুর্থতঃ শিক্ষাসরঞ্জামের সাহায্যে শিশুর আত্মবিকাশের কোন সুযোগ নেই। স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেলার মাধ্যমে শিশু যেমন নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে শিক্ষাসরঞ্জাম নাড়াচাড়া ক'রে তা পারে না। কারণ, তার মনের বিচিত্রভাবে সে বিচিত্রভাব প্রকাশ করে খেলা'র মধ্য দিয়ে। শিক্ষাসরঞ্জামে মাত্র একভাবেই তার প্রকাশ ঘটে।

পঞ্চমতঃ বহুদিন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটা অনুসঙ্গ রচনা করে শিক্ষা দেওয়াই বর্তমানের শিক্ষাবিধিসম্মত। কিন্তু মন্তেস্বরী-পদ্ধতিতে সেটি হবার উপায় নেই। তাঁর পদ্ধতিতে যা কিছু করণীয় সবই এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের মাধ্যমেই করতে হবে। এর বাইরে যাবার উপায় নাই। সুতরাং শিক্ষকেরও সৃজনমূলক কোন কিছু কাজ করবার সুযোগ নেই।

সমাজগুলি অধিকাংশই ছিল কৃষিনির্ভর-গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করেই তাদের অভিজ্ঞতা রূপায়িত হত কিন্তু বর্তমানে সমগ্র দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটেছে—ডিউইর দেশ আমেরিকায় ত বটেই, এমন কি এ দেশের পল্লী অঞ্চলেও শিল্প নির্ভর প্রভাব বড কম পড়েনি। গ্রাম ভেঙে যাচ্ছে, গড়ে উঠেছে শিল্পাশ্রয়ী শহর।

সামাজিক পরিবেশের এই বিরাট পরিবর্তন কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না? আগেই বলেছি ডিউই বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ এই তিনটিকেই একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন তাঁই সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভেরও পবিবর্তন তিনি কামনা করেছেন।

শিক্ষালয়ের শিক্ষার যে পাঠক্রম রচিত হবে সেখানেও এই পরিবর্তনের ছাপ থাকবে। শিশুর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সে পাঠক্রম রচিত হবে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ একান্ত নির্দিষ্ট এবং বাস্তব—সুতরাং-শিশুর পাঠ্যক্রমও হবে একান্ত নির্দিষ্ট ও বাস্তব।

যে-বয়সে শিশু বিদ্যালয়ে আসে সে বয়সে সে জানতে চায়, করতে চায়, নিজে হার্তে গড়তে চায়। সমস্ত জিনিস সমস্ত ঘটনা নিজের মত করে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চায়। এইজন্য শিশুরা কোন খেলনা ফেলে বুড়োদের মত তা শুধু সাজিয়ে রাখতে চায় না, ভেঙ্গে-চুরে তার মর্মোদ্ঘাটন করতে চায়। শিশুর এই মানসিক প্রবণতার দিক লক্ষ্য রেখেই তার পাঠ্যক্রম স্থির করতে হবে এবং সে পাঠ্যক্রমের মূলকথা হবে শুধু বই পড়ে জানা নয়, হাতেকলমে জানা।

হাতেকলমে জানার পথে অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন আসবে, শিশুকেই সে বাধা অতিক্রম করতে হবে, তবেই সে শিক্ষা হবে বাস্তব শিক্ষা। সে শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে জন ডিউইর মতবাদগুলি এইবার সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক—

(১) যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে! সুতরাং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পুরাতন পদ্ধতিতে গড়া বিদ্যালয়গুলি বর্তমানের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে একান্তই ব্যর্থ। বিদ্যালয়গুলি এখানে গঠন করা হয়েছে ছাত্র সমষ্টির কথা চিন্তা করে, ব্যক্তিগতভাবে কোন ছাত্রের কথা চিন্তা করবার কোন সুযোগ সেখানে নেই। এর ফলে ছাত্রদের অনেক ব্যক্তিত্ব, অনেক বৈশিষ্ট্য,

অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সমাজের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। ভাবীকালের বিদ্যালয় গড়বার সময় এই ক্রটির কথা স্মরণ রাখতে হবে।

(২) বিদ্যালয়ে আমরা ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা বা সামাজিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকি। অথচ সমাজের বৃহত্তম পটভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে চার-দেয়ালে বন্ধ ঘরের মধ্যে পুস্তকের পাতায় নিবদ্ধ সামাজিক শিক্ষার পাঠদান যে কতদূর হাস্যকর তা আর বলে শেষ নেই।

সমাজের, যথা দেশের ভাবী উত্তরাধিকারীদের গঠন-কার্যে এই প্রকার মিথ্যাচার যে কতদূর সর্বনাশ ঘটাতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের ভাবী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম স্থির করতে হবে।

(৩) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অবশ্য পরিবর্তিত হবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। বর্তমান কালের সমাজ ত তদুপযোগী সামাজিক মানুষ গড়বার দাবী করবে বিদ্যালয়ের কাছে।

(৪) জন ডিউইর মতে বিদ্যালয় হচ্ছে গৃহেরই বৃহত্তর সংস্করণ। আদর্শ-গৃহ পরিবেশের চিত্রটি মনে রেখেই ডিউই তাঁর আদর্শ-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছেন।

গৃহ-পরিবেশে যেমন বালকের সমস্ত সত্তাকে আবৃত করে রাখে, বিদ্যালয়ও বালককে তেমনি করে রাখতে পারলে তবেই সে সার্থক হবে। শিশু-জীবনের একটা খণ্ডিত অংশ নিয়ে তাকে সামগ্রিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা।

তাই প্রাথমিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত এমন কয়েকটি কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর ইউনিভারসিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে, যথা—দোকান করা, সেলাই-এর কাজ করা, করা ইত্যাদি।

(৫) মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে জন ডিউই তাঁর প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স অনুযায়ী তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ৪—৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত খেলাধূলার কাল।

(খ) ৮—১২ „ „ „ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক অভিনিবেশের কাল।

(গ) ১২—ঊর্ধ্বে „ „ বুদ্ধিমূলক অভিনিবেশের কাল।

প্রথম অংশের ছাত্রদের পড়াশুনা তার গৃহ-পরিবেশে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিচালিত হবে। পঠন লিখন এবং কিছু কিছু ভূগোলবিদ্যার অনুশীলন চলবে

দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ স্বাভাবিক অভিনিবেশ কালে ছাত্রেরা কোন একটা শিল্পনৈপুণ্য অর্জন করবে। হাতেকলমে কাজ করতে শিখবে এবং সেই কাজের তত্ত্বটির অনুশীলন করতে শিখবে।

তৃতীয়াংশে অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক অভিনিবেশ কালে শিশু বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে একাগ্রভাবে চিন্তা করতে শিখবে; শিক্ষার কোন একটা বিশেষ দিকে (Specialise in distinct branches of studies)।

(৬) জন ডিউইর আর একটি দার্শনিক মত হচ্ছে মানুষের মন একটা কোন স্থির বস্তু নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত তার পরিবর্তন ঘটছে, রূপান্তর (evolution) ঘটছে। সুতরাং মানব মনের এই ক্রমপরিণতির কথা স্মরণে রেখেই তার শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হয়।

(৭) জন ডিউইর মতে প্রাচীনপন্থী মনস্তত্ত্বের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে যে সে মানুষের মনকে সমাজ-নিরপেক্ষ হিসাবে দেখেছে। অথচ সমাজের প্রভাব প্রতিনিয়ত তার মনের উপর পড়ে তার রূপান্তর ঘটিয়ে যাচ্ছে। দুটি বিভিন্ন সমাজের মানুষের মনের যে বিভিন্নতা সে কেবল মানুষে মানুষে বিভিন্নতার জন্যই নয়, সমাজগত বিভিন্নতাও তার ছাপ রেখেছে তার মনের উপর। কারণ মানুষের মন তার সমাজ-পরিবেশের পরিণতি মাত্র।

মোটকথা, জন ডিউই তাঁর নব কল্পিত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষকে কেবল তথ্যজ্ঞানসমৃদ্ধ জ্ঞানী করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে আদর্শ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। শিক্ষার তত্ত্বকে তিনি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর এবং শিক্ষার পদ্ধতিকে তিনি সমাজাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের (Social Psychology) উপর স্থাপন করে শিক্ষার ইতিহাসে নবযুগোদয় ঘটিয়েছেন।

ডিউই গতিবাদে বিশ্বাসী, তাঁর মতে সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল—সুতরাং শিক্ষায় শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, পাঠক্রম সব কিছুই পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। জীবনের অভিজ্ঞতাই হল শিক্ষা। সুতরাং ডিউইর শিক্ষা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তাছাড়া ডিউইর সমগ্র শিক্ষাদর্শনটাই সমাজচেতনার উপর নির্ভরশীল। এই দিক দিয়ে তিনি রুশোর বিপরীত মতাবলম্বী। রুশোর মত ডিউইও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকোণ বিপরীত। রুশো পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমাজের প্রভাবকে তিনি যথাযথ এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। আর ডিউই পুরোপুরি সমাজ-জীবনের পটভূমিকার উপরেই

শিক্ষাতত্ত্বের বনিয়াদ স্থাপন করেছেন। দার্শনিক মতে ডিউই প্র্যাগম্যাটিক, ভাববাদী (Idealist)-দের বিপরীত। তাই ভাববাদী দার্শনিকেরা ডিউইর মতের দৃঢ় সমালোচক।

ডিউইর এই নূতন শিক্ষাদর্শন বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চীন, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই নূতন তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, ভারতেও এই নব ভাবধারার তরঙ্গাভিঘাত বড় কম লাগেনি।

জন ডিউই আমেরিকার বার্লিংটনে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোক গমন করেন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। ৯০ বৎসরের অধিক কাল তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন শিক্ষা-সংস্কারের কাজে।

ডিউইর শিক্ষানীতির মূলকথা—

ডিউইর শিক্ষানীতির প্রধান কথাই হল ক্রিয়াশীলতা (Theory of activity) অর্থাৎ তাঁর মতে শিক্ষা সব সময়েই নানাবিধ ক্রিয়ার মাধ্যমে আসে, শুধুমাত্র বিমূর্ত চিন্তার মাধ্যমে আসে না।

শিক্ষালাভ করা মানেই হল কোন কিছু তথ্য বা জ্ঞান আহরণ করা এবং আহরণ করার প্রয়োজনীতা তখনই দেখা দেয়, যখন মানুষ কোন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যেন তার দেহমন ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে ওঠে। সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হল মানুষ তার পূর্বার্জিত জ্ঞান দিয়ে নিজেকে আর একটা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (adjust) করে তুলতে পারছে না। সেইজন্য তার নূতন রকমের তথ্য বা জ্ঞানের দরকার হচ্ছে। এই ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে কি দাঁড়ায়?

মানুষ তার কর্মপথে বিচিত্র ক্রিয়াশীলতার (activity) মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। চলার পথে যদি কখনও বাধা আসে, ক্রিয়াশীলতা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এইভাবে সমস্যার উদ্ভব হলেই মানুষ তখন তার সমাধানের জন্য চেষ্টিত হয়, এবং সমাধানের সবরকম সম্ভাব্য তথ্য (data) সংগ্রহ করতে থাকে। অবশ্য এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংগৃহীত তথ্য অনেক প্রকার হতে পারে কিন্তু তা থেকে একটি মাত্র তথ্যকেই সে যেন সমাধানের সর্বাপেক্ষা উপযোগী উপায় হিসাবে নির্বাচন করে নেয়।

অনেকগুলি বিকল্প তথ্যের মধ্য থেকে একটি মাত্র তথ্যকে সমাধানের উপযোগী হিসাবে নির্বাচন করে নেবার এই প্রক্রিয়াকে প্রকল্প (Hypothesis) বলতে পারি।

প্রকল্প স্থির করার পর—যেন দেখতে হবে এই নির্বাচিত প্রকল্পটি সমস্যা সমাধানের সর্বাপেক্ষা উপযোগী কি না? একে বলা যায় পরীক্ষণ (Testing)।

পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় নির্দিষ্ট প্রকল্পটিই উক্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান, তাহলে সেই বিষয়ে সত্যকার জ্ঞান বা ধারণা জাগায়। আর যদি দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের সাহায্যে কোন সমাধানে এসে পৌছান গেল না তখন আমরা আবার নূতন তথ্য আহরণ কবি, নূতন প্রকল্প নির্বাচন করি এবং নূতন ভাবে তার পরীক্ষা করে দেখি—যতক্ষণ না প্রকৃত সমাধানে এসে পৌছুতে পাবি।

এইভাবে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি, শিক্ষা লাভ করে থাকি—অন্য কোন পন্থা নেই।

হারবার্ট যেমন শিক্ষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিন্তাচক্র (circle of thought) অনুমান করেছেন ডিউই তেমনি করেছেন ক্রিয়াশীলতার চক্র (circle of activity)।

অর্থাৎ জন ডিউইর মতে জ্ঞানার্জনের প্রথম সোপান হল ক্রিয়াশীলতা (activity)।

ক্রিয়াশীলতা কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হলে হয় সমস্যার (Problem) উদ্ভব।

তখন সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ মনে মনে নানাবিধ তথ্য (data) সংগ্রহ করতে থাকে।

তারপর সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে থেকে একটি তথ্য সে নির্বাচন কবে নেয় (Hypothesis)।

অতঃপর সেই নির্বাচিত তথ্যটি সমাধানের কাজে প্রয়োগ করে তার কার্য-কারিতা পরীক্ষা (Testing) করা হয়। এইভাবে ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে জ্ঞানার্জনের পাঁচটি সোপান উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে হারবার্টের পঞ্চ-সোপানিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা মনে হতে পারে।

কিন্তু এই দুইজনের পঞ্চসোপানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য! ডিউইর পঞ্চ-সোপান প্রধানত সমস্যাভিত্তিক অথচ হারবার্টের মধ্যে সমস্যার কোন কথাই নেই।

হারবার্ট পুরাতন জ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন জ্ঞান আহরণ করেন। ডিউই নূতন তথ্য আহরণ করেন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। সমস্যার সমাধান হলে তবেই জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে।

শেষ সোপানে হারবার্ট অর্জিত জ্ঞানগুলি পরিমাপ করে দেখেন, কিন্তু ডিউই তাঁর শেষ সোপানে দেখেন তাঁর সংগৃহীত প্রকল্প-সমস্যা সমাধানের উপযোগী কি না? তাতে জ্ঞানার্জন হতেও পারে, নাও হতে পারে।

জন ডিউই প্রবর্তিত এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির নাম দেওয়া যায় সমস্যাপদ্ধতি (problem method)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমস্যাপদ্ধতিকে কাজে লাগান সম্ভব নয়। শিশুকে আমরা যেসব বিষয় শিক্ষা দিতে চাই সমস্যার আকারে তা সব সময়ে শিশুর সামনে নিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। —তাই তাঁর একজন শিষ্য কিলপ্যাট্রিক তাঁর সমস্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করে একটি নূতন পদ্ধতিও উদ্ভাবন করলেন—কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (project method)।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ডিউইর সমস্যাতত্ত্বাশ্রয়ী প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন।

(৬১ পৃষ্ঠায় **প্রজেক্ট পদ্ধতি** সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা আছে।)

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। বাংলাসাহিত্যের বিচিত্র দিকে তাঁর প্রতিভার জাদুদণ্ড স্পর্শ সোনা ফলিয়াছে। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি আজ বিশ্বের গুণীজন সমাজে সম্বর্ধিত, বন্দিত। আজ তিনি বিশ্বকবি পরিচিত। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পরিচয় নয়। তিনি কর্মী, বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টারও তিনি পথিকৃৎ। নব-নব ভাবধারার তিনি দিশারি।

আজ আমাদের আলোচনা শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। নূতন এক শিক্ষাদর্শ নিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যে একটি নূতন শিক্ষাধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন তার মূল্যায়ণ সম্বন্ধে এখনো বিশেষ কোন গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর যে কয়েক-জন মনীষী শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হল রবীনাথের শিক্ষাতত্ত্ব নিশ্চয়ই তাতে একটি নূতন সংযোজন।

কবি তিনি—কিন্তু তাঁর শিক্ষাতত্ত্বটি কবি মনের কল্পনাবিলাস নয়। আমাদের দেশে প্রচলিত পুঁথিনির্ভর নিরানন্দময় শাসনভীতিজর্জর গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির কবলে পড়ে তাঁর শিশুমন যে-ভাবে উৎপীড়িত হয়েছিল, তারি প্রতিক্রিয়ায় তিনি উত্তরকালে নবতর শিক্ষা-পদ্ধতির আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না।

বাংলাদেশের এক শ্রেষ্ঠ পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। শিক্ষায়-দীক্ষায় রুচি ও সংস্কৃতিতে এই ঠাকুরপরিবার তখন নবযুগের পথ-প্রদর্শক, বিদ্বান সমাগমে ঠাকুরবাড়ি সব সময়েই সরগরম। তাছাড়া পিতা দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ সমগ্র বাংলাদেশের যুবচিত্তে তখন এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। উন্নত পারিবারিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে বৈশাখ। যথাসময়ে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হল, গতানুগতিক অবস্থায়। এই সময়কার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখে রেখে গিয়েছেন বিভিন্ন রচনার মধ্যে।

তাছাড়া তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে নানা গ্রন্থে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করে গিয়েছেন। সেই সব রচনা থেকে কিছু কিছু

উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমরা কবির শিক্ষাধারা অনুসরণ করবার চেষ্টা করব। কারণ কবির কাজের ব্যাখ্যা কবির চেয়ে ভাল করে আর কে করবে। এক জায়গায় লিখেছেন—"সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনার জাঁতাকল চলছেই ঘর্ঘর শব্দে। এ কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উল্‌টিয়ে তলিয়ে গেছে একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না।"

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনাদায়ক। এতবড় সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবি-মনের উপর তথাকথিত শিক্ষার রোলার চালিয়ে তাকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করে দেবার চেষ্টাব ত্রুটি হয়নি।

—এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথায় তিনি বলছেন—

"নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া উঠিয়াছে সেখানে অন্য কোন অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখটা তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলের সংস্রব এমন অশুচি ও অপমান-জনক ছিল, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকে এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম···শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত আচার-ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা বশত তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।"

আর এক জায়গায় লিখেছেন—"একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত ও মন অন্তঃপুরের দিকে, তারপরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেন না শিশুর প্রতি সেকালের মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোন লক্ষণ দেখি নাই।"

এইভাবে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ভয়াবহ রূপের যথাযথ চিত্র তিনি এঁকেছেন। বাল্য ও কৈশোরের এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরবর্তী কালের নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে নিজের সন্তানদের যখন শিক্ষা দেবার সময় এল তখন তাদের এই শিক্ষার নামে জবরদস্তি উৎপীড়নের হাত থেকে কি ভাবে বাঁচান যায় তাই চিন্তা করতে লাগলেন।

শিশু চায় আনন্দ, আনন্দময় পরিবেশের মধ্যেই শিশুর হৃদয়-শতদল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, নিজেকে বিকশিত করে তোলে। অথচ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই আনন্দের উপকরণই সযত্নে নির্বাসিত, সেখানে কঠোর শাসন, কুশ্রী পরিবেশ, অবোধ্য তথ্য ও বিরক্তিকর পদ্ধতি। সেই জন্যই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুমনকে আকর্ষণ করতে পারে না, ভয়ের দ্বারা তাড়িত করে।

তিনি তাঁর ছেলেবেলাকার এক স্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন—"ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বাক্স। কোথাও কোনো লজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই, ছেলেদের যে ভাল-লাগা মন্দ-লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নির্বাসিত। সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আমার মন বিমর্ষ হইয়া যাইত,—অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমাব পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।"

বিদ্যালয়ে এই নিরানন্দময় পরিবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে সর্বদিক দিয়ে আনন্দময় করে তোলার কথা চিন্তা করতে লাগলেন—কারণ তিনি তাঁর নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন আমাদের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। এটা যেন একান্তই বাহুল্য বহিরঙ্গ জিনিস—"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এই কথাটি আমার মনে জেগে উঠেছিল ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার নাম স্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব-শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না—"

এই মানবশক্তির সম্পূর্ণতা দান করবার উপায় উদ্ভাবনা করবার জন্য কবি ব্যাকুল হলেন।

কবির কাজ কাব্যচর্চা, সাহিত্য-চর্চা, মননশীলতার ভাবলোকবিহার। কিন্তু এই স্তরে দায়িত্বের আহ্বানে তাঁকে কর্মের বাস্তব ভূমিতে নেমে আসতে হল। উপনিষদের ভাবধারা-পুষ্ট কবি-মনে প্রাচীনভারতের তপোবনের আদর্শটি জাজ্বল্যমান। প্রাচীনভারতের তপোবনের যে আদর্শ-শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল তাকে পুনরায় এই ভারতে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা, এবং কিভাবে যায় তারই পরীক্ষা-পরীক্ষায় কবি উদ্বুদ্ধ হলেন। সূচনা হল শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের।

এই বিদ্যালয়ের সূচনা সম্বন্ধে কবি বলছেন—

"কোন জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভ-কালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি। আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়ত চিরকাল এই ভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন কেন হঠাৎ বিদ্রোহী হল, কেন ভাব জগৎ থেকে কর্ম জগতে প্রবেশ করলাম।

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড় পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে বড় ক্লেশ দিত, আঘাত করত, যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় আমি ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানব-জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার স্বাভাবিক পরিবর্তনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে।·· ···আমরা—যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল—এতে বড়ই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করত। প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিদ্যালাভ কবা যায়, এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।······আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্খা ছিল আমি ছেলেদের খুশি করব। প্রকৃতির গাছপালাই তাদের প্রধান-শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব—"

এই প্রাণনিকেতন নীড়-রচনার স্থান নির্বাচিত হল বীরভূমের বোলপুর গ্রাম। এইখানে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভগবৎ সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমেই তিনি পেয়েছিলেন "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" তাই তিনি আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন'। এই শান্তিনিকেতনেই কবি প্রাচীনভারতের তপোবন-পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগী আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করলেন। এই প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

"শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেলাম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি···উপনয়ন

অনুষ্ঠানে ভূভুর্বঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম এই দীক্ষাই।

তারপর সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ় বিভাগের তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন? আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়। সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয়-স্থাপন করতে পারি তাহলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন—"

এইভাবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল বাং ১৩০৯ সালের ৭ই পৌষ—মহর্ষির দীক্ষার দিন।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির সব চেয়ে বড় কথা হল আনন্দ এবং মুক্তি।

তিনি দেখেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর মন নানা প্রকার নিষেধের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেই বন্ধন শিশুমনকে ফুটতে দেয় না বাড়তে দেয় না। বেত্রভীতি-কণ্টকিত শাসনের তাড়নায় পুঁথিবাঁধান শুষ্ক পথে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে কেরানীগিরির অমরলোকে। এর চেয়ে বড় স্বর্গ আর কিছু নেই। ইংরাজী শাসনযন্ত্রটাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য যে কেরানীকুলের প্রয়োজন তারই উৎপাদনযন্ত্র হচ্চে আমাদের এই বিদ্যালয়গুলি। সে যন্ত্রে কেরানী হয়, হাকিম হয়, কিন্তু মানুষ হয় না। সে যন্ত্রে ডিগ্রি পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় না, বৃহত্তর জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায় না। সে বিদ্যালয়ে দালান কোঠা আছে, পুঁথির বোঝা আছে কিন্তু মুক্তি নাই, সে পঠনপদ্ধতিতে চর্বিত চর্বনের বিরক্তিকর গতানুগতিকতা আছে কিন্তু প্রাণের স্পর্শ নাই।

কবি তাই তাঁর বিদ্যালয়কে প্রাচীন-ভারতের আশ্রমের ছাঁদে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হলেন—যে শিক্ষার লক্ষ্য ডিগ্রী লাভ বা চাকুরি লাভ নয়, পূর্ণতা লাভ বা মনুষ্যত্ব লাভ।

তিনি বলেছেন—"আমার মনে হয়েছিল জীবনের কি লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীতে তার অভাস পাওয়া যায়। তপোবনের বিচিত্র তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা-সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে

গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে—"

এই পূর্ণতা লাভের সাধনাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতির মূলকথা। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষার বিষয় এই তিন দিকেই তিনি এই তপোবনের আদর্শকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই হল শিক্ষক। শিক্ষক হল তপোবনের আদর্শে গঠিত গুরু।

এই গুরুর গুণাবলী সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে তাঁর মত পরিষ্কার করে বলেছেন। তাঁর গুরু ছাত্রদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পণ্ডিত সেজে গৌরবের আসনে বসে থাকবেন না—তিনি হবেন ছাত্রদের বন্ধু, সহায়ক, সাথী ও পথ-নির্দেশক। তিনি হবেন জ্ঞানে গভীর, কর্মে কঠোর, প্রেমে রমণীয়।

ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্বন্ধ হবে ভালবাসার। তাঁরা শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন না, অর্থের লালসায় আসবেন না, আসবেন আদর্শের আকর্ষণে। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরা একই সঙ্গে একই ভাবে বসবাস কববেন, খেলাধূলা করবেন, পঠনপাঠনা করবেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে আশ্রমে সপরিবারে বাস করতেন, তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে আর অল্প কয়েকটি শিশু নিয়ে প্রথমে এই বিদ্যালয়ের তিনি সূচনা করলেন। দালানকোঠা ঘরবাড়ি নেই, ডেস্কবেঞ্চি নেই, বেশীর ভাগ ক্লাস হত গাছের তলায়। কবি নিজেই হলেন এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কেন্দ্র। তিনি লিখেছেন —"আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করছি।.......

"ছেলেদের জন্য নানা রকমের খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এইজন্য তাদের শিশুচিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি! ...আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোন নিয়মের দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার অভিপ্রায় ছিল ..তারপর ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে—আপনার অজ্ঞাতসারে—প্রকৃতির সঙ্গে

আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে, এই আমার লক্ষ্য ছিল।"—

ছাত্রের আদর্শও ছিল প্রাচীনভারতের আশ্রমবাসী শিষ্য। শান্তি-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্রদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপে শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে রাখতে হ'ত। গুরুকে একান্ত মনে ভক্তি করতেন, গুরুর সকল কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্য কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে আনা, এই সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তারা যত বড় ধনীর ছেলেই হোক না। শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে। তাঁদের শরীরে ও মনে কোনরকম দোষ একেবারে স্পর্শ করতো না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসজ্জায় বড়মানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষা লাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

—তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে সকল প্রকার বড়োমানুষি তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে মনে বাক্যে কাজে, তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না।"

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনভারতের এই তপোবনের আদর্শ তাঁর বিদ্যালয়ে যথাসাধ্য অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনেও তিনি কোন ফাঁকির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। সেখানেও তিনি কঠোর শ্রমসাধ্য নিরলস অনুশীলনের পক্ষপাতী। বুদ্ধির অনুপাতে অনেক কঠিন বিষয় তিনি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছেন—ইংরেজি কবিদের দুরূহ কাব্যবিজ্ঞানীদের কঠিনতত্ত্ব সব কিছুই তিনি তাঁর কিশোর ছাত্রদের পরিবেশন করতে দ্বিধা করেননি। এমনকি হাল্কা ব্যাখ্যায় তাদের জলো করেননি। তিনি বিশ্বাস করেছেন—"যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনিই ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে-বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধ্য চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। ছেলেদের বই যাঁরা

লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটি ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তাঁর মূল্যও আছে; ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়, চিবিয়ে খাওয়াতেই এক দিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

বলাই বাহুল্য প্রাচীনভারতের শিক্ষাদর্শ কল্পনাপ্রবণ কবিচিত্তে বিশেষ ভাবেই সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগের দাবীকে অস্বীকার করবারও যে উপায় নেই সে-সম্বন্ধেও কবি অবহিত। তাছাড়া বর্তমান পাশ্চাত্য-জগতের কর্ম প্রেরণাকে কবি কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রধান ত্রুটি তার স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা কিন্তু তাদের সত্যানুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা নিশ্চয়ই অনুকরণযোগ্য।

তাই কবি তাঁর বিদ্যালয়ে প্রাচ্য-ভাবাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য-কর্মপ্রেরণার সার্থক সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর শিক্ষাধারার মধ্যে।

I had intently wished that the introspective vision of the universal 'soul which an Eastern Devotee realises in the solitude of his mind could be united with this spirit of its outward expression in service, the exercise of will unfolding the wealth of beauty and well-being from its shy obscurity to the light—A poet's school.

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সবচেয়ে বড় কথা হল আনন্দ। আনন্দময় পরিবেশেই শিশুর অন্তর বিকশিত হয়।) তাই তখনকার পঠন-পদ্ধতিতে বাধ্য-বাধকতার নাগপাশ শিথিল। ছেলেরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখবে, প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের অন্তরকে বিস্তারিত করে নিতে পারবে—তবেই সে বিকাশ বিশ্বাত্মার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হতে পারবে।

এই প্রকৃতিপ্রীতি রুশোর মধ্যেও আমরা দেখতে পেয়েছি—তবে রুশোর প্রকৃতি কঠোর-শিক্ষক, এমিল প্রকৃতির হাতে মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির কাছে শিক্ষালাভ করছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বন্ধু, খেলার সাথী। শিশুচিত্তকে পরম প্রেমে সে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে দেয়। শিশুচিত্তকে আনন্দরসে ডুবিয়ে রেখে তাকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বোধিত করে।

কবি জানেন (শিশুর আগ্রহ বিচিত্র পথগামী শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় তাদের

অন্তরের তৃষ্ণা মেটে না, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। তাই তার পাঠক্রমে গান, ছবি আঁকা, নানাবিধ শিল্পকাজ, খেলাধূলা সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে উঠেছে সঙ্গীত-ভবন কলাভবন।)

(শিক্ষাপদ্ধতির একটা বড় অংশ ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে ডিসিপ্লিন শাসননির্ভর নয়, তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।)

এই সম্বন্ধে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণে পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয় তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহাতে তাহাদের নিঃস্বত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলে মানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালো করিয়াই বোঝে। তাহারা জানে এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা সৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা উহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এই জন্য কালোচিত চাঞ্চল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন।—"

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবলের কিছু মিল পাওয়া যায়।

ফ্রয়েবল অনুভব করেছিলেন এই পরিদৃশ্যমান জগতে আপাতঃ বিভেদের মধ্যে একটা ঐক্যের সূত্র আছে, সেখানে ঐক্যের সূত্র হল সর্বজ্ঞানী এক এবং অখণ্ড ভগবৎসত্তার লীলা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে চলেছে—সেই লীলার ধারা অব্যাহত ভাবে। শিক্ষার কাজ হল সেই লীলারস উপলব্ধি করান, সে সম্বন্ধে সচেতন করান।

ফ্রয়েবল শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন "শিক্ষার দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে মানুষের দিব্যসার বস্তুকে (divine essence)। তাকে বার করে নিয়ে আসতে হবে মানুষের সচেতন উপলব্ধির মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে দিব্যতত্ত্ব প্রাণবন্ত ভাবে বিদ্যমান, তাকে স্বাধীন সচেতন অনুবর্তনের পথে জাগ্রত করে তুলতে হবে এবং তার জীবনকে এই দিব্যতত্ত্বের সার্থক রূপায়নে সমর্থ করে তুলতে হবে"—এই জাতীয় উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সন্দর্ভে বহু জায়গায় বহু ভাবে ছড়িয়ে আছে। বার বার

তিনি বলেছেন, তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, যা বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।”

এই বিশ্বসত্তা বা বিশ্বাত্মার ধারণা তাঁর সমুদয় দার্শনিক চিন্তাধারার মূল। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়েও তিনি ফ্রয়েবলের মত বার বার এই বিশ্বাত্মার কথাই বলেছেন।

তবে ফ্রয়েবল ঈশ্বরকে যেন একটা—বিমূর্ততত্ত্ব হিসাবেই গ্রহণ করছেন আর রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখেছেন বিশ্বমানব পরমপুরুষ হিসাবে। তাই তিনি আধ্যাত্মিক আর বাহ্যিক তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিভেদ স্বীকার করেন না। বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—এই উক্তি তাঁর সর্বাঙ্গীন জীবন-দর্শনের, সুতরাং শিক্ষা-দর্শনেও। তাই শিক্ষার জীবনকে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন শুচিসুন্দর ও আনন্দময়।

অনুশীলনী

শিক্ষা :—

(1) Since the child is destined to live out his life, not as an abstract individual but as a member of a community, we may consistantly define education as the making of good citizen.—Develop in the idea of the aim of education, keeping the above aspect in mind. [C. U. B. T.—1951, 1954]

(2) "The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to the native or to the social environment." Discuss. [C. U. B. T. 1952]

(3) How can the demands of personal developement and needs of society be met by education a democratic society ? [C. U. B. T. 1955]

(4) The aim of education has often been stated in terms of social efficiency or an adequate adjustment to social environment in which man is born. Explain with special reference to the importance of group life in school, [C. U. B. T. 1956]

(5) "The general aim of education should be to offer the fullest possible scope to individuality, while keeping in view, the claims and needs of society in which every individual citizen must live—" Criticize the present day Secondary Education in West Bengal in the light of the above statement. [C. U. B. T. 1956]

(6) Education teaches social adjustment. Consider the defination and attempt a more comprehensive defination of education. [C. U. B. A. (Edu.)—1959]

(7) What do you understand by the individualistic and socialistic aim of education ? Which would you advocate and why ? [C. U. B. A. (Edu.)—1959]

(8) Discuss why there is a need of knowing the person to be taught, as well as, the thing to be taught. [C. U. B. T.—1954]

(9) It is said that the objective of a democratic education is the full, all round develoment of every individual's personality.—Discuss. State some of the ways by which this objective could be attained in the school. [C. U. B. T. 1957]

(10) The idea that a main function of the school is to socialillze its pupil in no way contradicts the view that its true aim is to cultivate individuality. Do you agree? Give reasons for your answer. [C. U. B. T. 1958]

(11) "A complete and generous education is that which fits a man to perform justly, skillfuly and magnanimously, all the offices, both public and private—"

Critically examine the statement. [C. U. B. T. 1960]

(12) Creativeness is impossible without conservation as it is on past experience that we draw for guidance in dealing with the present and for anticipating the future. Explain fully the significance of the statement. [C. U. B. T. 1951]

(13) Every act of self assertion is both hormic and mnemic. Trace the relations between horme and mneme in so far as they affect the conservative and creative activities of life. [C. U. B. T. 1953]

(14) We must do everything we can, to make pupils feel at home in this world, without encouraging a marked distinction between the school-world and the outside school-world. Show that this is one of the modern trends in educational theory? [C. U. B. T. 1951]

(15) What are the main features of a Dalton Plan? To what extent could you introduce it in your school. Give your scheme. [C. U. B. T. 1952]

(16) What are the essential features and merits of the Dalton Plan? Do you know of any experiments that have been tried in this country on the Dalton Plan or any modified version thereof. [C. U. B. T. 1954]

(17) Explain the 'Project Method.' What are its metits and limitations? How far can it be used in our schools with advantage. [C. U. B. T, 1956]

(18) Explain what is meant by saying that modern education is child-centred, and discuss the place of teacher in modern education. [C. U. B. T. 1958]

(19) Discuss the advantages and the limitations of the Project Method, taking a concrete example. [C, U. B. T. 1958]

(20) It is said that modern education has shifted the focus

of its attention from subject matter to the child. Do you agree ? Give reasons for your answer.

(21) Critically examine the different views regarding the aims of education. What, in your opinion, should be the ultimate aim of education ?

(22) The child should be the starting point, the centre and the end ; his development, his growth in ideal

(23) "Education is neither the mere acquisition of a body of knowledge nor the mere training of mental powers through exceriese. It is adjustment—a life to be lived." Examine the statement.

(24) What do you understand by child-centered education ? Trace briefly the history of this movement and explain its significance.

(25) Discuss—"The teacher is the artificer of mind and noble life.'

(26) Give a critical estimate of some of the aims of education put forward by different thinkers. What, in your opinion, is the most satisfactory aim of education, and why ?

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক :

(1) Discuss the question whether "nature" and "nurture," inherited endowment of environmental influence, has the more potent effect on determining a child's development.

(2) Why more stress is now-a-days laid on the influence of environment rather than on heredity in regard to the mental development of children.

(3) Discuss the relative importance of heredity and environment in either (a) the intellectual growth of children or (b) their emotional development.

(4) "Development is neither an unfolding of heredity without influence from the environment nor a process of being passively moulded by the environment"—Discuss.

(5) Write an essay on the influence of heredity and environment on the mental development of children.

(6) Discuss the part played by heredity and environment in there distinctive functions.

(7) Discuss the relative influence of heredity and environment on educational attainments of children.

(8) Give the chief characteristics of the different stages in the general development of a child. [C. U. B. T. 1951]

(9) The adolescent period is also a critical one for the development of criminality. Do you agree? Justify your answer with reasons, and state how the teacher can be of help to the pupil at this stage. [C. U. B. T. 1956]

(10) 'Physilcal growth is rhythmic, not regular.' Explain with special reference to the succession cycles of growth. What are the mental characteristic of a boy at the age of eleven? [C. U. B. T. 1956]

(11) "The imagination of a man is healthy, but there is a space of life in between. in which the soul is in the ferment, the character undicided, the way of life uncertain—"

Explain the above with special reference to the mental characteristics of a boy during this period referred to in the above quotation. [C. U. B. T. 1957]

(12) "There is a ride which begins to rise in the vains of youth at the age of eleven or twelve......If that tide can be taken at the flood, of a new voyage begun in the strength and along the flow of the current, we think that it will "move on to fortune" Critically examine the statment. [C. U. B. T. 1958]

(13) What are the special needs of adolescent? Examine how far these are satisfied in a Multipurpose School.
[B. T. 1959]

(14) Is adolescene necessarilly a period of meental storm and stress—strife and strain? Give reasons for your answer.
[B. T. 1959]

(15) Write an essay on—Relation between the teacher and the taught. [C. U. C. T. 1950]

(16) 'Teacher' is essentially another name for influence. Show that the functions of the teacher is to influence the child to personalse the impersonal experiences which constitute the course of study. [C. U. B. T. 1953]

(17) What, apart from mere instruction, are the functions of the teacher in a modern democratic society?
[C. U. B. T. 1953]

(18) "Teachers are born and not made"—Do you agree with this view? How can the teacher's training system in our state be improved? [C. U. B. T. 1955]

(19) Describe the marks of a good teacher.
[C. U. B. T. 1957]

(20) What are the functions of a teacher? Why is he considered the most important in educatial system.
[C. U. B. A. 1953]

(21) "The teacher is the child's friend, philosopher and guide"—Elaborate the staement. [C. U. B. T. 1960]

(22) "Children are born with a biological heritage; they are born into a social heritage."—Discuss. [C. U. B. T. 1961]

(23) Estimate the importonce of Heredity and Environment in education. [C. U. B. T. 1962]

(24) Describe briefly the physical and mental characteristics of a child in the pre-adolescent period. How would you give him the best possible training at this stage? [C. U. B. T. 1962]

(25) It is the teacher about whom the whole educational system rotates.—Elucidate.

শিক্ষালয় ঃ

(1) We must do everything we can, to make pupils feel at home in this world, without encouraging a marked distinction between the school world and out of school world. Show that this is one of the the modern trends in educational theory. [C. U. B. T. 1951]

(2) Edward Thring once wrote—"A mob of boys cannot be educated." Hence schools are needed. Discuss, how a school should be orgainised for teaching. [C. U. B. T. 1952]

(3) The idea that a main function of the the school is to socialise its pupils is no wise contradicts the view that its true aim is to cultivate individualship. Do you agree? Give reasons for your answer. [C. U, B. T, 1955, P. T. 1958]

(4) Write an essay on—"School as a Society." [B. A. Edu. 1957, 1958]

(5) Show how the functions of the schools are both conservative and progressive. [C. U. B. T. 1959]

(6) What are the distinctive function of the primary school and different types of secondary schools? [C. U. B. T. 1955]

(7) What are the different types of schools at present in W. Bengal? Indicate briefly their distinctive functions? [C. U. B. T. 1957]

(8) What are the main types of schools of India and what are their distinctive functions? [C. U. B. T. 1957]

(9) Develop the idea that "The school is society in miniature." [C. U. B. T. 1961, 1964]

(10) Discuss the importance of home as one of the most effective social agencies of education. How far can it be regarded as the first training ground of character? [C. U. B. T. 1963]

(11) What is freedom movement in education? What kinds of activity would you advocate in secondary schools. [C. U. 1964]

শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি ঃ

(1) What principles should be followed in drawing up carriculum of studies for a recognised secondary school system of India. [C. U. B. T. 1950-1954]

(2) Is mental discipline the real condition as regards the choice of studies in school? If not, what principles should govern the framing of a curriculum of studies for secondary schools.

(3) Curriculum construction taxes our energies to the utmost. Why? Give a reasonable scheme of your own, allocating time to the contents of the curriculum. [C. U. B. T. 1952]

(4) The prime and direct aim of instruction is to enable a man to know himself and the world. Keeping this view in mind discuss what principles should govern the choice of studies in secondary schools. [C. U. B. T. 1953]

(5) What are the basic principles which should guide us in curriculum construction. [C. U. B. T. 1955, 1958, B. A. 1959]

(6) What principle would you follow in framing curriculum of any stage of education? Examine the present secondary curriculum in West Bengal in the light of these principles. [C. U. B. T. 1957]

(7) What is curriculum? Supposing as Head Master of a High school you are given absolute freedom to frame the curriculum of your school, how whould you modify the existing curriculum.

(8) Why are craft and creative activities forming part of school curricula? Indicate the educational value of knowledge correlated to natural activities of children. [C. U. B. A. 1957]

(9) A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two forces; the nature of the child and the requirement of the community. Give an outline of such curriculum. [C. U. B. T. 1958]

(10) Enumerate the main principles on which the curriculum should be based. What would be your suggestion for the reforms of the existing curriculum of our ten-class schools? [C. U. B. T. 1959]

(11) C. Kingsley once mentioned in "Water Babies"—"well they didn't know that, all they knew was, the Examiner was coming." Why is a distinction drawn between examination conducted by teachers as one of the ordinary means of promoting the ends of sound instruction, and examinations conducted on special occasions and at considerable intervals by an outside authority. [C. U. B. T. 1951]

(12) "The New-Type Examination is not an unmixed blessing"—Discuss. [C. U. B. T. 1953]

(13) What are Objective Tests, and their uses and limitation ? [C. U. B. T. 1953]

(14) Why are examinations called necessary evil ? What are your suggestions for the improvement of the present system of examination. [C. U. B. T. 1956]

(15) Discuss the value and limitations of the examination held by an external body as the final evaluation of the school education. [C. U. B. T. 1957]

(16) In all play we find and element of joy, and on this account we find play associated with the fine arts. Show that play is a good means to sublimation. [C. U. B. T. 1952]

(17) "Work is concious activity dominated by the object which it seeks to produce the drudgery is conscious activity whose value is not evident to the actor." How far should play impulse be utilised in over-coming drudgery and hard work ? [C. U. B. T. 1953]

(18) Write short notes on "Play way in Education."

(19) Describe critically the different theories of play.

(20) It is said that our school should be a place in which work is play and play is life. Three in one and one in three —Elucidate. [C. U. B. T. 1958]

(21) By means of play, the child expands in joy as the flower expands when it proceeds from the bud, for joy is the soul of all the actions of that age, Elucidate the statement and discuss the educational value of play. [C. U. B. T. 1960]

(22) The term discipline has two phases. viz (i) positive and (ii) negative. How far should these be fostered in schools. [C. U. B. T. 1952]

(23) What are the causes of indiscipline amongst school children ? Consider any one serious case of indiscipline and suggst how you. as head of the institution would deal with it. [C. U. B. T. 1960]

(24) "Discipline is not an external thing like 'order' but something that touches the inmost springs of conduct"—Explain and indicate the educational implications of this statement. [C. U. B. T. 1959]

(25) What are the ostensible aim of punishment ? Discuss the value of standards forms of punishment of school. [C. U. B. T. 1952]

(26) Write an essay on "Free Discipline." [C. U. B. T. 1959]

(27) What is the place of discipline in child-centered education. [C. U. B. T. 1957]

(28) What do you understand by "free discipline" and what is the place in school ?

(29) Discess the merits and defects of reward and punishment as incentives to learning in school.

(30) What are the standard from of punishment in vouge in our schools ? Discuss their ethics and give you own ideas of more suitable forms of punishment.

(31) The ideal of the true educator is to Create "a common wealth in which work is play and play is life ; three in one and one in three"—Elucidate.

(32) A rationally concieved curriculum must be the resultant of these two forces : The nature of child and the requirement of the community give an outline of such a curriculum.

(33) How do you distinguish between play and work What is drudgery ? Write a short note on 'Play way' i education.

(34) Show you acquaintance with the modern trends in education so far as teacher pupil relationship and discipline one concerned.

(35) Consider the merits and demerit of reward and punishment with special reference to their influence on education.

(36) What is suggestion ? How is it related to imitation ? We some experiments on or narrate you own experience of how suggesteble children are.

শিক্ষানায়ক :

(1) Critically estimate Rousseau's Contribution to education.

(2) Describe after Rousseau the education of the child in different stages. Comment on his concept of negative education.

(3) Critically estimate pestalozzis contribution to education.

(4) Pestalozzi is the originatior of the mevement of psychologising education. How far is the statement true ?

(5) "What Rousseau and Froeble felt. Herburt put them into effect."—Discuss.

(6) Give a critical estimate of the contribution of Froebel modern educational thought, making reference to his important writing.

(7) Discuss John Dewey's main contributians to edutation theory and practice.